সেরা ভূতের গল্প

ছোটদের সুনির্বাচিত ভৌতিক গল্পগুচ্ছ

www.arisumu.com

সম্পাদক
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ডঃ অরুণকুমার দত্ত

নির্মল বুক এজেন্সি
২৪বি, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

Scanned By Arivirus

ভূমিকা

ভূতের গল্পের একটা সার্বজনীন আবেদন আছে। সব বয়সের সব দেশের লোকের ভূতের গল্পের প্রতি আকর্ষণ আছে। তার প্রধান কারণ, ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। বিজ্ঞান ভূতকে বিশ্বাস করে না। ভূতের অস্তিত্বকে আধুনিক সভ্যতা গ্রাহ্য করে না।

ভূতের অস্তিত্বকে বিজ্ঞান স্বীকার করুক বা না করুক; আবহমান কালের মনুষ্য সমাজে মরণোত্তর কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে ছায়া ছায়া বিশ্বাস রয়েছে। মরবার পরেই কি সব কিছু শেষ হয়ে যায়? মানুষের মন একথা মানতে চায় না। তাই যুগে যুগে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, প্রেতাত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বহু রকমের মত ও মতভেদ রয়েছে। প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করত মৃত্যুর পরে আত্মার পুনরাবির্ভাব ঘটে। তাই তারা রাজার মৃত্যুর পরে পিরামিড তৈরী করে তার ভেতর ধনরত্ন ও মৃতের ব্যবহৃত সামগ্রী রেখে দিত। হ্যামলেট নাটকে, সেক্সপীয়ার প্রেতাত্মার অস্তিত্বের কথা লিখে গেছেন।

অলোচ্য সংকলনে প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের ভৌতিক গল্পগুলো স্থান পেয়েছে। ভূতের গল্প সব দেশেই মুখরোচক। ভূত সম্পর্কে সকলের মনেই অল্পবিস্তর ভয় রয়েছে। যাঁরা মুখে বলেন ভূতকে মানি না; তাঁরাও কিন্তু ভূতকে ভয় পান। কারণ ভূত সর্বশক্তিমান। নগর জীবনে বিজলী আলোর পরিবেশে ভূত বেমানান। ভূত বিজলীর আলো সহ্য করতে পারে না। যদিও গ্রাম্য পরিবেশের অন্ধকারে ঝোপেঝাড়ে, কাঁচা রাস্তায় ও প্রান্তরে ভূতদের হামেশাই দেখা যায়।

এই সংকলনে ভিন্নতর পরিবেশে বিভিন্ন মেজাজের, বিভিন্ন চরিত্রের ভূতের সমাবেশ ঘটেছে। তাদের সকলের অস্তিত্ব স্পষ্ট নয়। তবুও সংকলনকে আকর্ষণীয় করার জন্য নামী লেখকদের দামী গল্পগুলোকে বাছাই করা হয়েছে। প্রকাশক ও প্রকাশনীর সংশ্লিষ্ট যে সব কর্মীরা এই বই প্রকাশ করার জন্য সাহায্য করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। অন্যান্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

অরুণকুমার দত্ত

গল্পের সূচীপত্র

(১) সত্যজিৎ রায় — লক্ষ্ণৌর ডুয়েল ৫
(২) লীলা মজুমদার — তোজো ১২
(৩) শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় — টেলিফোনে ১৭
(৪) আশাপূর্ণা দেবী — নিজে বুঝে নিন ২১
(৫) অরুণকুমার দত্ত — অপার্থিব ৩৪
(৬) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — কেন দেখা দিল না ৩৯
(৭) সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় — নিশির ডাক ৪৩
(৮) বিমল মিত্র — রাত তখন এগারোটা ৪৬
(৯) গজেন্দ্রকুমার মিত্র — সস্তার বাড়ি ৫১
(১০) কুমারেশ ঘোষ — এসেছি জ্ঞানবাবু ৫৯
(১১) হিমানীশ গোস্বামী — রামকিঙ্করবাবুর অদ্ভুত ভাড়াটে ৬১
(১২) মঞ্জিল সেন — রাত্রির যাত্রী ৬৯
(১৩) শক্তিপদ রাজগুরু — ভূতেরা বেইমান নয় ৭৩
(১৪) দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — সাদা ভূত কালো ভূত ৭৭
(১৫) পার্থ চট্টোপাধ্যায় — মধ্যরাতের আতঙ্ক ৭৯
(১৬) স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় — জঙ্গল মহলের দুর্গ ৯০
(১৭) শেখর বসু — চোর তাড়াতে ভূত ৯৮
(১৮) ছন্দা বাগচী — হাইকোর্টের ভূত ১০১
(১৯) শিশির মজুমদার — সেই লোকটা ১০৩
(২০) পরেশ দত্ত — ফিরে পাওয়া ১০৭
(২১) আবুল বাশার — ভূতের চিরুনি ১১১
(২২) সংকর্ষণ রায় — মরুগ্রাস ১১৮
(২৩) ভবানীপ্রসাদ দে — নোটন ১২৪
(২৪) শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — একদিন রাত্রে ১২৭
(২৫) সুনীল দাস — চোখের আলোয় ১২৯
(২৬) রতনতনু ঘাটী — অন্য মহিম ১৩৩
(২৭) ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় — বছর কুড়ি আগে ১৩৯
(২৮) অদ্রীশ বর্ধন — অজানা শক্তি ১৪৬
(২৯) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ — রাত দুপুরে অন্ধকারে ১৫১
(৩০) অনিন্দ্য বক্সী — দূরের সঙ্কেত ১৫৫
(৩১) নিরূপ মিত্র — ভূত ধরার গল্প ১৫৭
(৩২) প্রণবেশ চক্রবর্তী — যে কাহিনী কাউকে বলা হয়নি ১৬১
(৩৩) বরেন গঙ্গোপাধ্যায় — লোকটা কে ১৬৮
(৩৪) আনন্দ বাগচী — গিরিধারীর গেরো ১৭৩

www.arisumu.com

লখনৌর ডুয়েল

সত্যজিৎ রায়

'ডুয়েল মানে জানিস?' জিগ্যেস করলেন তারিণীখুড়ো।

'বাঃ ডুয়েল জানব না?' বলল ন্যাপলা। 'ডুয়েল রোল, মানে দ্বৈত ভূমিকা। সন্তোষ দত্ত গুপী গাইনে ডুয়েল রোল করেছিলেন—হাল্লার রাজা, গুণ্ডীর রাজা।'

'সে ডুয়েলের কথা বলছি না,' হেসে বললেন তারিণীখুড়ো। 'ডি-ইউ-এ-এল নয়, ডি-ইউ-ই-এল ডুয়েল। অর্থাৎ দুজনের মধ্যে লড়াই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি জানি!' আমরা সকলে একসঙ্গে বলে উঠলাম।

'এই ডুয়েল নিয়ে এককালে কিছু পড়াশোনা করেছিলুম নিজের শখে,' বললেন তারিণীখুড়ো। 'ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইটালি থেকে ডুয়েলিং-এর রেয়াজ ক্রমে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তরোয়াল জিনিসটা ছিল ভদ্রলোকদের পোশাকের একটা অঙ্গ আর অসি চালনা বা ফেনসিং শেখাটা পড়ত সাধারণ শিক্ষার মধ্যে। একজন হয়ত আরেকজনকে অপমান করল, অমনি অপমানিত ব্যক্তি ইজ্জত বাঁচাবার খাতিরে অন্যজনকে ডুয়েল চ্যালেঞ্জ করল; এই চ্যালেঞ্জ অগ্রাহ্য করাটা রেয়াজের মধ্যে পড়ত না, ফলে সোর্ড ফাইট শুরু হয়ে যেতো। মান যে বাঁচবেই এমন কোনো কথা নেই, কারণ যিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন তিনি অসি চালনায় তেমন নিপুণ নাও হতে পারেন। কিন্তু তাও চ্যালেঞ্জ করা চাই, কারণ অপমান হজম করাটা সেকালে অত্যন্ত হেয় বলে গণ্য হত।

'বন্দুক-পিস্তলের যুগে অবিশ্যি পিস্তলই হয়ে গেল ডুয়েলিং-এর অস্ত্র। সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনা। এই ডুয়েলিং-এ তখন এত লোক মরত আর জখম হত, যে এটাকে বেআইনী করার চেষ্টা ইতিহাসে অনেকবার হয়েছে। কিন্তু এক রাজা আইন করে বন্ধ করলেন ত পরের রাজা ঢিলে দেওয়াতে আবার চালু হয়ে গেল ডুয়েলিং। আর কতরকম তার আইনকানুন!—দুজনকেই হুবহু একরকম অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে, দুজনেরই একটি করে "সেকেণ্ড" বা আম্পায়ার থাকবে যাতে কারচুপির রাস্তা বন্ধ হয়; দুজনকেই দাঁড়াতে হবে এমন জায়গায় যাতে পরস্পরের মধ্যে আন্দাজ বিশ গজের ব্যবধান থাকে, আর চ্যালেঞ্জারের সেকেণ্ড "ফায়ার" বলা মাত্র দুজনের একসঙ্গে গুলি চালাতে হবে। তোরা জানিস কিনা জানি না, এই ভারতবর্ষেই—না, ভারতবর্ষ কেন—এই কলকাতাতেই, আজ থেকে দুশো বছর আগে এক বিখ্যাত ডুয়েল লড়াই হয়েছিল?'

ন্যাপলাও দেখলাম জানে না; সেও আমাদের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

'যে দুজন লড়েছিলেন,' বললেন তারিণীখুড়ো,

'তাঁদের একজন ত জগদ্বিখ্যাত। তিনি হলেন ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস। প্রতিপক্ষের নাম ফিলিপ ফ্রানসিস। ইনি ছিলেন বড়লাটের কাউনসিলের সদস্য। হেস্টিংস কোনো কারণে ফ্রানসিসকে একটি অপমানসূচক চিঠি লেখেন। ফ্রানসিস তখন তাঁকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করে। আলিপুরে এখন যেখানে ন্যাশনাল লাইব্রেরি, তারই কাছে একটা খোলা জায়গায় এই ডুয়েল হয়। ফ্রানসিস চ্যালেঞ্জ করেছেন, ফলে তাঁরই এক বন্ধুকে জোড়া-পিস্তল জোগাড় করতে হল, এবং তিনিই "ফায়ার" বলে চেঁচালেন। পিস্তলও চলেছিল একই সঙ্গে, কিন্তু মাটিতে জখম হয়ে পড়লেন মাত্র একজনই—ফিলিপ ফ্রানসিস। তবে সুখের বিষয় সে-জখম মারাত্মক হয়নি।'

'ইতিহাস ত হল,' বলল ন্যাপলা, 'এবার গল্প হোক্। ডুয়েলিং যখন আপনার মাথায় ঘুরছে, তখন মনে হচ্ছে ডুয়েল নিয়ে নির্ঘাৎ আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে।'

খুড়ো বললেন, 'তোরা যা ভাবছিস সেরকম অভিজ্ঞতা না থাকলেও, যা আছে শুনলে তাক্ লেগে যাবে।'

দুধ-চিনি ছাড়া চায়ে চুমুক দিয়ে, পকেট থেকে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি বিড়ির প্যাকেট আর দেশলাইটা বার করে পাশে তক্তপোষের ওপর রেখে তারিণীখুড়ো তাঁর গল্প শুরু করলেন—

আমি থাকি তখন লখ্‌নৌতে। রেগুলার চাকরি বলে কিছু নেই, এবং তার বিশেষ প্রয়োজনও নেই, কারণ তার বছর দেড়েক আগে রেঞ্জার্সের লটারিতে লাখ দেড়েক টাকা পেয়ে, তার সুদেই দিব্যি চলে যাচ্ছে। আমি বলছি ফিফ্‌টি ওয়ানের কথা। তখনও আর এমন ম্যাগির বাজার ছিল না, আমি একা মানুষ, মাসে পাঁচ-সাতশো টাকা হলে দিব্যি আরামে চলে যেত। লাটুশ রোডে একটা ছোট্ট বাংলো বাড়ি নিয়ে থাকি, 'পায়োনীয়ার কাগজে মাঝে মাজে ইংরিজিতে চুট্‌কি গোছের লেখা লিখি, আর হজরতগঞ্জের একটা নিলামের দোকানে যাতায়াত করি। নবাবদের আমলের কিছু কিছু জিনিস তখনও পাওয়া যেত। সুবিধের দামে পেলে ধনী আমেরিকান টুরিস্টদের কাছে বেচে বেশ টুপাইস লাভ করা যেত। অবিশ্যি আমার নিজেরও যে শখ ছিল না তা নয়। আমার বৈঠকখানা ছোট হলেও তার অনেক জিনিসই ছিল এই নিলামের দোকানে কেনা।

এক রবিবার সকালে দোকানে গিয়ে দেখি জিনিসপত্তরের মধ্যে রয়েছে একটা খয়েরি রঙের মেহগনি কাঠের বাক্স, এক হাত লম্বা, এক বিঘত চওড়া, ইঞ্চি তিনেক পুরু। ভেতরে কী থাকতে পারে আন্দাজ করতে পারলাম না, তাই জিনিসটা সম্বন্ধে কৌতূহল গেল বেড়ে। নিলামে অনেক জিনিসই উঠেছে, কিন্তু আমার মনটা পড়ে রয়েছে ওই বাক্সের দিকে।

অবশেষে প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষা করার পর দেখলুম নিলামদার বাক্সটাকে হাতে তুলে নিয়েছেন। আমি টান হয়ে বসলুম। যথারীতি গুণকীর্তন শুরু হল।—'এবারে একটি অতি লোভনীয় জিনিস আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। এর জুড়ি পাওয়া ভার। দেখুন, এই যে ঢাকনা খুলছি আমি। দুশো বছরের পুরোনা জিনিস, অথচ এখনো এর জেল্লা অম্লান রয়েছে। জগদ্বিখ্যাত আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুতকারক জোসেফ ম্যান্টনের ছাপমারা এক জোড়া ডুয়েলিং পিস্তল! এই জোড়ার আর জুড়ি নেই!. . .'

আমার তো দূর থেকে দেখেই হয়ে গেছে। ও জিনিসটা আমার চাই। আমার কল্পনা তখনই খেলতে শুরু করে দিয়েছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের বিশ হাত দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'ফায়ার!' শোনামাত্র গুলি চালাচ্ছে, আর তার পরেই রক্তাক্ত ব্যাপার!

এই সব চিন্তা মাথায় ঘুরছে, নিলামও হয়ে চলেছে, চারবাগের এক গুজরাটি ভদ্রলোক সাড়ে সাতশো বলার পর আমি ধাঁ করে হাজার বলাতে দেখলাম ডাকাডাকি বন্ধ হয়ে গেল, ফলে বাক্স সমেত পিস্তল দুটি আমারই হয়ে গেল।

জিনিসটা দোকানে দেখে যতটা ভালো লেগেছিল, বাড়িতে এসে হাতে নিয়ে তার চেয়ে যেন শতগুণে বেশি ভালো লাগল। পিস্তলের মতো পিস্তল বটে। যেমন তার বাঁট, তেমনি তার নল। পুরো পিস্তল প্রায় সতের ইঞ্চি লম্বা। তার গায়ে পরিষ্কার খোদাই করা রয়েছে মেকারের

নাম—জোসেফ ম্যান্টন। বন্দুক সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা আগেই করা ছিল; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলন্ডে বন্দুক বানিয়ে হিসেবে যাদের সবচেয়ে বেশি নামডাক ছিল, তার মধ্যে জোসেফ ম্যান্টন হলেন একজন।

লখ্‌নৌ গিয়েছি সবে মাস তিনেক হল। ওখানে বাঙালীর সংখ্যা বিশেষ নয়, কিন্তু তখনো পর্যন্ত তাদের কারুর সঙ্গে তেমন পরিচয় হয়নি। সন্ধ্যাবেলাটা মোটামুটি বাড়িতেই থাকি; আমি ছাড়া থাকে একজন রান্নার লোক আর একটি চাকর। পিস্তল দুটো কেনা অবধি মাথায় ডুয়েলিং সংক্রান্ত একটা প্লট ঘুরছে, তাই খাতা-কলম নিয়ে আরাম কেদারায় বসেছি, এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। কোনো বিদেশী খদ্দের নাকি? পুরোন জিনিসের সাপ্লায়ার হিসেবে আমার কিছুটা পরিচিতি এর মধ্যেই হয়ে গেছে।

গিয়ে দরজা খুললুম। একজন সাহেবই বটে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, বোঝাই যায় এদেশে অনেকদিনের বাসিন্দা, এমন কি জন্মও হয়ত এখানেই। অর্থাৎ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান!

'গুড ইভিনিং।'

আমিও প্রত্যভিবাদন জানালুম। সাহেব বলল, 'একটু দরকার ছিল। ভেতরে বসতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই।'

সাহেবের উচ্চারণে কিন্তু দোআঁশলা ভাব নেই একদম।

ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় এনে বসালাম। এইবার আলোয় চেহারাটা আরো স্পষ্ট বোঝা গেল। সুপুরুষই বলা চলে। চুল কটা। একজোড়া বেশ তাগড়াই গোঁফ তাও কটা, চোখের মণি নীল, পরনে ছেয়ে রঙের সুট। আমি বললুম, 'সাহেব, আমি ত মদ খাই না, তবে যদি বলো ত এক পেয়ালা চা বা কফি করে দিতে পারি।' সাহেব বললে যে তার কিছুরই দরকার নেই, সে এইমাত্র বাড়ি থেকে ডিনার খেয়ে আসছে। তারপর তার আসার কারণটা বললে।

'তোমায় আজ সকালে দেখলাম হজরতগঞ্জের অকশন হাউসে।'

'তুমিও ছিলে বুঝি সেখানে?'

'হ্যাঁ—কিন্তু তুমি এত তন্ময় ছিলে তাই বোধহয় খেয়াল করনি।'

'আসলে একটা জিনিসের ওপর খুব লোভ ছিল—'

'সেটা তো তোমারই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ডুয়েলিং পিস্তল—জোসেফ ম্যান্টনের তৈরী। ইউ আর ভেরি লাকি!'

আমি একটা কথা না জিগ্যেস করে পারলাম না।

'ওটা কি তোমার কোনো চেনা লোকের সম্পত্তি ছিল?'

'হ্যাঁ—তবে সে বহুদিন হল মারা গেছে। তারপর কোথায় চলে গিয়েছিল জিনিসটা জানতাম না। ওটা কি আমি একবার হাতে নিয়ে দেখতে পারি? কারণ ওটার সঙ্গে একটা কাহিনী জড়িত রয়েছে, তাই. . .'

আমি সাহেবের হাতে পিস্তলের বাক্সটা দিলুম। সাহেব সেটা খুলে পিস্তলটা বার করে উদ্ভাসিত চোখে সেটা ল্যাম্পের কাছে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললে, 'এই পিস্তল দিয়ে এক ডুয়েল লড়া হয়েছিল এই লখ্‌নৌ শহরে, সেটা বোধহয় তুমি জান না?'

'লখ্‌নৌতে ডুয়েল!'

'হ্যাঁ। আজ থেকে দেড়শো বছর আগের ঘটনা। একবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে। সত্যি বলতে কি, আর তিন দিন পরেই ঠিক দেড়শো বছর পূর্ণ হবে। ষোলই অক্টোবর।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'খুব আশ্চর্য ত! কিন্তু ডুয়েলটা কাদের মধ্যে হয়েছিল—?'

সাহেব পিস্তলটা ফেরত দিয়ে আবার সোফায় বসে বললে, 'সমস্ত ঘটনাটা আমার এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শোনা যে আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। . ডাঃ জেরিমায়া হাডসনের মেয়ে অ্যানাবেলা হাডসন তখন ছিল লখ্‌নৌ-এর নামকরা সুন্দরী। ডাকসাইটে তরুণী; ঘোড়া চালায়, বন্দুক চালায়—দুটোই পুরুষের মতো। এদিকে আবার ভালো নাচতে পারে, গাইতে পারে। সেই সময় লখ্‌নৌতে এক তরুণ ইংরেজ আর্টিস্ট এসে রয়েছেন, নাম জন ইলিংওয়ার্থ। তাঁর আসল মতলব

নবাবের ছবি এঁকে ভালো ইনাম পাওয়া, কিন্তু অ্যানাবেলার সৌন্দর্যের কথা শুনে আগে তার একটা পোট্রেট করার প্রস্তাব নিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। ছবিও হল বটে, কিন্তু তার আগেই ইলিংওয়ার্থ অ্যানাবেলাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে।

'এদিকে তারই কিছুদিন আগে একটা পার্টিতে অ্যানাবেলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে চার্লস ব্রুসের। লখ্‌নৌ ক্যান্টনমেন্টে তখন বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা বড় অংশ ছিল, তারই ক্যাপ্টেন ছিলেন চার্লস ব্রুস। ব্রুসও প্রথম দর্শনেই অ্যানাবেলার প্রেমে পড়ে গেলেন।

'পার্টির দুদিন বাদে আর থাকতে না পেরে অ্যানাবেলার বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন ক্যাপ্টেন ব্রুস। গিয়ে দেখেন একটি অচেনা তরুণ অ্যানাবেলার ছবি আঁকছেন। ইলিংওয়ার্থ তেমন জোয়ান পুরুষ না হলেও চেহারাটা তাঁর মন্দ ছিল না। তাঁর হাবভাবে তিনিও যে অ্যানাবেলার প্রতি অনুরক্ত এটা বুঝতে ব্রুসের দেরি লাগল না। শিল্পী জাতটাকে ব্রুস এমনিতেই অবজ্ঞা করেন, বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি অ্যানাবেলার সামনেই ইলিংওয়ার্থকে একটা অপমানসূচক কথা বলে বসলেন।

ইলিংওয়ার্থের মধ্যে যা গুণ ছিল তা সবই শিল্পীসুলভ গুণ, আর তাঁর প্রবৃত্তিগুলি ছিল কোমল। কিন্তু আজ অ্যানাবেলার সামনে এই অপমান তিনি হজম করতে পারলেন না। তিনি ব্রুসকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। ব্রুসও খুশি মনে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। ডুয়েলের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল—ষোলই অক্টোবর, ভোর ছটা।

'তুমি জান বোধহয় যে যারা ডুয়েল লড়বে তাদের একজন করে সেকেন্ডের দরকার হয়?'

আমি বললাম, 'জানি। এরা আম্পায়ারের কাজ করে, অর্থাৎ লক্ষ্য রাখে যে ডুয়েলের নিয়মগুলো ঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কি না।'

'হ্যাঁ। সচরাচর এই সেকেন্ডটি হয় যে ডুয়েল লড়বে তার বন্ধুস্থানীয় কেউ। লখ্‌নৌ শহরে ইলিংওয়ার্থের পরিচিতের সংখ্যা বেশি না হলেও, সরকারী দপ্তরের এক কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর বেশ আলাপ হয়েছিল। এঁর নাম হিউ ড্রামন্ড। ইলিংওয়ার্থ ড্রামন্ডকে অনুরোধ করলেন এক জোড়া ভালো পিস্তল জোগাড় করে দিতে, কারণ ডুয়েলের নিয়ম অনুযায়ী দুটো পিস্তল ঠিক একরম হওয়া চাই। এ ছাড়া ইলিংওয়ার্থের দ্বিতীয় অনুরোধ হল ড্রামন্ড যেন তাঁর সেকেন্ডের কাজ করেন, ড্রামন্ড রাজি হলেন। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন ব্রুসও তাঁর বন্ধু ফিলিপ মক্সনকে তাঁর সেকেন্ড করলেন।

'ডুয়েলের দিন এগিয়ে এল। এর ফলাফল যে কী হবে সে সম্বন্ধে কারুর মনে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ পিস্তলে ক্যাপ্টেন ব্রুসের লক্ষ্য অব্যর্থ, আর ইলিংওয়ার্থ তুলি চালনায় নিপুণ হলেও পিস্তল চালনায় একেবারেই অপটু।'

এই পর্যন্ত বলে সাহেব থামল। আমি ব্যগ্রভাবে জিগ্যেস করলুম, 'শেষ পর্যন্ত কী হল?'

সাহেব মৃদু হেসে বলল, 'প্রতি বছর ষোলই অক্টোবর ভোর ছটায় কিন্তু এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।'

'কোথায়?'

'ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিল সেখানে। দিলখুসার পশ্চিমে গুমতী নদীর কাছে একটা মাঠে তেঁতুল গাছের নীচে।'

'পুনরাবৃত্তি মানে?'

'যা বলছি তাই। ওখানে তরশু ভোর ছটায় গেলে পুরো ঘটনাই চোখের সামনে ঘটতে দেখবে।'

'বলছ কী! এ তো ভৌতিক ব্যাপার!'

'আমার কথা মানার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তুমি নিজেই গিয়ে যাচাই করে এসো তিনদিন পরে।'

'কিন্তু আমি কি জায়গাটা ঠিক চিনে যেতে পারব? আমি ত বেশিদিন হল এখানে আসিনি। লখ্‌নৌএর ভূগোলটা এখনো—'

'তুমি দিলখুসা চেনো ত?'

'তা চিনি।'

'দিলখুসার বাইরে আমি পৌনে ছটায় তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

'বেশ। তাই কথা রইল।'

সাহেব বিদায় নিয়ে চলে গেল। তারপরই খেয়াল হল যে ভদ্রলোকের নামটাই জানা হয়নি। অবিশ্যি সেও আমার নাম জিগ্যেস করেনি। যাই হোক, নামটা বড় কথা

নয়; যে কথাগুলো সে বলে গেল সেগুলোই হল আসল। বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এই শহরেই এককালে এরকম রোমান্টিক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, এবং আমারই হাতে রয়েছে এক জোড়া পিস্তল যেগুলো এই ঘটনায় একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার ভাগ্যে জুটল অ্যানাবেলা হাডসন? এবং আরো একটা প্রশ্ন—এই দুজনের মধ্যে কাকে ভালবেসেছিল অ্যানাবেলা?

আশা করি ষোল তারিখে অভিযানেই এই সব প্রশ্নের জবাব মিলবে।

ক্রমে এগিয়ে এল ষোলই অক্টোবর। পনরই রাত্তিরে একটা গানের জলসা থেকে বাড়ি ফিরছি। রাস্তায় দেখা সেই সাহেবের সঙ্গে। বলল, 'তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম তোমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য।' আমি বললাম, 'আমি যে শুধু ভুলিনি তা নয়, অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে আগামীকাল সকালের জন্যে অপেক্ষা করে আছি।'

সাহেব চলে গেল।

ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ভোর পাঁচটায় উঠে এক কাপ চা খেয়ে গলায় একটা মাফ্‌লার চাপিয়ে নিয়ে একটা টাঙ্গা করে বেরিয়ে পড়লাম দিলখুসার উদ্দেশে। শহরের একটু বাইরে দিলখুসা এককালে ছিল নবাব সাদাত আলির বাগানবাড়ি। চারিদিকে ঘেরা প্রকাণ্ড পার্কে হরিণ চরে বেড়াত। কখনো-সখনো জঙ্গল থেকে এক-আধটা চিতাবাঘও নাকি এসে পড়ত বাড়ির ত্রিসীমানায়। এখন সে বাড়ির শুধু খোলটাই রয়েছে। তবে তার পাশে একটা ফুলবাগিচা এখনো মেনটেন করা হয়, লোকে সে না বেড়াতে যায়।

ছটা বাজতে কুড়ি মিনিটে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে টাঙ্গাওয়ালাকে বললুম, 'তুমি যদি আধঘন্টা অপেক্ষা কর, তাহলে আমি আবার এই গাড়িতেই বাড়ি ফিরে যেতে পারি।' উর্দুটা ভালো জানা ছিল আগেই, তাই বোধহয় খানদানী আদমী ভেবে টাঙ্গাওয়ালা রাজি হয়ে গেল।

গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা এগোতেই একটা অর্জুন গাছের পাশে দেখি সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। বললে সেও নাকি মিনিট পাঁচেক হল এসেছে।

'লেট্‌স গো দেন।'

বললুম, 'চলো সাহেব—তুমিই তো পথ জান, তোমার পিছু নেব আমি।'

মিনিট পাঁচেক হাঁটতেই একটা খোলা মাঠে এসে পড়লুম। দূরে বিশেষ কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ চারিদিকে একটা আবছা কুয়াশায় ঢাকা। হয়ত ডুয়েলের দিনেও ঠিক এমনি কুয়াশা ছিল।

আগাছা আর কাঁটা ঝোপে ঘেরা একটা পোড়ো বাড়ির কাছে এসে সাহেব থামল। দেখেই বোঝা যায় সেটা প্রাচীনকালে কোনো সাহেবের বাড়ি ছিল। অবিশ্যি আমাদের কারবার এই বাড়িটাকে নিয়ে নয়। সেটাকে পেছনে ফেলে আমরা দাঁড়ালাম পূব দিকে মুখ করে। কুয়াশা হলেও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সামনে কিছু দূরে রয়েছে একটা তেঁতুল গাছ, আর তার ডাইনে আমাদের থেকে হাত চল্লিশেক দূরে রয়েছে একটা বেশ বড় ঝোপ। আর সব কিছুর পিছন দিয়ে বয়ে চলেছে গুমতী নদী। নদীর পিছনে কুয়াশা হলেও আন্দাজ করা যায় ওদিকটায় বসতি নেই। সব মিলিয়ে অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশ।

'শুনতে পাচ্ছ?' সাহেব হঠাৎ জিগ্যেস করল।

কান পাততেই শুনতে পেলুম। ঘোড়ার খুরের শব্দ। গা-টা যে ছমছম করছিল না তা বলতে পারি না। তবে তার সঙ্গে একটা অভিনব অভিজ্ঞতার চরম প্রত্যাশা।

এইবার দেখলুম দুই অশ্বারোহীকে। আমাদের বাঁ দিকে বেশ দূর দিয়ে এসে তেঁতুল গাছটার নিচে দাঁড়ালেন।

'এঁরা দুজনেই কি লড়বেন?' আমি ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করলুম।

সাহেব বলল, 'দুজন নয়, একজন। দুজনের মধ্যে লম্বাটি হলেন জন ইলিংওয়ার্থ, অর্থাৎ যিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন। অন্যজন ইলিংওয়ার্থের সেকেন্ড ও বন্ধু হিউ ড্রামন্ড। ওই দেখ ড্রামন্ডের হাতে সেই মেহগনি বাক্স।'

সত্যিই ত! এবার বুঝলুম আমার রক্ত চলাচল দ্রুত হতে শুরু করেছে। আমি যে দেড়শো বছর আগের একটি ঘটনা আজ ১৯৫০ সালে লখ্‌নৌ শহরে দাঁড়িয়ে দেখতে চলেছি, সেই চিন্তা আমার হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছে।

মিনিট খানেকের মধ্যেই দুটো ঘোড়ায় ক্যাপ্টেন ব্রুস ও তাঁর সেকেন্ড ফিলিপ মক্সন এসে পড়লেন। তারপর

ড্রামন্ড বাক্স থেকে পিস্তল দুটো বার করে তাতে গুলি ভরে ব্রুস ও ইলিংওয়ার্থের হাতে দিয়ে তাঁদের যেন কি সব বুঝিয়ে দিলেন।

পিছনের আকাশ গোলাপী হতে শুরু করেছে, গুমতীর জলে সেই রং প্রতিফলিত।

ব্রুস ও ইলিংওয়ার্থ এবার পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে দুজনেই গুনে গুনে চোদ্দ পা হেঁটে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে মুখোমুখি হলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো শব্দ শুনতে পাইনি, কিন্তু এবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পিস্তল উঁচিয়ে পরস্পরের দিকে তাক করার পর স্পষ্ট কানে এল ড্রামন্ডের আদেশ—

'ফায়ার!'

পর মুহূর্তেই শুনলাম একসঙ্গে দুই পিস্তলের গর্জন।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে ব্রুস ও ইলিংওয়ার্থ দুজনের দেহই একসঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সেই সঙ্গে আরেকটি দৃশ্য আমাকে আরো অবাক করে দিল। যে ঝোপটার কথা বলেছিলাম, সেটার পিছন থেকে এক মহিলা ছুটে বেরিয়ে কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'ফলাফল ত দেখলে,' বলল সাহেব। 'এই ডুয়েলে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছিল।'

বললাম, 'তা ত বুঝলাম, কিন্তু ঝোপের পিছন থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে চলে গেলেন, তিনি কে?'

'দ্যাট ওয়াজ অ্যানাবেলা।'

'অ্যানাবেলা!'

'ইলিংওয়ার্থের গুলিতে ক্যাপ্টেন ব্রুস মরবে না এটা অ্যানাবেলা বুঝেছিল—অথচ ওর দরকার ছিল যাতে দুজনেই মরে। তাই সে আর ঝুঁকি না নিয়ে "ফায়ার" বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই পিস্তল দিয়ে ব্রুসকে মারে। ইলিংওয়ার্থের গুলি ব্রুসের গায়ে লাগেইনি।'

'কিন্তু অ্যানাবেলার এই আচরণের কারণ কী?'

'কারণ সে ওই দুজনের একজনকেও ভালবাসেনি। ও বুঝেছিল ইলিংওয়ার্থ মরবেন, এবং ব্রুস বেঁচে থেকে ওকে বিরক্ত করবেন। সেটা ও চায়নি, কারণ সে আসলে ভালবাসত আরেকজনকে—যাকে সে পরে বিয়ে করে এবং যার সঙ্গে সে সুখে ঘর করে।'

আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে দেড়শো বছরের পুরোন ডুয়েলের দৃশ্য দ্রুত মিলিয়ে আসছে। কুয়াশাও যেন আরো ঘন হচ্ছে। আমি আশ্চর্য হয়ে অ্যানাবেলার কথা ভাবছি, এমন সময় একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম।

'হিউ! হিউ!'

'অ্যানাবেলা ডাকছে,' বললে সাহেব।

আমার দৃষ্টি এবার সাহেবের দিকে ঘুরতেই শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা বিস্ময় ও আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেল। এ কাকে দেখছি চোখের সামনে? এর পোশাক বদলে গেল কি করে?—এ যে সেই দেড়শো বছর আগের পোশাক!

'তোমাকে আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি,' বলল সাহেব; তার গলার স্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে।—'আমার নাম হিউ ড্রামন্ড। ইলিংওয়ার্থের বন্ধুকেই ভালবাসত অ্যানাবেলা। গুড বাই. . .'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখলাম সাহেব ওই পোড়ো বাড়িটার দিকে অগ্রসর হয়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

টাঙ্গা করে বাড়ি ফিরে মেহগনির বাক্সটা খুলে পিস্তল দুটো আরেকবার বার করলাম। নলে হাত পড়তে গরম লাগল। এবার নলের মুখটা নাকের কাছে আনলাম। টাটকা বারুদের গন্ধ।

www.arisumu.com

তোজো

লীলা মজুমদার

নবুর বড় বেশি ভয়। বেজায় গরীব এখানকার লোকরা; খেতে পায় না, পরতে পায় না; মাটি দিয়ে, উলুঘাস দিয়ে উলটানো ঝুড়ির মতো কি-সব বানায়, অনেকে তাকেই বলে ঘর। যাদের কুঁড়েঘর আছে তারা তো বড়লোক, গ্রামের মাতব্বর। হবে না গরীব? শুকনো খরা মাটি, কত কষ্টে ফসল ফলাতে হয়। তার ওপর একেক বছর বৃষ্টি হয় না; সব রোদে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে এদিকে খরা, কিন্তু পুন্নি নদীর উৎস যেখানে পাহাড়ের ওপরে, সেখানে মেঘ জমে বৃষ্টি পড়ে; নদীতে ঢল নামে। মানুষ, গরু ভেসে যায়। এখানকার লোকে ভালো হবে কি করে? দিন রাত রামুদা এই কথা বলে।

যারা রাতে দরজা বন্ধ করে শোয়, নবুর ফুটবল-মাঠের বন্ধুরা তাদের ওপর হাড়ে চটা। বলে, "টাকার গরম দেখাচ্ছে বুঝি? আমাদের কিচ্ছু নেই, তাই দরজা খুলে শুতে ভয় নেই। তোমরা কবাট দাও, হুড়কো আঁটো, চেষ্টা করেও কেউ ঢুকতে পারে না। তাই রাতে পথের মধ্যে একা পেলেই ধরে। খেলার মাঠ থেকে কক্ষণো একলা ফিরো না। আমাদের চাচা-মামারা জানতে পারলে—" এই বলে তারা মুখ বন্ধ করে। নবু ভয়েই আধ-মরা। সব দিন সঙ্গী কোথায় পাবে? কলকাতার বাড়িতে যারা কাজ করত, তাদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সব্বাইকে। বাবার অসুখ করেছে, কাজ করতে পারে না; খালি খালি শুয়ে বসে থাকে। মা রান্না করে। দাদুর বুড়ো চাকর বিশুকাকা এখানকার বাড়ি আগলায়। সে-ই গ্রামের হাটে গিয়ে কেনা-কাটা করে দেয় আর বুড়ো হাড় নিয়ে টিলার ওপর ওঠা-নামা করতে হয় বলে গজর-গজর করে। বনের মধ্যে কুঁড়েঘরে থাকে শিবু, সে কুয়ো থেকে ঠাণ্ডা মিষ্টি জল তুলে দেয় আর রান্নার কাঠ জোগায়। ওরা কাঠুরে। ওর ছেলে নটে মাঝে মাঝে নবুর সঙ্গে খেলার মাঠ থেকে ফেরে। ওর নবুর সমান বয়স, কিন্তু কি সাহস!

শিবু বলে, "আমাদের আবার কিসের ভয়, দাদা? ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। খেতে পায় না লোকে, দুটো পয়সার আশায় চুরিডাকাতি করে। আমাদের কাঁচকলাটাও নেই, তাই ভয়টাও নেই।"

যারা টিলার ওপর থাকে, তাদের খেলার মাঠ থেকে ফিরতে একটু দেরি হবে-ই। কলকাতায় সারারাত আলো জ্বলত, লোকে কথা বলত, গির্জার ঘড়িতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জানান দিত, ভয়টা কিসের? বুনো জন্তুটন্তু নেই। এখানে হুতুম প্যাঁচা ডাকে; বড় বড় বাদুড় ওড়ে; চামচিকে ক্কিচ্ ক্কিচ্ করে, ওরা ছোট ছেলেদের চোখ খুবলে নেয়। তাছাড়া চোর বাটপাড় ডাকাত তো আছেই! বনের মধ্যে কাপালিক আছে—তারা ছোট ছেলে বলি দেয়—নবুর

ভয়ের আর শেষ নেই। ভূতের ভয়, অন্ধকারের ভয়। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ঘোর অন্ধকার। পথে আলো নেই; পথ-ই নেই। গ্রামে আলো জ্বলে না। সেখানকার লোক বড় গরীব, তেল কেনার পয়সা নেই। আলো থাকতে থাকতে, মাঠঘাট থেকে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে, যে-যার শুয়ে পড়ে। মেয়েরা সব দিন রাঁধা-বাড়াও করে না, অত চাল কোথায় পাবে? বুনো শাকের কন্দ সেদ্ধ দিয়ে আমড়া পাতা, তেঁতুল পাতা, কাঁচা-লঙ্কা দিয়ে মেখে খায়। বলে রান্না ভাত খায় স্বর্গের লোকরা। তবে বুনো খরগোশ মারে; পাখি মারে; মাছ ধরে। কোনো রকমে বেঁচে থাকে। আনন্দও করে।

তাই বলে কি ওদেরও ভয় নেই? হায়না-হুণ্ডারের ভয় আছে; বড় বড় খ্যাঁকশেয়াল আসে। রাতে খ্যাক্-খ্যাক্-খ্যাক্-খ্যাঁক্ করে দল বেঁধে এসে হাঁস, মুরগি, শূকরছানা নিয়ে পালায়। ছোট ছেলেমেয়ে পেলে, তাও নাকি বাদ দেয় না। ওরা কুঁড়ে বাঁধে ভেতর দিকে মুখ করে, বাইরে দিকে যাওয়া-আসার জন্য ছোট্ট ছোট্ট ঘুলঘুলি রাখে। গোল করে পর পর ঘর বানায়, মধ্যিখানের খোলা জায়গায় সারারাত ধুনি জ্বালে; পালা করে পাহারা দেয়; সবাই মিলে শুকনো কাঠ জোগায়। তবে আজকাল বুনো জানোয়ারের উপদ্রব কমে গেছে, কিন্তু তার চেয়েও শতগুণে ভয়ঙ্কর মানুষেরা আছে। নবু সব্বাইকে ভয় করে।

খেলার মাঠের ছেলেরা নবুকে কাপ্তেন করে দিল। ওর বাবা ওদের একটা পুরনো কিন্তু ভালো ফুটবল দিয়েছিলেন, তাই। বাবা নাম-করা প্লেয়ার ছিলেন। ভয়ঙ্কর সাহস ছিল। তারপর পেটে বল লেগে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে, এখন দু'বছর কোনো কাজ করতে পারেন না। কলকাতার বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে, তাই দিয়ে ওদের চলে। টিলার ওপরে, সব চেয়ে উঁচুতে এই বাড়িটা দাদু বানিয়েছিলেন। এখানকার শুকনো বিশুদ্ধ হাওয়ায় নাকি ভাঙা স্বাস্থ্য জোড়া লাগে, জ্যাঠা বলেছেন।

ঐ কাপ্তেন হওয়াই ওর কাল হয়েছে। ওর বন্ধু শম্ভু থাকে টিলা যেখানে উঠতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেইখানে। সেখানে অনেকগুলো বাড়ি। স্কুলের হেড-মাস্টারের, ডাক্তারবাবুর, শম্ভুদের। সেখানে কোনো ভয় নেই। কিন্তু তার পরেই এঁকেবেঁকে পথ [illegible] তার দুধারে ঘন বন। টিলার পেছনে হাতিয়া-পাহাড়। টিলার ওপর দিয়ে হাতিয়া-পাহাড়ে যাবার রাস্তা আছে। সে বড় ভয়ানক জায়গা।

শম্ভুদের চাকর রামুদা বলে, "খরার সময় বড় খারাপ নবুদাদা, চাঁদার পয়সাগুলো পকেটে নিয়ে চললে ঝিন্ ঝিন্ করে বাজে, সবাই টের পায়। খেতে না পেলে মানুষরাও নেকড়ে-বাঘের মতো হিংস্র হয়ে ওঠে। তাছাড়া খরার সময় হাতিয়ার বন খালি করে হরিণরা দলে দলে নিচে নেমে আসে, গ্রামের লোকদের শস্যের ক্ষেত নষ্ট করতে। সবাই আসে টিলার পথ দিয়ে। তাই লোভে লোভে হায়না-হুণ্ডারও নেমে আসে। খুব সাবধানে পথ চ'ল দাদা, দুয়ের মধ্যে মানুষরাই বেশি হিংস্র।"

ভয়ে নবুর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু কি করা? শম্ভু বলে, "তুমি আমাদের বাড়িতে বসে পড়াশুনো করতে তো পার। রাতে রামুদা কাজ সেরে তোমাকে পৌঁছে দেবে!" রামুদা ফোঁস করে ওঠে, "রাতে ঐ গলায়-দড়েদের বনের পাশ দিয়ে একা ফিরতে আমি পারব না। জীবনবাবু তো অর্ধেক বাড়ি ভাড়া দিতে চায়, তোমার মা-বাবাকে নেমে আসতে বল না।"

নবু আস্তে আস্তে বলল, "টিলার ওপরে পরিষ্কার শুকনো হাওয়ায় থাকলে বাবার শরীর ভালো হবে। ঠিক আছে, এইটুকু তো পথ, আমি একলাই চলে যাব।"

রামুদা বলল, "তা যেতে পার। তবে মাঝপথের ঐ বড় অশ্বত্থ গাছে কিছু দেখলে ফিরে এসো।" নবু দু-হাতে দু-কান চেপে ধরে ছুটে রওনা দিচ্ছিল, শম্ভু ওর হাত ধরে টেনে বলল, "কোনো ভয় নেই রে। একবার 'তোজো' বলে ডাক দিস, কোনো ভূত কিম্বা মানুষ তোর কিচ্ছু করতে পারবে না।"

নবু বেজায় অবাক হয়ে বলল, "তোজো? তোজো কে?"

শম্ভু বলল, "বড়দের বলা বারণ, শেষটা যদি ধরিয়ে দেয়। তোজো একটা কুকুর। বাছুরের মতো বড়, ভীষণ হিংস্র। একেবারে বুনো হয়ে গেছে। বাঘের মতো ভয়ঙ্কর।"

নবুর হতভম্ব মুখ দেখে শম্ভু ব্যস্ত হয়ে উঠল, "ভয় কিসের? ও ছোটদের কিচ্ছু করে না, ভয়ঙ্কর ভালবাসে। দাদা বলে বনের মধ্যে নিশ্চয় ওর মালিক লুকিয়ে আছে।

হয়তো পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ তাকে দেখেনি। হাত-পা ভেঙে পঙ্গু হয়েও থাকতে পারে। তুই আবার যেন কারো কাছে বলিসনে। তাহলে ওকে পাগলা কুকুর বলে গুলি করে মেরে ফেলে দেবে আর মালিককে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেবে। কে জানে হয়তো সে মরেই গেছে।"

নবু বলল, "তোজো যদি তেড়ে আসে?"

শম্ভু হাসতে লাগল, " না, না, তোর যত ভয়! ডাকলেই বন থেকে বেরিয়ে এসে, হাতের তেলোয় মুখ গুঁজে, মুখের দিকে চেয়ে, ল্যাজ নাড়ে। কিন্তু বড়দের দেখলে গলার মধ্যে মেঘের মতো গুড়-গুড় করে। বড় কেউ বোধ হয় ওর মালিকের খুব ক্ষতি করেছিল। তাই বড়দের দেখতে পারে না। তোর কোনো ভয় নেই।"

"ওর নাম জানলে কি করে?"

"গলায় একটা কলার আছে, তাতে লেখা আছে। তোজো বলে ডাকলেই আসে। টিলার সব ছেলেমেয়েরা ওকে চেনে।"

নবুর বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। ও কুকুর ভালবাসে। বাবার বুকে বল্ লাগবার আগে কলকাতায় ওদের মস্ত কুকুর ছিল। ল্যাবাড্রর। তার নাম টাইগার। জ্যাঠা, বাবার গাড়িটা আর টাইগারকে নাকি বেচে দেবেন। কলকাতার বাড়ি ভাড়া দিয়ে, ওরা এখানে চলে এসেছে। নবু এখানকার মিশনারি স্কুলে ভরতি হয়েছে। সবাই সেখানে পড়ে। স্কুল ছুটি হলে স্কুলের কাছে খেলার মাঠে খেলে। মাসে দশ পয়সা ক্লাবের চাঁদা। গরীবদের দিতে হয় না । বন্ধুরা সবাই নিচে থাকে। টিলার ওপর নবুরা একা।

এ-বাড়িটা দাদুর বাবা করেছিলেন। বাগানের এক কোণে তাঁর সমাধি আছে। তাতে মরা মানুষ নেই। খালি একটা ছোট্ট শ্বেত পাথরের কৌটোয় এক মুঠো ছাই। এত বড় মরা মানুষটাকে পুড়িয়ে ফেললে সে এক মুঠো ছাই হয়ে যায়।

টাইগার নবুর খাটের পাশে মাটিতে শুত। কিন্তু মা-বাবা শুতে গেলে হাঁচড়-পাঁচড় করে ওর খাটে এসে উঠত। বেড়াল দেখলে নবুর গা শির-শির করে, কিন্তু কুকুর বড় ভালবাসে। তোজোর মুনিব যদি সত্যি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে তোজো নবুদের বাড়িতে থাকবে না কেন? বেশ পাহারা দেবে। নবু নিজে তার যত্ন করবে, স্নান করাবে। বুকটা টিপটিপ করতে লাগল।

শম্ভুকে নবু জিজ্ঞাসা করল, "সব ছেলেপুলেই ওকে দেখতে পায়? কই, আমি তো দেখিনি!"

"না ডাকলে আসে না। মিছিমিছি ডাকলেও আসে না। ভয় পেয়ে ডাকলে তবে আসে।"

নবু তো হাঁ। ও তো সব সময়ই ভয় পায়। এমন কি রাতের অন্ধকারে তালগাছের পাতা খসার সময় যে একটা বিশ্রী প্যাঁ-শ্ করে করে শব্দ হয়, তাতেও ওর ভয় করে। তোজো সঙ্গে থাকলে আর ভয় করবে না। কিন্তু তোজোর কলারটা যদি ছিঁড়ে পড়ে যায়, তাহলে কি হবে? এখানে তো প্রত্যেক মঙ্গলবার কলার-ছাড়া কুকুরদের রাস্তায় দেখলে মেরে ফেলা হয়। তাদের মধ্যে যদি পাগলা কুকুর থাকে, তাই । তোজোকে নতুন কলার কিনে দেবার পয়সা কোথায় পাবে? অবিশ্যি টাইগারের পুরোন কলারটা নবু লুকিয়ে নিয়ে এসেছে। সেটা নিশ্চয় তোজোর গলায় হবে।

তারপর থেকে নবু রোজ স্কুলে যাবার সময়, বনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিত, যদি তোজোকে দেখতে পায়। ডাকেনি কখনো; সে-রকম ভয় তো পায়নি, মিছিমিছি ডাকবে কেন? বনে ঢুকতে সাহস হত না। বড্ড নির্জন। গাছের তলা দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ, বাতাস বইলে গাছের পাতার মধ্যে ঝরঝর শব্দ, যেন উঁচু থেকে জল পড়ছে। কেমন ছায়ার মধ্যে কুচি-কুচি রোদ। সব মিলে যেন ডাকে "এসো, এসো, এসো।" যায়নি কখনো। স্কুলের দেরি-ও হয়ে যাবে, আবার কেমন গা শির-শির করে। সে কি ভয়, না ফুর্তি ,—নিজেই ভেবে পেত না।

ফেরার সময় এক্কেবারে অন্য রকম। বাপ রে, কি অন্ধকার বন! ঝিন্ ঝিন্ করে কি সব ডাকে। অনেক দূরে যেন কুচি-কুচি কিসের আলো নড়ে-চড়ে। জোনাকির চেয়ে বড়। সেদিকে তাকাতে ভয় করত। বিশুকাকার বউ বলে পরীদের দিকে দেখতে নেই । অমনি ভুলিয়ে নে যাবে, আর ফিরতে পারবে না। সারা জীবন খালি বনের মধ্যে ঘুরবে, বেরুবার পথ পাবে না, ফিরে ফিরে একই জায়গায় এসে পড়বে আর বাড়ির লোকদের মুখ দেখতে পাবে না।

আজকাল তত ভয় লাগে না। তোজো যদি ঐ বনে

থাকে, ডাকলেই কাছে আসে, তবে আর ভয় কিসের? কুকুররা মানুষদের বন্ধু । প্রাণ দিয়ে তাদের রক্ষা করে। টাইগার একবার—নাঃ, টাইগারের কথা ভাবলেই গলায় ব্যথা করে।

সেদিন বড্ড সন্ধ্যে হয়ে গেছিল। বিশুকাকা স্টেশন থেকে ক'টা মাগুর মাছ কিনে দিল, বাবার জন্য। ওকে ওষুধ আনতে যেতে হবে, দেরি হবে। একটা ছোট্ট চুপড়িতে মাছ নিয়ে নবু টিলায় চড়তে লাগল। টিলার নিচে শম্ভুদের গেটের কাছে বিদায় নেবার সময় রামুদাদা একবার বলল, "হ্যাঁ দাদা, মাছ নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় একা গাছতলা দিয়ে যাবে, সেটা কি ঠিক হবে? মাছটা বরং রেখে যাও, ভোরে দিয়ে আসব।"

নবু বলল, "না, বাবা রাতে মাগুর-মাছের স্টু খাবে। তাতে গায়ে জোর হয়। আমিও একটু খাই। মা খায় না, মেয়েমানুষ কিনা। ওদের জোর দিয়ে কি দরকার?" জোর করে হাসল নবু। ভেতরে ভেতরে ভয় করছিল। ভয় করলে ওর গা-বমি করত, পেট কামড়াত।

আরো কি বলতে যাচ্ছিল রামুদা, শম্ভু চটে গেল, "ভিতরে যাও তো রামুদা, তুমি ভারি ইয়ে। এক দৌড়ে চলে যা রে নবু, কিচ্ছু হবে না।"

তাই করল নবু। তাড়াতাড়ি টিলায় উঠতে লাগল। মুখ বন্ধ করে, নাক দিয়ে নিশ্বাস নিতে হয় আর নিশ্বাসের তালে তালে পা ফেলতে হয়। তাহলে হাঁপ ধরে না।

ঝপ্ করে অন্ধকার। দু-পাশে বন আর মাথার ওপর ঘন কালো মেঘ। নিচে থেকে এতটা বোঝেনি নবু। পা চালিয়ে চলল। হঠাৎ সামনে কিসের ছায়া। সামনের দিকটা উঁচু, পেছনটা নিচু, মস্ত বড় হায়না নাকি? মাছের গন্ধ পেয়েছে বোধ হয়। গলা থেকে একটা চাপা খ্যাক্-খ্যাক্ শব্দ করতে করতে একটু করে এগিয়ে আসছে!

নবু ফিসফিস করে বলল, "তোজো, তোজো, তোজো।" অমনি বাঁ হাতের তেলোর মধ্যে নরম ঠাণ্ডা এ কার নাক? টাইগার আসবে কোত্থেকে? তাকে তো জ্যাঠা বেচে দিয়েছে এতদিনে। নবুর কান্না এল। "তোজো, তোজো, তুই সত্যি এসেছিস্?" সামনের জানোয়ারটাও থমকে দাঁড়াল। কোথা থেকে মেঘের চাপা গর্জনের মতো একটা শব্দ হতেই এক লাফে বনের মধ্যে হাওয়া। কখন হাতের তেলো থেকে ঠাণ্ডা নাকটা সরে গেল কিচ্ছু টের পায়নি নবু। ও-ই কি তোজো? নাকি নবু এমনি ভেবেছিল?

মা মাছ নিয়ে বলল, "অত হাঁপাচ্ছিস কেন? কিছু হয়েছে?"

"ন্নাঃ। না, কিছু হয়নি। তাড়াতাড়ি উঠে এসেছি কিনা।"

সেদিন থেকে ভয় ভেঙে গেল নবুর। রোজ ছুটতে ছুটতে ওপরে চলে আসত। কোনো দিকে তাকাত না। জানত বনের মধ্যে তোজো আছে। ডাকলেই আসবে।

এমনি করে দেখতে দেখতে পূজা এসে গেল। বাবা তখন অনেক ভালো। বারান্দায় এসে, আরাম-চেয়ারে বসে বই পড়ে। নবুকে পড়ার কথা, খেলার কথা জিজ্ঞাসা করে। মাঝে মাঝে হাসে। ওখানেও চাঁদা তুলে পূজা হত। ক্লাবের ছেলেরা যে যা পারে সংগ্রহ করে কাপ্তানের কাছে দিল। নবু এত পয়সা নিয়ে কি করবে ভেবে পেল না। শম্ভু বলল, "আজ রাতটা তোর কাছে রাখ, কাল সতীশবাবুর কাছে জমা দিয়ে দিস্। উনিই তো পূজা কমিটির সেক্রেটারি।"

সঙ্গে সঙ্গে রামুদা বলল, "সাবধানে যাও, বাপু। কালু মাস্টারের ডাকাতের দল ধরা পড়েছে বটে, কিন্তু কালু নিজে দুজন স্যাঙাৎ নিয়ে ঐ বনে লুকিয়ে আছে।"

শম্ভু বলল, "চোপ্।"

রামুদা চটে গেল, "চোপ্ তো কচ্ছিস। কিন্তু গাঁয়ে ঐ রকম গুজব। ওর মামার বাড়ি তো এখেনে। লুকিয়ে খাবার দিচ্ছে তারা। কিন্তু থাকার জায়গা কোথায় পাবে? নবুর আবার পকেটে পয়সা ঝিন্‌ঝিন্ কচ্ছে!"

নবু কিছু না বলে, পকেটে হাত দিয়ে পয়সার ঝিন্‌ঝিন্ বন্ধ করে রওনা দিল।

তিন ভাগ পৌঁছে গেছিল নিরাপদে। তারপর যেখানে বন সবচেয়ে ঘন, সেখানে তিনটে লোক বেরিয়ে এসে পথ আগ্‌লাল। একজনের কপালে ফেট্টি বাঁধা, তাতে রক্তের দাগ। সকলে কি রকম রোগা, কালো, ঘেমো, চকচকে চোখ। দেখেই ভয় করে। ঠোঁট নেই, শুধু একটা লাইনের মতো। যার মাথায় ফেট্টি বাঁধা, অন্য দুজন তাকে ধরে রেখেছিল।

"এ্যাই, দাঁড়া!"

নবু দাঁড়িয়ে গেল।

"কোথায় যাচ্ছিস?"

"বাড়িতে।" "কোথায় বাড়ি?" "টিলার মাথায়।" "কে আছে সেখানে? "মা, বাবা।" "চাকরটা নেই?" "না, সে ওষুধ আনতে গেছে।" "তবে আর কি! তোকে বাড়ি যেতে হবে না। এখানে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখব। আমরা যাব তোর বদলে।" নবুর ঠোঁট কাঁপতে লাগল, "তাহলে আমার বাবা তোমাদের. . . . . "

"তোর বাবা!" বলে সে কি বিশ্রী করে হাসল ওরা, শুনে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়! "তোর বাবা তো ঘাটের মড়া! ভালোয় ভালোয় থাকতে দেয় তো ভালো! তা না হলে—"

নবু হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, "তোজো!" গলাটা কি রকম বিশ্রী ভাঙা ভাঙা শোনাল। সঙ্গে সঙ্গে বনের মধ্যে একটা হুড়মুড় শব্দ, আর তারার আলোয় নবু দেখল এই প্রকাণ্ড একটা কুকুর ছুটে এসে সেই লোকটার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে-ও তক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কপালে ফেট্টি-বাঁধা লোকটা আর অন্য লোকটা বিকট চিৎকার করতে করতে টিলার পথ ধরে দুদ্দাড় দৌড় দিয়ে একেবারে থানার দরজায় আছড়ে পড়ল।

নবু চেয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। ঐ লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর সে একা। তোজো কখন চলে গেছে। কিন্তু তারার আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখেছিল নবু। বুনো, বড়, কিন্তু অবিকল টাইগারের মতো দেখতে।

বাড়িতে গিয়ে জ্বর হয়েছিল নবুর। তারপর যখন ভালো হয়ে উঠল, দেখল জ্যাঠা এসেছেন। তাঁর সঙ্গে ও কি টাইগার নাকি!! নবু ভুলে তাকে তোজো! তোজো! বলে ডেকে গলা জড়িয়ে কেঁদেও ফেলল। টাইগারকে জ্যাঠা বেচে দেননি। বাবা নাকি ভালো হয়ে গেছেন। অ্যানুয়েল পরীক্ষার পর সবাই কলকাতায় ফিরে যাবে। নবুর মুখে 'তোজো' শুনে জ্যাঠা বেজায় অবাক হয়ে বাবাকে বললেন, "শুন্‌লি বটু, 'তোজো' বলে ডাকছে! আরে তোজো যে আমার বাবার কুকুর ছিল। এই টিলার ওপরেই ঠ্যাঙাড়ের হাত থেকে বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল! ও কি হল?"

নবু গায়ের জোরে টাইগারকে জাপ্টে ধরে বলল, "না, না, এ-ই তোজো! তোজো ছাড়া কেউ নয়।"

জ্যাঠা হেসে বললেন, "মনে আছে রে বটু, বাবা বলতেন, তোজো বড়দের দেখতে পারত না আর সব ছোটরা ওকে কি অসম্ভব ভালবাসত! ও মরে গেলে নাকি গাঁ সুদ্ধ ছেলেমেয়েরা সাতদিন কেঁদেছিল, ভাত খায়নি।"

নবু টাইগারের নাকে নাক লাগিয়ে ডাকল, "তোজো!" আর টাইগার ওর হাতের তেলোয় নাকটা গুঁজে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

টেলিফোনে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

টেলিফোন তুললেই একটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান. . .সিক্স ফোর নাইন ওয়ান. . . সিক্স ফোর নাইন ওয়ান. . .।''

সকাল থেকে ডায়াল-টোন নেই। টেলিফোনের হরেক গণ্ডগোল থাকে বটে, কিন্তু এ-অভিজ্ঞতা নতুন। গলাটা খুবই যান্ত্রিক এবং গম্ভীর। খুব উদাসীনও।

প্রদীপের কয়েকটা জরুরি টেলিফোন করার ছিল। করতে পারল না।

কিন্তু কথা হল একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর কেবল বারবার চারটে সংখ্যা উচ্চারণ করে যাচ্ছে কেন? এর কারণ কী? ঘড়ির সময় জানার জন্য বিশেষ নম্বর ডায়াল করলে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠে সময়ের ঘোষণা শোনা যায় বটে, কিন্তু এ তো তা নয়। মিনিটে-মিনিটে সময়ের ঘোষণা বদলে যায়, কিন্তু এই ঘোষণা বদলাচ্ছে না।

অফিসে এসে সে তার স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে টেলিফোনের ক্রটিটা এক্সচেঞ্জে জানাতে বলেছিল। তারপর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড় অফিসার। বহু বছর দিল্লিতে ছিল, সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে। কোম্পানিই তাকে বাড়ি, গাড়ি ও টেলিফোন দিয়েছে। তার আগে এই পদে ছিলেন কুরুপ্পু নামে দক্ষিণ ভারতের একজন লোক। তিনি রিটায়ার করে দেশে ফিরে গিয়ে ফুলের চাষ করছেন বলে শুনেছে প্রদীপ। খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন তিনি। রিটায়ার করার বয়স হলেও কোম্পানি তাঁকে ছাড়তে চায়নি। বরং আরও বড় পোস্ট দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। কুরুপ্পু কিছুতেই রাজি হননি।

দুপুরের লাঞ্চের আগে সে একটি পার্টিকে একটা বকেয়া বিলের জন্য তাগাদা করতে টেলিফোন তুলে ডায়ালের প্রথম নম্বরটার বোতাম টিপতেই আচমকা সেই উদাসীন, গম্ভীর, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান. . .তারপরই অবশ্য কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

প্রদীপ খুবই অবাক হয়েছিল। সামলে নিয়ে বাকি নম্বর ডায়াল করতে রিং বাজল এবং ওপাশে একজন ফোনও ধরল। প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিয়ে প্রদীপ খুব চিন্তিতভাবে অফিসের ইলেকট্রনিক টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। এই ফোনেও কণ্ঠস্বরটা এল কী করে? এসব হচ্ছেটা কী?

কলকাতার বাড়িতে প্রদীপের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। তার মা, বাবা, বোন, ভাই সব দিল্লিতে। সে বিয়ে করেনি। একা থাকে। একজন রান্নার ঠিকে লোক রেঁধে দিয়ে যায়। আর ঘরদোর সাফ করা, বাসন মাজা ও কাপড় কাচার জন্য ঠিকে একজন কাজের মেয়ে আছে। তারা কেউ বাড়িতে থাকে না। আলিপুরের নির্জন অভিজাত পাড়ায়

তিনতলার মস্ত ফ্ল্যাটে প্রদীপ সম্পূর্ণ একা। তবু প্রদীপ হঠাৎ ফ্ল্যাটের নম্বর ডায়াল করল এবং শুনতে পেল ওপাশে রিং হচ্ছে।

মাত্র তিনবার রিং বাজতেই কে যেন ফোনটা ওঠাল। কিন্তু কথা বলল না।

প্রদীপ বলল, "হ্যালো! হ্যালো!"

কেউ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পর ফোনটা কেউ আস্তে নামিয়ে রাখল।

দুপুরবেলাতেও প্রদীপের শরীর হিম হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী? যদি রং নম্বরই হয়ে থাকে তা হলেও তো ওপাশ থেকে কেউ না কেউ সাড়া দেবে!

বিকেলে পার্টি ছিল, ফ্ল্যাটে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল তার। আর ফেরার সময় মাথায় দুশ্চিন্তাটা দেখা দিল। সে অলৌকিকে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কোনও ব্যাখ্যাও তো পাওয়া যাচ্ছ না।

দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর একটু গা-ছমছম করছিল। তবে আলো জেলে ঝলমলে আধুনিক ফ্ল্যাটটার দিকে চেয়ে তার ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেল। তবে ফোনটার ধারেকাছে সে আর গেল না।

প্রদীপের গভীর ঘুম ভাঙল রাত দুটো নাগাদ। হলঘরে ফোন বাজছে। ঘুমচোখে সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দিল্লিতে মা বাবার শরীর খারাপ হল না তো!

ফোন ধরতেই শিউরে উঠল সে। সেই যান্ত্রিক উদাসীন গম্ভীর গলা বলতে লাগল, "সিক্স ফোর নাইন ওয়ান. . .সিক্স ফোর নাইন ওয়ান. . .সিক্স ফোর নাইন ওয়ান. . .।"

ফোনটা রেখে দিল সে। বাকি রাতটা আর ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দিল।

কলকাতার টেলিফোন-ব্যবস্থা যে খুব খারাপ, তা প্রদীপ জানত। তবু সকালে ব্রেকফাস্টের সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই প্রদীপ যখন কম্পিত বক্ষে গিয়ে টেলিফোন ধরল, তখন একটি অমায়িক কণ্ঠস্বর বলল, "সার, আপনি টেলিফোন খারাপ বলে কমপ্লেন করেছিলেন কাল। কিন্তু আমরা টেস্ট করে দেখেছি আপনার লাইনে তো কোনও গণ্ডগোল নেই। লাইন তো চালু আছে।"

"কিন্তু আমি যে টেলিফোনে একটা অদ্ভুত গলা শুনতে পাচ্ছি।"

"হয়তো ক্রস কানেকশান হয়ে গিয়েছিল। আমাদের যন্ত্রপাতি সব বহু পুরনো, তাই মাঝে-মাঝে ওরকম হয়। আপনি ডায়াল করে দেখুন এখন, লাইন ঠিক আছে।"

বাস্তবিকই লোকটা কানেকশান কেটে দেওয়ার পর ডায়াল-টোন চলে এল এবং অফিসের নম্বর ডায়াল করতেই লাইনও পেয়ে গেল প্রদীপ।

ফোন স্বাভাবিক হল বটে, কিন্তু প্রদীপের মাথা থেকে 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান. . .' গেল না। কাজকর্মের ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে নম্বরটা মনে পড়তে লাগল। এক-আধবার প্যাডে নম্বরটা লিখেও ফেলল।

বিকেলের দিকে কয়েকটা চিঠি সই করতে গিয়ে হঠাৎ চিঠির ওপরে টাইপ-করা তারিখটা দেখে সে একটু সচকিত হল। টু ফোর নাইন্টি ওয়ান। অর্থাৎ একানব্বই সালের দোসরা এপ্রিল। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান মানে কি এপ্রিলের ছয় তারিখ?

কথাটা টিকটিক করতে লাগল মাথার মধ্যে। অফিস থেকে বেরিয়ে সে গেল একটা ক্লাবে টেনিস খেলতে। তারপর একটা হোটেলে রাতে খাবার খেয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল। টেনিস খেলার ফলে ক্লান্ত শরীরে খুব ঘুম পাচ্ছিল। শোওয়ার আগে সে সভয়ে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। দিল্লিতে ফোন করে মা-বাবার একটা খবর নেওয়া দরকার। ফোন করাটা উচিত হবে কি? যদি আবার. . .?

না, ফোন তুলে ডায়াল-টোনই পাওয়া গেল। দিল্লির লাইনও পাওয়া গেল একবারেই। মা, বাবা, ভাই ও বোনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে মনটা হালকা লাগল। আজ শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন-চারদিন আর কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না। টেলিফোন স্বাভাবিক। দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগটাও আস্তে-আস্তে সরে যেতে লাগল মন থেকে।

কিন্তু রবিবার সকালে গল্‌ফ খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল প্রদীপ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। প্রদীপ অন্যমনস্কভাবে টেলিফোন তুলতেই সেই অবিস্মরণীয় যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দিস ইজ দ্য ডে. . .দিস ইজ দ্য ডে. . .দিস ইজ দা ডে. . .দিস ইজ

www.aristumu.com

দ্য ডে . . ।

সকালের আলোর মধ্যেও ভয়ে হঠাৎ হিম হয়ে গেল প্রদীপ। চিৎকার করে বলল, "হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অব ইট?"

অবিচলিত কণ্ঠস্বর একইভাবে বলে যেতে লাগল, "দিস ইজ দ্য ডে. . .দিস ইজ দ্য ডে. . ."

প্রদীপ চিৎকার করে ধমকাল, দু-একটা নির্দোষ গালাগালও দিল, কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু কণ্ঠস্বরের অধিকারী ওই একটা বাক্যই উচ্চারণ করে গেল।

এপ্রিলের কলকাতা এমনিতেই গরম। ফোনে চেঁচামেচির পর আরও ঘেমে উঠল সে। ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল। এর মানে কী?

হঠাৎ খেয়াল হল, আজ এপ্রিলের ছয় তারিখ। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান। আজকের দিনটা সম্পর্কে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে কি? কী বিশেষত্ব এই দিনটার?

আজ তো চমৎকার একটা দিন। আজ সারাদিন তার দারুণ প্রোগ্রাম। তাদের অফিসের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট মান্টু সিং সরখেরিয়ার আমন্ত্রণে তারা আজ যাচ্ছে কলকাতার বাইরে দিল্লি হাইওয়ের কাছে সরখেরিয়ার বিশাল বাগানবাড়িতে। সকালে সেখানে গলফ আর টেনিসের আয়োজন, দুপুরে বিশাল লাঞ্চ, সন্ধেবেলায় হাই টি। তারপরও গানবাজনা হবে। একেবারে ডিনার সেরে ফেরার কথা। এমন চমৎকার মজায় ভরা দিনটা নিয়ে চিন্তা করার কী আছে?

ফুরফুরে হাওয়ায় হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে দিল্লি রোড হয়ে সরখেরিয়ার বাগানবাড়িতে পৌঁছনোর সময় দুশ্চিন্তাটা কখন উবে গেল। অনেক অতিথি জড়ো হয়েছে, হাসি-হট্টগোল চলছে। গল্‌ফ কিট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ, এক কাপ কফি খেয়ে নিয়েই।

সরখেরিয়ার খামারের পাশেই গলফের বিশাল মাঠ।

মাঝে-মধ্যে ঝোপ-জঙ্গল, জলা। অনেক গল্‌ফ-খেলোয়াড় জড়ো হয়েছেন। খেলতে খেলতে সব দুশ্চিন্তা সরে গেল মাথা থেকে।

বলটা একটা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। প্রদীপ বল খুঁজতে সেখানে ঢুকল। জায়গাটা যেন অন্ধকার এবং দুর্গম। কিন্তু জঙ্গলটা এমন জায়গায় যে, গর্ত পর্যন্ত যেতে হলে এই জঙ্গলটি পোরোতেই হবে।

সেই জঙ্গলে নিচু হয়ে বলটা খুঁজবার সময়ে আচমকাই একটা দূরাগত কণ্ঠ যান্ত্রিকভাবে হঠাৎ বলে উঠল, "দিস ইজ দ্য ডে. . ."

একটা ক্লিক করে শব্দ হল কোথাও। সন্দেহজনক কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ প্রদীপের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই যেন কিছু জানান দিল। সে বিদ্যুৎ-গতিতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বজ্রপাতের মতো একটা বন্দুকের শব্দ হল। গাছের গোটা কয়েক ডাল প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেটের ঘায়ে ভেঙে পড়ল। তারপরই এক জোড়া পায়ের দ্রুত পালানোর শব্দ।

প্রদীপ যখন উঠে বসল তখন খানিকটা হতভম্ব হয়ে চারদিক দেখল সে। কেউ তাকে মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খুবই সামান্যর জন্য সে বেঁচে গেছে।

উঠে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে চারদিকটা দেখল সে। কে তাকে মারতে চায়? কেনই বা?

বন্দুকের শব্দ শুনে কেউ ছুটে আসেনি। তার কারণ আশেপাশে অনেকেই শিকারে বেরিয়েছে। বন্দুকের শব্দ হচ্ছেও আশেপাশে।

সারাদিনটা খুব অন্যমনস্কতার মধ্যে কেটে গেল প্রদীপের। ঘটনাটার কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করল না। রাতে বাড়ি ফিরে সে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, টেলিফোনে এই দিনটার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছিল তাকে। কিন্তু কেন? কে দিচ্ছিল?

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল। সভয়ে টেলিফোন ধরল প্রদীপ।

"হ্যালো।"

ওপাশ থেকে একটি ভরাট গলা তার নম্বরটা উচ্চারণ করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "এই নম্বর তো!"

"হ্যাঁ। আপনি কে?"

"আমি কুরুপ্পু। আপনি কে?"

"প্রদীপ রায়।"

"ওঃ, হ্যাঁ। আমি আপনার নাম জানি। দিল্লিতে ছিলেন। শুনুন, জরুরি একটা কথা আছে। সরখেরিয়ার এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকার একটা বিল আছে। আপনি কি সেটা পাস করে দিয়েছেন?"

"না। বিলটা একটু ইরেগুলার। ক্ল্যারিফাই করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে বলেছি।

"খুব ভাল। ওই বিলটা একদম জালি। কিন্তু বিলটা আটকালে আপনার বিপদ হতে পারে। সরখেরিয়া বিপজ্জনক লোক।"

"বোধ হয় আপনি ঠিকই বলেছেন। আজ কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।"

"হ্যাঁ, এরকম ঘটনা আরও ঘটতে পারে। কিন্তু ভয় পাবেন না, টেলিফোনটার দিকে মনোযোগী থাকবেন।"

এইবার প্রদীপ চমকে উঠে বলে, "হ্যাঁ, টেলিফোনেও একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে. . ."

কুরুপ্পু স্নিগ্ধ গলায় বললেন, "জানি, মিস্টার রায়, ভূত মাত্রই কিন্তু খারাপ নয়। অন্তত ওই ফ্ল্যাটটায় যে থাকে সে খুবই বন্ধু-ভূত। তাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করবেন না, ভয়ও পাবেন না। তা হলেই নিরাপদে থাকতে পারবেন। বিপদের আগেই সে সাবধান করে দেবে। আমাকেও দিত। তার পরামর্শেই আমি রিটায়ার করে ফুলের চাষে মন দিয়েছি। আচ্ছা গুড নাইট।"

প্রদীপ হাতের স্তব্ধ টেলিফোনটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

www.arisumu.com

নিজে বুঝে নিন

আশাপূর্ণা দেবী

রাত নাগাদ বারোটা।

ভুরসুট পরগনার প্রতাপপুরের বড়কর্তা জগদীশপ্রতাপ তাঁর কলকাতার বাড়ির তিনতলায় নিজের শোবার ঘরে একা একা বসে জোর আলো জ্বালিয়ে দুখানা মোটা খাতা সামনে বিছিয়ে হিসেবপত্র দেখছিলেন। যদিও জমিদারির বারোটা বেজে গ্যাছে কবেই। এখন তালপুকুরে ঘটি ডোবে না; তবু 'বড়কর্তা' নামটির মায়া ছাড়তে পারেননি জগদীশপ্রতাপ। এখনো প্রতাপপুরের কেউ 'বড়কর্তা' না বললে মনে মনে যথেষ্ট চটেন।

চটবার কারণও বিদ্যমান আছে বৈকি! ওই 'প্রতাপপুর' তো তাঁরই ঠাকুর্দার বাবু নৃসিংহপ্রতাপের খাশ 'পত্তন'। তাঁর নামেই প্রতাপপুর। তিনি নাকি দাবি করতেন তিনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যর জ্ঞাতিগুষ্টির।

তা জাকগে। কে কী না দাবি করছে।

তবে বোলবোলাও একখানা ছিল বৈকি। জগদীশপ্রতাপের বাবার আমলেও ছিল কিছু কিঞ্চিৎ।

জগদীশ অবশ্য তাঁর বাপের ঠাকুর্দা মহামান্য নৃসিংহপ্রতাপকে জ্ঞানে তেমন ভালো করে দেখেননি। আবছা মনে পড়ে, দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি খুব ভোরবেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে সূর্যপ্রণাম করছেন।

মন্তর পড়ছেন গমগমে গলায়।

এছাড়া আর বিশেষ কিছু মনে পড়ে না।

যা কিছু শোনা বাবার কাছে।

শুনতে পেয়েছেন সেই নৃসিংহপ্রতাপের জন্মদিনটি আর তাঁর মৃত্যুদিনটি এক।

নৃসিংহপ্রতাপের সেদিন সত্তর বছরের জন্মতিথি।

সকালবেলা ঠাকুর মন্দিরের ভোগ পুজো সব দেওয়া হয়ে গ্যাছে। নৃসিংহপ্রতাপ তিলবাটা মাথায় ঘষে দীঘিতে চান করে এসেছেন এবং এসে খিড়কির পুকুরে একটি জীওলমাছ ছেড়ে দিয়ে নিজের দীর্ঘায়ু নিজেই কামনা করে পূজোপাঠ করেছেন।

দুপরে যখন রুপোর থালা-বাসনে সত্তর প্রকার ব্যঞ্জন সাজিয়ে প্লাস বৃহৎ একটি রুই মাছের মুড়ো আর বড় জামবাটির একবাটি পরমান্ন নিয়ে যুঁই ফুলের মতো ফুরফুরে চামরমণি চালের ভাতটির সামনে খেতে বসেছেন আর গালচের আসনের ধারেকাছে মস্ত একটা পিলসুজের ওপর প্রকাণ্ড একখানা পেতলের প্রদীপ পেটভর্তি খাঁটি গাওয়া ঘি নিয়ে দপদপ করে জ্বলছে।

আগের আমলে এটাই ছিল জন্মদিনের শুভকাজের অঙ্গ। কেক কাটাকাটির তো চলন ছিল না। আর বয়স গুনে জ্বেলে দেওয়া মোমবাতির সারি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ারও পাট ছিল না। সেকালে লোকে বাতি নিভে

যাওয়াটাই অলক্ষণ কুলক্ষণ মনে করতো। তাই প্রদীপে পেটভর্তি তেল, মোটা করে সলতে।

আর খানদানি বাড়িতে প্রদীপের পেট ভরানো হত তেলের বদলে ঘিয়ে। আর প্রথম অন্নটি মুখে দেওয়া মাত্তর ভোঁ ভোঁ করে তিনবার শাখে ফুঁ দেওয়া।

তা সে পর্ব মিটেছে।

তোয়াজ করে খেয়ে চলেছেন নৃসিংহ। সত্তরটি পদ, সুযোগমতো একবারও অন্তত মুখে ঠেকাতে হবে। তো ঠ্যাকাতে ঠ্যাকাতে যখন চাটনিতে এসে ঠেকেছেন, তখন আবার তিনবার ভোঁ ভোঁ শঙ্খধ্বনি।

কী হোল? আবার শাঁখ?

জিগ্যেসে করতে না করতেই, ট্যাঁ ট্যাঁ কান্নার শব্দ। সদ্যোজাত শিশুর গগনবিদারী পরিত্রাহি শব্দ।

ওটা আবার কী? কাঁদে কে?

বুড়ি পিসি কাছে বসে পাখা নাড়ছিল। বলল,—ঘরে নতুন মানুষ এলো। তোর ব্যাটার ঘরে নাতি জন্মালো।

—অ্যাঁ, তাই নাকি? তার মানে নৃসিংহপ্রতাপের প্রপৌত্র এলো। তো আসবার কথা ছিল বুঝি?

—কথা ছিল বৈকি। তো দু-দশদিন বাদে আসার কথা। আচমকা আজই তোর জন্মদিনে হানকান করে ভূমিষ্ঠ হয়ে বসলো।

নৃসিংহ ক্ষীরের বাটিতে গোঁফ ডুবিয়ে মুচকে হেসে বললেন,—হুঁ। ব্যাটা খুব ধড়িবাজ হবে মনে হচ্ছে। ওরে কে আছিস। এই প্রদীপটায় আরো ঘি ঢেলে দিয়ে যা।

শুধু ঘি না, একেবারে খাঁটি গব্যঘৃত।

তো সেই প্রদীপ ঘি খেয়ে খেয়ে একনাগাড়ে জ্বলতে থাকল। ছ-দিন ছ-রাত। ষেটেরা পুজোর পরদিন সকালে তার ছুটি। রাতে বিধাতা-পুরুষ কপালে লেখন দিয়ে যাবার কাজ অবধি।

বিধাতা-পুরুষ কী লিখে গেলেন কে জানে। তবে সেই জগদীশের কাছে খাঁটি গব্যঘৃত এখন স্বপ্নের বস্তু।

সাবেকী মানটির ঠাটবাট রেখে চলেছেন এখনো। ভাতের পাতে ঘি, দুধ, দই, চাটনি, পাতিলেবু কম্পালসারি।

গাওয়া ঘি বলে দেশ থেকে ঘি আনান বেশী দাম দিয়ে। তো সেই খাঁটি ঘিয়ের আড়াই ভাগ বনস্পতি। আর বাকি দেড়ভাগ ভঁয়সা।

তাহলে কী হবে। দেশের ঘি বলে ওতেই আত্মপ্রসাদ জগদীশপ্রতাপের।

প্রতাপ'এর বালাই নেই কোথাও, তবু প্রতাপপুরের অহঙ্কার।

ওই যে নৃসিংহপ্রতাপের সঙ্গে জন্মদিনের মিল তাই তাঁর সঙ্গে যেন কেমন একাত্ম অনুভব করেন। আবার বাপের মুখে শুনেছেন চেহারাতেও নাকি মিল।

হলেও অবস্থান্তর, মনেপ্রাণে জগদীশ প্রতাপপুরের বড়কর্তা। চালচলনে তদুপযুক্ত ছাপ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা।

এই যে রাত দুপুরে খাতাপত্তর নিয়ে হিসেবে বসেছেন, তো টেবিল-চেয়ারের বালাই আছে নাকি? শোবার ঘরের মস্ত পালঙ্কটাকেই 'কাছারি ঘরের ফরাস' মনে করে তার মাঝখানে জোড়াসনে বসে সামনে খুলে রাখা জাবদা খাতা দুটো থেকে কীসব মেলামিলি করছেন।

আগে আগে ভারী কাঁচের দোয়াতদানি সামনে বসিয়ে কলমে কালি ডুবিয়ে লিখতেন। ছেলে বলে বলে ফাউন্টেন পেন ধরিয়েছিল। সম্প্রতি আবার 'আরো সুবিধে' দেখিয়ে নাতি ডটপেন ধরিয়েছে।

তা দেখছেন ব্যাপারটা মন্দ নয়। বেশ সুবিধের। কালের বদলের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধে বাড়ছে বৈকি! তবে অসুবিধেও যে বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, একথা জগদীশপ্রতাপ জোর গলায় ঘোষণা না করে ছাড়েন না।

এখন আর ছেলে তর্কে নামে না। তর্কটা নাতির সঙ্গে চলে। পাল্লাটা কোনদিকে ভারী, ডটপেনের না খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের—এ তর্কের মীমাংসা হয় না।

রোজই হিসেব চলে।

টেবিলে খাওয়া আরামের না মাটিতে বসে খাওয়ার। প্যান্ট, পায়জামা সুবিধের, না লম্বা কোঁচা ধুতির।

নাতির প্রশ্নে দাদুর জবাব,—পেন্টুল পাজামা তো একালে জমিদারেও পরে, জমাদারেও পরে। কিন্তু লম্বা কোঁচা? কই দেখা দিকি কোনো জমাদারের?

টেবিলে খাওয়া? যেন অফিস কাছারিতে কাজ করতে বসা। মাটিতে আসন পেতে ছড়িয়ে বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতাই আলাদা। হিসেব করে দ্যাখ।

তা সে যাক।

এখন জগদীশ যে হিসেব নিয়ে বসেছেন, সেটি বেশ জটিল।

প্রতাপপুরের 'বাবুদের বাড়িটি' মানে নৃসিংহপ্রতাপের বানানো সেই প্রাসাদটির এখন এমন জরাজীর্ণ অবস্থা ঘটেছে যে, মেরামতি করে একটু ভদ্রস্থ করতে হলেও লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। আসবে কোথা থেকে সে টাকা? আর সারিয়ে তুলেই বা কী হবে? কে বাস করতে যাবে সেই ভরসুট পরগনার প্রতাপপুরে?

ছেলের মতে বেচে দাও। বরং ঘরে কিছু আসবে। মরা হাতি লাখ টাকা, ওই ভাঙা বাড়িরও এখন অনেক দাম পাওয়া যাবে।

ভিটে আবার বেচব কি?

বলে প্রথমে খুব রাগারাগি করেছিলেন জগদীশপ্রতাপ। ক্রমশ যুক্তিতর্কে নিমরাজী! কিন্তু মুশকিল এই—নয় নয় করেও সেখানে এখনো অনেক আসবাবপত্তর। যাওয়াও হয় সেখানে। অন্তত জগদীশ তো যান।

সবাই যে 'বড়কর্তা' বলে ছুটে আসে, এ গৌরব কি দার্জিলিং, কাশ্মীর, নৈনিতাল পাহাড়ে গেলে হবে?

তা সেসব যখন চুকেবুকে যাচ্ছে জিনিসগুলো কী হবে? ছেলে আর বৌমা বলল—এখানে কাজে লাগার মতো যা কিছু আছে নিয়ে আসুন। বাকি বিলিয়ে দিয়ে আসুন।

কিন্তু এখানে কাজে লাগবার মতো অনেক কিছুই তো একে একে আনা হয়েছে। আর কী আনা হবে? ঘরে ঘরে যে বৃহৎ বৃহৎ পালঙ্ক বসানো আছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যে কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকগুলো আছে এখানে সেখানে, বৈঠকখানা বাড়িতে যে ঝাড়লণ্ঠনটা ঝুলছে সেগুলো বিলোতে চাইলেই বা নেবে কে? কার ঘরে এত জায়গা আছে?

তাছাড়া আর একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার আছে যেটা নিয়েই এখন সমস্যা আর হিসেবনিকেশ। জগদীশের ঠাকুমা একটা বড়লোকের গিন্নির দেমাকে আবদার করেছিলেন, তাঁর 'লক্ষ্মীর ঘরটি র অর্থাৎ পুজোর ঘরটির পুরো মেজেটা টাকা গেঁথে গেঁথে বাঁধিয়ে দিতে হবে। যেমন সব কাশী-বৃন্দাবনের মন্দিরে দেখে এসেছেন।

যে কথা সেই কাজ।

আনানো হলো বস্তাভর্তি চকচকে আসলি চাঁদির টাকা। কোনোটায় মহারানীর মুখ, কোনোটায় তাঁর ন্যাড়ামাথা ছেলের মুখ। তা সেটি গুছিয়ে সাজিয়ে গাঁথতে মিস্ত্রিরাই পারবে। ডাকা হলো হিন্দু রাজমিস্ত্রি মুকুন্দকে। ঠাকুর ঘর বলে কথা! চিরকেলে রাজমিস্ত্রি রসিদ আর আবদুল হেসে হেসে বলল,—বাড়িখানা কিন্তু আমরাই বানিয়েছিলুম মা-ঠাকরুন। আপনার ওই লক্ষ্মীর ঘরটিও।

তা হোক, এখন ঘরে উঁচু তাকে লক্ষ্মীর পট। নতুন ধানের হাঁড়ি। সেসব থাকবে। শুধু মেজেটা খোঁড়াখুঁড়ি। তারপর টাকা গেঁথে গেঁথে মেজে বানিয়ে ফেলা।

এখন জগদীশ মহাফাঁপরে পড়েছেন ওই ঘরটার হিসেব নিয়ে। ক-হাত বাই ক-হাত ঘর। তার মেজেটা জুড়ে যে টাকা পোঁতা হয়েছে সে কত টাকা।

পুরনো তস্য পুরনো সব খাতাপত্তর থেকে মজুর মিস্ত্রিদের দৈনিক 'রোজ'-এর হিসেব।

মুকুন্দর রোজ ছ'আনা, তার মজুরের রোজ দু-আনা। কিন্তু ক'দিন লাগল আর কতগুলো টাকা পুঁতল তার হিসেব পাচ্ছেন না কোথাও। তাই রাত জেগে সেই আদ্যিকালের খেরো বাঁধান খাতা নিয়ে আঁতিপাঁতি খুঁজছেন।

ছেলে বলল,—অত হিসেবের কী আছে? যখন খোঁড়াখুঁড়ি করতে লাগবে, তখন কেউ পাহারা দিতে উপস্থিত থাকবে। যত যা ওঠে।

তবে সত্যি টাকার এখন অনেক দাম। ষোলো আনার টাকা এখন অনেক অনেক বেশি দামে বিক্রি করা যাবে।

কিন্তু কে বসে পাহারা দেবে?

ছেলে বলে,—আপনার ঠাকুমার আবদারকেও বলিহারি যাই বাবা। ঘরের মেজেয় টাকা গেঁথে বাহার করে দিতে হবে। তিনি টাকা মাড়িয়ে মাড়িয়ে হাঁটা চলা করবেন। অথচ টাকা না কি মা-লক্ষ্মী, পা ঠেকে গেলে নমস্কার করতে হয়।

ছেলের বৌ বলল,—সেকালে জমিদার-গিন্নিদের অহঙ্কারই ছিল আলাদা। সত্যি টাকা মাড়ানো উচিত?

জগদীশ বললেন,—এ প্রশ্ন আমিও করেছিলাম বাবাকে। বাবা বলেছিলেন, দেবমন্দিরে তো থাকে, এ

তো ওঁর পুজোর ঘর, লক্ষ্মীর মন্দির।

এখন পরের জেনারেশান বুঝুক ঠ্যালা।

বাড়ি বেচে দেব চুকে যাবে। তা নয় তার মেজে খোঁড়াও, টাকা ওপড়াও। তো গুনে দেখেছেন কখনো কত টাকা গাঁথা আছে?

ওরে বাবা! কে আবার কবে গুনে দেখতে গ্যাছে।

কিন্তু এখন ভাবছেন জগদীশ, গোনা থাকলে ল্যাঠা মিটে যেতো। খোঁড়াখুঁড়ির মিস্ত্রিকে কড়া করে বলে দেওয়া যেতো, দ্যাখো বাপু, এই আছে, একটুও যেন এদিক ওদিক না হয়।

সে শাসানির উপায় নেই।

তবু এই সত্তর বছরের জগদীশ এই রাত বারোটায়, বাড়ির সবাই যখন ঘুমে কাদা, আর রাস্তা নিঃঝুম, তখন পালঙ্কের ওপর বাবু গেড়ে বসে সামনে খেরোর খাতা খুলে সেকালের নায়েব গোমস্তাদের 'অনিন্দনীয়' ছাঁদের হাতের লেখা সব হিসেবপত্তর তন্ন তন্ন করে দেখছেন, যদি কোথাও লেখা থাকে কত টাকা পোঁতা হয়েছিল।

হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ পড়ে গেল। আর চোখ যেন সেখানেই ফ্রীজ হয়ে গেল।

'কলিকাতার ট্যাঁকশাল হইতে আনয়ন করা হইল দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা ও. . . সের গিনি।'

কত সের? বোঝবার উপায় নেই। ঠিক সেইখানটাই পোকায় খেয়েছে।

দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা।. . . এত সের গিনি।'

হঠাৎ ভারী রাগ হয়ে গেল জগদীশপ্রতাপের। কর্তারা সব যা ইচ্ছে করে গ্যাছেন। আর পরের জেনারেশনের ভাগ্যে শুধু ডুগডুগি।

টাকার হিসেব, গিনির হিসেব সংখ্যা নিয়ে নয়, মণ সের দিয়ে। সাপের পা দেখেছিলেন সব?

টাকা থাকলেই এই ভাবে নয় ছয় করতে হবে?

রাগের চোটে জগদীশপ্রতাপের মনে পড়ল, না চিরকালের পৃথিবীতে আদি অনন্তকাল তাই হয়ে আসছে। টাকা থাকলেই নয় ছয়। শুধু 'নয়-ছয়ের' রীতি-পদ্ধতিটাই স্থান কাল পাত্রের হিসেবে আলাদা হয়।

নবাব বাদশারা তাদের জুতোয় হীরে মুক্তো সেঁটে বাহার করতেন। খানদানি বাবুরা পোষা বেড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করতেন। আর বড় মানুষের গিন্নিরা শখ হলে তাঁর দাঁড়ের ময়না পাখি, টিয়া পাখির দাঁড়টাকে সোনা দিয়ে গড়িয়ে নিতেন।

তা শুধু সে যুগে কেন, এ যুগেও কি টাকা নয় ছয়ের কোনো হিসেব আছে? হুঁ। এ যুগে অতো সোনারুপোর বাহার না দিক, শখের খাতিরে লাখ লাখ টাকা আকাশেই উড়িয়ে দেয়, বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। কে ভাবতে যাচ্ছে দেশের কত লোক খেতে পাচ্ছে না।

রাগটা একটু প্রশমিত হলে জগদীশপ্রতাপ ভাবলেন, তা তো হলো। রুপোর টাকা ঠাকুর ঘরের মেজেয় আর দেওয়ালের খানিকটা পর্যন্ত যে গেঁথে রাখা হয়েছে, সেটা তো চাক্ষুষই দেখেছি। তবে টাকাগুলোর ওজন যে দেড় মণ তা কে ভাবতে গ্যাছে?

বেশ মনে পড়ে ছেলেবেলায় জগদীশ আর তাঁর পিঠোপিঠি দিদি ঠাকুরঘরে গেলেই গুনতে বসতেন, কতগুলো টাকা মহারানী মার্কা, কতগুলো ন্যাড়ামাথা রাজা মার্কা।

কিন্তু গিনি?

গিনি তো কোথাও সাঁটা থাকতে দেখেননি।

অথচ খাতায় পষ্ট করে গিনির হিসেব লেখা রয়েছে। গিনি. . .সের। লক্ষ্মীছাড়া কাগুজে পোকারা কেটে খাবার আর জায়গা পায়নি। ওই 'কত' সের তার সংখ্যাটি হাপিস করে দিয়েছে।

তা দিক, ছিল তো কিছু। দশ সের পাঁচ সের এক সের আধ সের যা হোক। কিন্তু কোথায় তারা?

মাথাটা আরো ঝুঁকিয়ে খাতাটা আরো তন্ন তন্ন করে দেখছেন, হঠাৎ যেন সামনে একটা ছায়া পড়ল।

কে?

চমকে উঠলেন জগদীশ।

—কে? কে? কেরে ব্যাটা?

ব্যাপারটা কী? যতই রোগা সিড়েঙ্গে আর তোবড়ানো চেহারা হোক, রাত বারোটায় ঘরের মধ্যে ঢুকে এল কীভাবে?

তবে কি আজ জগদীশ দরজায় খিল লাগাতে ভুলে গেছলেন? কিন্তু এমন ভুল তো হয় না জগদীশের।

গিন্নি চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়ার পর থেকে তো একাই

থাকতে হয়। কাজেই বেশ জম্পেশ করেই সব বন্ধ ক'রে তবে শোন।

ওঃ। দৈবাৎ একদিন হয়তো ভুলে গেছেন, আর অমনি ব্যাটা চোর এসে সেঁধিয়েছে? কোথায় ওৎ পেতে বসে থাকে?

যাক, সাবধানতার ঘাটতি নেই জগদীশের। কারণ এই ঘরেই লোহার সিন্দুক।

এখন সংসারের সব গয়নাপত্তর আর দরকারী কাগজপত্র ভল্টে রেখে আসার ফ্যাসান হয়েছে। জগদীশ এ ফ্যাসানের গাড্ডায় পড়তে রাজি নন। ছেলে বৌ যত বলে বলুক।

চোখের সামনে না থাকলে জিনিসটা ক্রমেই ছায়া হয়ে যাবে না? একবার খুলে দেখবার ইচ্ছে হলে দেখতে পাবেন?

কেন মজবুত সিন্দুকের অভাব আছে বাজারে?

আর তোমার গিয়ে ব্যাঙ্কই বা কী নিরাপদ? রাতদিনই তো ব্যাঙ্ক ডাকাতি, ব্যাঙ্ক লুঠ।

জগদীশের মাথার শিয়রে লোহার সিন্দুক, মাথার বালিশের তলায় রিভলবার।

এর থেকে বুকের বল আর কিসে?

কে? বলে উঠেই জগদীশ হাত বাড়িয়ে মাথার বালিশের তলায় হাত চালিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের মূর্তিটা বলে উঠল, উঁ-হু-হু, দোহাই বড়কত্তা, অমন কাজটা করবেন না। ওতে আপনার লোকসান বৈ লাভ হবে না।

বড়কর্তা!

তার মানে চেনা চোর।

অর্থাৎ প্রতাপপুরের জানিত।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন,—হুঁ। তা সত্যি তোর মতন একটা ছুঁচোকে মেরে গুলিটাই লোকসান। তো কে তুই?

আজ্ঞে কেউ না।

কেউ না। বটে? তামাশা? তবে তো দেখছি মরণের কাল ঘনিয়ে এসেছে তোর। ইষ্টনাম স্মরণ কর ব্যাটা। এই চালালাম হাত বালিশের তলায়।

আজ্ঞে বড়কর্তামশাই, আমাদের মতো নিকৃষ্ট জনের আবার ইষ্টোনাম। আর বাঁচাই বা কী, মরাই বা কী!

—হুঁ। খুব কথা জানিস দেখছি। তো বড়কর্তা বললি কোন্ সুবাদে?

—শৈশবাবধি শুনে আসছি; ওই সুবাদে।

—বুঝেছি। প্রতাপপুরের 'মাল'। তো বাঘের ঘরে ঘোগ? বড়কর্তার ঘরে এসে সেঁধিয়েছিস চুরি করতে?

—আ ছি ছি! অমন কথা বলবেন না কর্তা! আপনার ঘরে সেঁদুবো চুরির মতলবে?

—বটে? তা' মাঝরাত্তিরে দোরটা একটু খোলা পেয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে এসেছ কীসের মতলবে যাদু? কর্তার পা টিপে দিতে না পাকাচুল তুলে দিতে?

—হিসেবের খাতাটা পোকায় কেটেছে দেখে চিন্তে করছিলেন। তাই ভাবলুম. . . ।

জগদীশ সোজা হয়ে চড়া গলায় বলে ওঠেন,—বলি, তুই লোকটা কে? নাম কী?

—আজ্ঞে জ্ঞানাবধি তো দেখে আসছি সবাই বৈকুণ্ঠ বলে ডাকে।

—বটে, নাম জানো না? সবাই বৈকুণ্ঠ বলে ডাকে সেটাই জানো। পাজি বদমাশ। একটা কথার সিধে জবাব দিতে জানো না? বলি প্রতাপপুরে তো মেলাই বৈকুণ্ঠ। টেকো বৈকুণ্ঠ, খোঁড়া বৈকুণ্ঠ, কুমীর-খাওয়া বৈকুণ্ঠ. . ।

—আজ্ঞে ওনারা তো সব সজ্জন। এ হতভাগা হচ্ছে মুকুন্দ মিস্ত্রির ব্যাটা, মিস্ত্রি বৈকুণ্ঠ। এখন অবশ্য পাবলিকে বলে. . . ।

—অ্যাঁ, কী বললি?

স্প্রীঙের পুতুলের মতো ছিটকে খাড়া হয়ে বসলেন জগদীশ।

—চালাকি খেলতে আসার আর জায়গা পাওনি ব্যাটা? রাগের মাথায় আপন খুড়োর মাথাটা থান ইঁটের ঘায়ে গুঁড়ো করার দায়ে তোর না ফাঁসি হয়েছে! আর তুই ব্যাটা. . ।

লোকটা অকুতোভয়ে বলে,—আজ্ঞে ফাঁসি হয় নাই, একথা তো বলি নাই। সেই তরেই তো বলতে যাচ্ছিলুম, এখন পাবলিকে নামটা উচ্চারণ করতে বলে 'খুনে বৈকুণ্ঠ'। আমার ঘরখানাকে বলে 'খুনে বৈকুণ্ঠর বাড়ি।'

—ওঃ। তা ফাঁসির ফাঁস আলগা করে ফেলে

www.arisumu.com

জেলখানা থেকে পালিয়েছিলি তাহলে? বদলে আর একটা নকল বৈকুণ্ঠ ফাঁসিতে ঝুলল?

আ, ছি ছি।—শিউরে উঠল লোকটা ঃ ওকথা বলবেন না কর্তা। প্রাণে বড় দাগা পাবো। তবে হ্যাঁ, ঘটছে এমন ঘটনা রাতদিনই। জেলখানার মধ্যে কতজনাই যে অপরের নামে 'প্রক্সি' দিয়ে ঘানি ঘোরাচ্ছে, পাথর ভাঙছে, তার সীমে-সংখ্যা নাই। আর ফাঁসি? তাও মাঝে মধ্যে দু-একটা প্রক্সি চলে বৈকি! তা ওসব হলো গে পয়সাওলা লোকদের কারবার। হতোভাগা বৈকুণ্ঠ মিস্ত্রির বলে পাস্তোর ওপর নুন জুটতো না। সে কিনতে যাবে ফাঁসি খাবার মানুষ! হ্যা।

—থাম বদমাশ! কেবল প্যাঁচানো কথা।

জগদীশ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠে রিভলবারটা টেনে বের করে বাগিয়ে ধরে বললেন,—সিধে জবাব দে। বলি, ফাঁসিটা শেষতক হয়েছিল, না রদ হয়ে গিয়েছিল?

—আজ্ঞে গরিবগুর্বোর কী আর শাস্তি রদ হয় বড়কর্তা? সেও বড় মানুষদের ঘটনা।

—ফের? বললাম না, সিধে জবাব দিবি। বলি, ফাঁসিটা হয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কার হয়েছিল?

—ওই তো রাজমিস্ত্রি বৈকুণ্ঠের।

—তাহলে তুই কে?

—ওই তো বললুম, আজ্ঞে 'কেউ' বললে ওই বৈকুণ্ঠ মিস্ত্রি! আবার 'কেউ না' বললেও চুকে যায়।

—আবার!

জোরে একটা ধমক দিতে যাচ্ছিলেন জগদীশপ্রতাপ। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়ল। তার সঙ্গে জগদীশ-এর ছেলে অমিতপ্রতাপের উদ্বিগ্ন গলার স্বর,—বাবা, দরজাটা একটু খুলুন তো!

জগদীশ একটু হতচকিত হলেন। তাহলে তো ঘরের দরজা বন্ধই আছে। ভুলে খুলে রাখিনি। তবে? ওই পাজিটা অথবা পাগলটা ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে?

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মাথায় খেলে গেল, তার মানে, ব্যাটা আগেই কোনো ফাঁকে ঢুকে পড়ে খাটের নীচে-টিচে লুকিয়েছিল। জগদীশ যখন খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন

তখন তো আর দরজায় তালা লাগিয়ে যাননি। এবার থেকে তাই করতে হবে দেখছি।

তা এসব মুহূর্তের চিন্তা।

খাট থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে দরজাটা সাবধানে খুলতে গেলেন, পাছে বৈকুণ্ঠবাবাজী ফস্ করে বেরিয়ে সটকান দেন।

কিন্তু এ আবার কী! কোন ফাঁকে ফট্ করে কোথায় গা-ঢাকা দিল?

কোথায় আর, সেই খাটের নীচেই। আচ্ছা থাকো বাবাজী। দ্যাখো তোমার কী হয়।

দরজাটা খুলেই নিজেই প্রশ্ন করলেন, —কী হল?

ছেলে বলল, —আমাদের আবার কী হবে। আপনার কী হল তাই জানতে এলাম। মনে হল হঠাৎ যেন কাউকে ধমকে উঠলেন।

জগদীশ মনে মনে হাসলেন। বাবুর কান মাঝরাতেও খাড়া।

—ও হ্যাঁ। তা দিয়েছিলাম বটে।

—এত রাত্তিরে—বন্ধ ঘরের মধ্যে কাকে?

খাটের নীচের দিকে একটু অলক্ষ্যে তাকিয়ে জগদীশ একটু মজা করার গলায় বললেন,—'কাউকে' বললে কাউকে। আবার 'কাউকে নয়' বললে নয়।

ছেলের পিছু পিছু বৌমাও চলে এসেছে। দুজনে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে বলল,—মানে?

—মানে এক ব্যাটা ছুঁচো এসে জ্বালাচ্ছিল. . . ।

বৌমা ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে বলল,—এই ওপরের ঘরে ছুঁচো!

—সেই তো. . . .।

ছেলে চমকে উঠে বলল,—বাবা, আপনার রিভলবারটা খাটের ওপর পড়ে কেন?

—ওই তো. . . ।

জগদীশ অম্লান গলায় বলেন,—ভেবেছিলাম, জ্বালাচ্ছে, নিকেশ করে দিই। তো ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে আর ইচ্ছে করল না।

কী কাণ্ড! ঘরের মধ্যে ছুঁচো।

তো সেটাকে তো তাড়াতে হবে।

ছেলে ফটাফট ঘরের আর দুটো আলো জেলে দিয়ে আলনায় ঝোলানো জগদীশের শৌখিন ছড়িটা নিয়ে খটাখট তাড়া লাগিয়ে ঘর তোলপাড় করে তুলল।

খাটের নীচেটায়?

তা দেখল বৈকি। টর্চ জেলে হেঁট হয়ে।

ইত্যবসরে নাতিও ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে।

—কী হয়েছে দাদু? এত রাত্তিরে সবাই হট্টগোল করছ কেন?

দাদু অপ্রতিভভাবে বলেন,—কিছু না দাদু, ঘরের মধ্যে একটা ছুঁচো ঢুকে পড়েছিল, সেটাকে তাড়াতেই —কিন্তু কোন্ ফাঁকে সে হাপিস হয়ে গেল? অবশ্য ছুঁচো, 'চোর বললে চোর'।

—চোর? অ্যাঁ কই? কোথা দিয়ে পালাল?

জগদীশের চিন্তার সুর,—তাইতো ভাবছি।

—বাবা!

অমিতপ্রতাপ বলল,—আপনি রাত অবধি জেগে জেগে ওইসব পচা পচা ভুতুড়ে খাতাগুলো দেখতে বসবেন না। খাতাগুলো দেখলেই তো আমার মাথা ঝিমঝিম করে।

আর ছেলের কথা শেষ হতে না হতেই বৌমা বলে উঠল,—আর রাতের খাওয়াটাও একটু হালকা হলে ভালো হয়। আপনাদের প্রতাপপুরের পাঠানো ক্ষীরের সঙ্গে খাজা কাঁঠাল পাকা আম আর তার সঙ্গে খাস্তা লুচি চটকে মেখে—ওঃ আমার তো দেখেই পেট ব্যথা করে। খাবার কথা ভাবতেই পারি না।

—হা-হা-হা।

জগদীশপ্রতাপ এই মাঝরাত্তিরেই ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন।

—তা পারবে কোথা থেকে?—জন্মাবধি তো ভয়ে ভয়ে না খেয়ে খেয়ে নাড়ি মারা। আমার ঠাকুর্দা একটা আস্ত কাঁঠাল খেতেন, বুঝলে? একাসনে বসে এককুড়ি বড় সাইজের ল্যাংড়া আম। আর একটা ছাগলও একা সাবাড় করতে পারতেন। আমার ঠাকুমাটিও কম যেতেন না। বলতেন, আমের সময় আবার দু-বেলা ভাত খেয়ে মরি কেন?. . .তাই তাঁর রাতে ভাতের পাট থাকত না। দাসীরা কেউ একজন এক ঝুড়ি আম, এক গামলা জল

আর একখানা বঁটি নিয়ে বসতো। আর ঠাকুমা বসতেন একখানা খালি থালা আর এক কাঁসি ভর্তি মাছের ঝাল নিয়ে। একটির পর একটি আম ছাড়িয়ে পাতে দিয়ে চলেছে, আর তিনি খেয়ে চলেছেন। গোণাগুণতির ধার ধারতেন না। তার সঙ্গে ওই সর্ষেলঙ্কায় গরগরে মাছের তেল-ঝালের টাকনা। নিজের গাছের আম, পুকুরের মাছ, গোণাগুণতি কীসের?

নমস্য মহিলা।

বৌমা বলল—তা না হলে আর অমন সব প্ল্যান মাথায় আসে? টাকা পুঁতে পুঁতে ঠাকুরঘরের মেজে বাঁধাবো। 'মোজাইক' কোথায় লাগে। এ একেবারে বাহারের চূড়ান্ত।

জগদীশ আবার হেসে উঠলেন।

—তা যা বলেছো বৌমা। এই তো হিসেবের খাতায় সেই টাকার ওজন দেখে চক্ষু চড়কগাছ।. . .কলিকাতার ট্যাঁকশাল হইতে দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা আনয়ন করা হইল।

—দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা। শুনে মাথা ঘুরছে বাবা। শুতে যাচ্ছি।

বৌমা নেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নাতিও। শোনা গেল, প্রশ্ন করছে,—'মণ' কী মামণি? অমিতপ্রতাপ বলল,—রিভলবারটা আমায় দিন তো।

—কেন? তুমি আবার কী করবে?

—থাক না আমার কাছে। আপনি ঘুমের ঘোরে কী করতে কী করে বসবেন, কী বলা যায়!

—হা-হা-হা। ভাবছিস বাবাটার মাথার গোলমাল হয়েছে। নারে বাবা, না। এখন পরমার্শ দে দিকি। বাড়িখানা হাতছাড়া করার আগে ওই দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা উপড়ে নেওয়া যাবে কীভাবে?

—কাল দিনের বেলা ভাবা যাবে বাবা। এখন শুয়ে পড়ুন।

আবার ফটাফট জোরালো আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে, ছেলে দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

জগদীশ তাড়াতাড়ি দরজার খিল ছিটকিনি দুটো লাগিয়ে, ঘুরে এসে আবার খাটের ওপর বসতেই যেন খিক খিক করে একটা হাসির শব্দ পেলেন।

—কে? কে? অ্যাঁ!

—খুব বেপোটে পড়ে গেছলেন বড়কর্তা, কী বলেন? ছেলে বৌমা নাতি পর্যন্ত ছুঁচো খুঁজতে হাল্লাক।

জগদীশ সন্দেহের গলায় বলেন,—তোর রকম-সকম দেখে তো তোকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না বাপু।

—আজ্ঞে আপনি হচ্ছেন বিচোক্‌খোণ বেক্তি।

—ফাঁসি খেয়ে মরে অপদেবতা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস নাকি?

—আহা, বড় ভাল নামটি তো দিয়েছেন কর্তা। অপোদেব্‌তা। বাড়তি একটা 'অপো' থাকলেও দেব্‌তার দরে চলে এলুম তা'লে?

—হুঁ। তো হঠাৎ আমার এখানে এলেন কেন বাপু? মতলবটা কী?

জগদীশ রিভলবারটা বালিশের তলায় গুঁজে রেখে খাতার বোঝা বন্ধ করে সরিয়ে রেখে বাবুগেড়ে গুছিয়ে বসে বললেন,—শুনি তোর মতলব!

—কোনো কুমতলোব নাই বড়কর্তা। সাত পুরুষে আপনাদের খেয়ে মানুষ। ওই যে আপনার ঠাকুরমার টাকা পোঁতা ঘর, ও ঘর তো আমারই বট্‌ঠাকুর্দা বানিয়েছিল।

—অ্যাঁ, তাই নাকি? কে সে? নামটা কী?

—আজ্ঞে বাবার জ্যাঠা। নাম ছিল পাতকীচরণ। হিন্দু সম্প্রদায়ের মিস্ত্রিদের মধ্যে খুব নামডাক ছিল। দেবমন্দিরের কাজকম্মো তো অহিন্দু মিস্ত্রি দিয়ে চলতো না।

—বটে না কি? খুব যে ভাঁওতা দিচ্ছিস। ঘরবাড়ি মঠমন্দির পুজোর দালান এসব কারা বানায়? আমি তো বরাবর দেখছি রসিদ মিস্ত্রি আর তার ছেলে বাহার মিস্ত্রি. . .!

—বড়কর্তা, সে সব হলগে পুজোপাঠ আরম্ভ হবার আগে। আরম্ভ হয়ে যাবার পর কোনো কাম পড়লেই ডাক পড়তো এই আমাদের।

—বুঝলুম। তা তোর বাবার জ্যাঠাকে তুই দেখেছিস?

—দেখেছি। একশোর কাছে বয়েস হয়েছিল। নামিয়ে বসিয়ে দিতে হতো। আমারে খুব ভালবাসতো। যতো গপ্পো আমার সঙ্গে।

www.arisumu.com

—হুঁ। শৈশব থেকেই এঁচোড়ে পাকা! তো খাতায় হিসেব দেখছি, রুপোর টাকা, ওজন দেড় মণ। তা থেকে কতটি সরিয়েছিল তোর ঠাকুর্দা, সে গপ্পো কখনো করেছিল তোর কাছে?

সিড়িঙ্গে বৈকুণ্ঠ সড়াৎ করে একদম সোজা।

—ছি ছি। অমন পাপ কথা মুখে আনবেন না হুজুর। এ কী বৈঠকখানা ঘরের কাজ-কাম, যে তা থেকে কিছু মারবে? ঠাকুরঘর বলে কথা!

—ওঃ। ধর্মজ্ঞানী পুরুষ। তো বল দিকিনি গিনির হিসেবটা কী? সেও নিশ্চয় তোর বড় ঠাকুর্দা. . . ।

থামতে হল।

আবার দরজায় ধাক্কা।

—বাবা! দরজাটা একবার খুলুন তো।

জগদীশ গলা নামিয়ে বললেন,—আজ আর হল না। এখন যা। কাল আবার আসিস।

উঠে দরজা খুললেন জগদীশ।

—কী? আবার কী হল?

—কী হল সেটাই তো জানতে এসেছি।

ছেলের স্বর বেজায় বিরক্ত, উত্তেজিত।

—মনে হচ্ছে আপন মনে কথা বলে যাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছি তখন থেকে।

জগদীশ আত্মস্থ।

বললেন,—কইছি তাই না কি?

—মাঝরাত্তিরে একা একা কথা বলবেন মানে? ঠিক আছে, আমি এ ঘরে শুই।

—মাথা খারাপ। তুই আবার কী করতে শুতে আসবি?

—তো আপনি যদি. . . .।

—আরে বাবা, কিছু না কিছু না। আমার মেজ মামা বলতো, রাত্তিরে যদি ঘুম না আসে তো খবরদার ঘুমের ওষুধ খেতে যাবি না। এক মনে ধারাপাতের পড়া 'কড়াকিয়া', 'গন্ডাকিয়া,' 'কাঠাকিয়া' আউড়ে যাবি। দেখবি ঘুম 'বাপ বাপ' করে আসতে পথ পাবে না! যা যা, শুতে যা। আর কথা-টথা শুনতে পাবি না।

ছেলেকে প্রায় ঠেলে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন, কাল আবার আসতে বললাম। আসবে তো। এলে খুব ফিসফিসিয়ে কথা বলতে হবে।

কিন্তু আচ্ছা, ভূত-টুত বলে তো মনে হচ্ছে না। কই, কথা বলতে তো গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল না। ভয় ভয় ভাবও করছিল না। অথচ ঢোকা বেরোনোও তো টের পাওয়া গেল না। একা আমার বুড়ো চোখ নয়, আরো তিন জোড়া চোখ তল্লাশ করেছে ঘর।

আমাদের প্রতাপপুরে ছেলেবেলায় দেখেছি গোষ্ঠ তেলির ঠাকুমা একটা বিদ্যে জানতো। ধুনোপড়া।

চোরেরা নাকি গোষ্ঠর ঠাকুমার কাছ থেকে ওই ধুনোপড়া শিখে নিয়ে চুরি করতে বেরোতো।

না এলে তো চুকেই যাবে। না এলে বোঝাই যাবে চোর জোচ্চোর। আর একে. . ।

●

ঘুমটা সবে এসেছে, কানের কাছে মাছির পাখা নাড়ার মতো ফিসফিস শনশন শব্দ।

বড়কর্তা, ঘুমোলেন না কি?

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলেন জগদীশপ্রতাপ।

নাইলনের মশারি। মশারির মধ্যে থেকেই দেখতে পেলেন একটা ছায়ামূর্তি।

—একী। অ্যাঁ! আবার এক্ষুণি এলি যে? বলে দিলাম না কাল আসতে?

বললেন অবশ্য খুব চাপা গলায়।

—আমাদের আবার কালাকাল। কীবা রাত্র কীবা দিন। ওই গিনিগুলোর হদিস জানতে বট্‌ঠাকুর্দার সন্ধানে ঘুরপাক খেলুম কে জানে কতক্ষণ! তারপর মনে হল 'কাল'কে এসে গেছে। কিন্তু এসে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল বড়কর্তা।

—কেন, হঠাৎ মন খারাপ কেন?

—আজ্ঞে হুজুর, আপনাদের বড় সন্দ বাতিক। এখনো ভাবতেছিলেন ব্যাটা বৈকুণ্ঠ ভূত না চোর।

—তা বটে। আমি কী ভাবছিলাম তা টের পেলি কী করে?

—সেই তো। ওই রোগেই তো সুখ-শান্তি গ্যাছে। না

বলতেই সব বুঝে ফেলি।

—দ্যাখ বাপু, ভূতে বিশ্বাস অবিশ্বাস সবটাই মনুষ্য-জন্মের একটা রোগ। তুই যখন বেঁচেছিলি, সহজে ভূত বিশ্বাস করতিস?

—বেঁচে ? হতভাগা বৈকুণ্ঠ আবার বেঁচেছিল কবে বড়কর্তা? মরেই তো থাকতো।

নাঃ সোজা করে কথা বলা ধাতেই নেই তোর। তা তোর বট্‌ঠাকুর্দার সঙ্গে দেখা হল?

—হওয়া খুব কঠিনই হচ্ছিল। ওনারা হচ্ছেন পুণ্যাত্মা। স্বর্গে ওনাদের পুণ্যির ওজন মাফিক সব মহল্লা। আমাদের মতন গলায়-দড়ি পাপী-তাপীদের সেখানে পৌঁছবার পাশপোর্টই নাই। তবে. . . ।

—থাম। থাম। ওই মহল্লাটা কী জিনিস?

—ও আজ্ঞে অন্য কিছু না, নামী নামী শহরের 'এস্‌টাইল'। কে কোন্ মহল্লায় ঠাঁই পেয়েছে জানতে পারলেই বোঝা যাবে কার কতটা পুণ্যি। এই যেমন আপনাদের রাজধানীতে—বাসার ঠিকানা শুনলেই বুঝতে পারা যায় কে রাজা, কে গজা। কে মন্ত্রী, কে যন্ত্রী। কে অফিসার, কে কেরানী। কে এলেমদার, কে জমাদার।

—বটে! রাজধানীর এত কথা জানিস তুই?

—আজ্ঞে এখোন তো আর রেলভাড়া লাগে না! সর্বত্র চষে বেড়াই আর দেখি।

—হুঁ, কিন্তু ঠাকুর্দার কাছে যেতে পাশপোর্ট লাগে কেন?

—সে আজ্ঞে ওখানকার আইন। বড় কড়া আইন। তবে কিনা পাহারাদারকে একটু ঘুষ টুস দিয়ে. . . ।

—অ্যাঁ। স্বর্গেও ঘুষ?

—আজ্ঞে কর্তা, ঘুষ আর কোথায় নাই?

খিক খিক একটু হাসির শব্দ।

—থাক। আমার আর জেনে কাজ নেই। ঠাকুর্দা কী বলল তাই বল্।

—বলল? বলল যে. . .।

ঘর অন্ধকার। জোর পাখার বাতাসে মশারি উড়ছে।

বৈকুণ্ঠকে এক-একবার দেখা যাচ্ছে, এক-একবার যাচ্ছে না।

—কী রে? কী হল? থেমে গেলি যে? চলে গেলি নাকি?

—আজ্ঞে চুপ চুপ। সিঁড়িতে যেন কার পদশব্দ শুনলুম। আবার না ছোটকর্তা দরজা ধাক্কায়।

—ধাক্কাক্। আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছি। ক্যানেস্ত্রা পিটোলেও ঘুম ভাঙবে না।

বলল, গিনি ছিল আজ্ঞে সাড়ে বারো সের। ঠাকুর্দার সাক্ষাতে ওজন হয়েছিল।

—সা-ড়ে বা-রো সের গিনি! বৈকুণ্ঠ, এখন তার কত দাম?

—জানা নাই বড়কর্তা। চিরদিনই আদার বেপারি জাহাজের খবর রাখি না।

—আমিই বলছি—অনে-ক দাম। হিসেব করতে গেলে মাথা গুলিয়ে যাবে। ছেলেকে জিগ্যেস করতে হবে। এখন কী উপায়, তা বল্।

—আজ্ঞে কীসের উপায়?

—ওই সোনারুপো উদ্ধারের। . . . বৈকুণ্ঠ! চুপ করে গেলি যে! এই বৈকুণ্ঠ. . .

—আজ্ঞে ঠাকুর্দাকে শুধিয়ে এলাম।

—এক্ষুণি শুধিয়ে আসা হয়ে গেল?

—তা হল আজ্ঞে। মনোরথে চেপে যাওয়া-আসা। তো ঠাকুর্দা বলল, উদ্ধারের উপায় কম। মিস্ত্রি উপড়োতে গেলে চুরি করে সাফ করে দেবে।

—আরে বাবা, পাহারা থাকবে।

—যে রক্ষক সেই ভক্ষক হবে। আর চুরি না করে তো গরমেন্টের ঘরে খবরটা তুলে দেবে। ব্যস, পুলিশি জেরা চলবে। এত টাকা তোমার পূর্ব-পুরুষ পেল কোথায়? হিসেব দাও। না দিতে পারলে গারদে যাও।

—এই সেরেছে। তাহলে তো বড় বিপদ।

—আজ্ঞে আপনাকে আর আমি কী বলব? তবে ঠাকুর্দা বলতো, সম্পদই বিপদ। তো এখন ঠাকুর্দা বলল, বড়কর্তাকে বলগে, যা করার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে। পুরাতন অট্টালিকাখানা দানই করুন আর বেচেই দিন যেন চটপট করেন।

জগদীশ সন্দেহের গলায় বলেন,—কেন রে বাপু? বড়কর্তার দিন ফুরিয়ে আসছে না কি?

—আহা। ইশ্ তা নয় আজ্ঞে। ওই অট্টালিকাখানারই দিন ফুরিয়ে এসেছে। কোনদিন না হুড়মুড়িয়ে ভূমিসাৎ হয়। মেরামত তো হয় নাই দু-পুরুষ কাল।

—মেরামত? হুঁ, বিশাল বাড়ি মেরামত করা বড় সোজা? তা বলে এক্ষুণি পড়ে যাবে?

—আজ্ঞে যেতে পারে তো! আমি বলি কি কর্তা, এই মওকায় বেচে দিন। মোটা টাকা ঘরে আসবে। তারপর হিঃ হিঃ। পড়ুক হুড়মুড়িয়ে। আপনার কাঁচকলা।

জগদীশ রেগে বললেন,—তার মানে জেনে বুঝে লোকঠকানো!

—তো সে যদি বলেন তো একখানা ধম্মোপুণ্যির আখড়া খুঁজে দানই করে দ্যান।

—তাও তো ঠকানো। জানছি যখন পড়ে যাবে।

—বাঃ তাতে আর ঠকানোটা কোতা? তানারা তো গাঁটের কড়ি খরচ করে কিনচেন না? তানাদের আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না। তাছাড়া অপনার পুণ্যির ছালাখানায় মোটা খানিকটা পুণ্যি জমা পড়বে।. . .যখন দানটা করবেন, খপরের কাগজের লোক আসবে। ফটাফট ফটক উঠবে।

জগদীশ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

—বৈকুণ্ঠ, বললি তো ভালো। কিন্তু ওই দেড় মণ মহারানী মার্কা টাকা আর সাড়ে বারো সের গিনি!

—ও আর চিন্তা করে লাভ নাই বড়কর্তা। ওসবও তো আপনার গাঁটের থেকে যাবে না? যাদের গেল তেনারা তো আগেই পগার পার হয়ে গেছেন।

—ঠিক। ঠিক। অ্যাঁ। তাইতো। বাঁচালিরে বৈকুণ্ঠ।

—তো এখন যাই বড়কর্তা। আবার আসতে অনুমতি করবেন তো? আপনার কাচে এলে বড় সুক পাই।

বড়কর্তা কিছু জবাব দেবার আগেই দরজায় টোকা।

ব্যস্। বড়কর্তা চাদর মুড়ি দিয়ে সপাট।

টোকা। টোকা থেকে ধাক্কা। ধাক্কা থেকে দুমদাম। দমাস-দমাস।

কিন্তু জগদীশ তো অঘোরে নিদ্রায়।

তবে ভয় খাবার কিছু নেই। নাক ডাকছে বাঘের গর্জনে।

সকাল বেলা ছেলে বলল,—বাবা, আপনাকে আর একা শুতে দেওয়া হবে না।

—কেন? কেন হে বাপু? আমার অপরাধ?

—আপনি রাতের বেলা সারারাত বিজবিজ করে কথা বলে চলেন। এটা একটা ব্যাধি।

—ব্যাধি! ওঃ! সারারাত বিজবিজ? বলি, নাক ডাকায়টা কে?

—সেটা শেষ রাতে। আপনার ঘরে আজ থেকে কেউ শোবে।

—কেউ শোবে না। আমি আজই প্রতাপপুরে যাচ্ছি।

—প্রতাপপুরে? একা?

—একা ছাড়া. . . তোমাদের সময় আছে? দ্যাখার অভাবে ওই বিশাল অট্টালিকাখানা ধ্বংস হতে বসেছে। ওটাকে আমি ওখানেই হরিসভায় দান করে আসবো।

ছেলে-বৌ দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠলো।

—অ্যাঁ! দান করে আসবেন? এখন ওর দাম কত ভেবেছেন? আমি তো একটা খদ্দের ঠিক করার চেষ্টায় আছি।

জগদীশ মনে মনে বলেন, লবডঙ্কা। তোমার চেষ্টা সফল হবার আগেই বাড়ি মাটিতে শোবে।

মুখে বললেন,—না না। পিতৃপুরুষের ভিটে বেচা হবে না। দানই করে দেবো।

—আর ওই ঠাকুরঘরের মেজেয় আর দেয়ালে পোঁতা খাঁটি রুপোর টাকাগুলো?

—পারিস তো উপড়ে নিয়ে আয়।

—সে তো আর সোজা কথা নয়।

—তাই তো বলছি, যেটা সোজা সেটাই হোক। দান করে দেয়া হোক। আমি আজই যাচ্ছি। একটা টিকিট আনিয়ে রাখি।

ছেলে রাগমাগ করে বলল,—একটা নয়, দুটো। আপনাকে তো আর এই বয়েসে একা ছাড়তে পারি না।

—তবে চল্। ভালোই হবে। ফটাফট ফটো ওঠবার সময় তোরও উঠে যাবে। কাগজে ছাপা হবে।

শুনে বৌ বলল,—আমিও যাবো।

—বেশ তো, চলো একবার শেষ-মেষ ভিটেবাড়ির দেশে।

যাওয়া হলো।

দিব্যি সমারোহ করেই যাওয়া হলো। ছেলে বৌ নাতি চাকর সবাইকে নিয়ে।

কিন্তু?

কারোর ভাগ্যেই কি ফটো-ওঠা জুটল, কাগজে ছাপা হতে?

নাঃ, কপালে ঘি না থাকলে কি হবে?

সন্ধ্যেরাতে পৌঁছলেন। সাপখোপের ভয়ে পুরনো বাড়িতে না উঠে ওখানের বাসিন্দা জ্ঞাতিদের বাড়িতে উঠলেন। ব্যস, সন্ধের পর থেকেই বৃষ্টি! ওঃ কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! যেন প্রলয়কাল ঘনিয়ে এসেছে। শুধু তো বৃষ্টিই নয়, সঙ্গে ঝড়ও।

জ্ঞাতিরা বলল,—দশ বছরের মধ্যে এমন ঝড়বৃষ্টি দেখিনি। গাছ উপড়ে পড়ছে মড়মড়িয়ে, ঘরের চালাটালা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে দু-দশ মাইল দূরে। দিঘি-পুকুরের জল উপচে উঠে লোকের বাড়িতে ঢুকে আসছে। কতজনের কত কী ঘটল।

আর?

আর সেই রাতেই ঘটে গেল ভয়ঙ্কর ঘটনাটি। বৈকুণ্ঠর ঠাকুর্দা যার ওয়ার্নিং বেল দিয়েছিল।

কিন্তু সকালবেলা দিব্যি আকাশ ফর্সা।

ঘুম টুম নেই। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লেন জগদীশ।

দেখলেন সেই দেড় মণ রুপোর টাকা আর সাড়ে বারো সের গিনির ওপর হাজার হাজার মণ ইঁট পাথর লোহা-লক্কড়ের স্তূপ।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছেন জগদীশ।

কানের গোড়ায় সহসা ফিসফিস।

—মন খারাপ করবেন না বড়কর্তা। ভবিষ্যৎকালে কোনো একদিন এই স্তূপ খনন হয়ে এইসব পুরাতন মুদ্রা . . .ইয়ে আবিষ্কার হবে।

—তুই? তুই এখানেও?

—আজ্ঞে আমাদের তো এখানেই বাস। তিন পুরুষ যাবৎ।

জগদীশ এদিক ওদিক তাকালেন। কাউকেই দেখতে পেলেন না। কেউ কোথাও নেই।

—দিনের বেলাও ঘুরিস?

—আজ্ঞে আমার আবার দিন আর রাত। আমি তো সবসময়ই আপনার সঙ্গে সঙ্গে।

—তা তোর ঠাকুর্দার দেখছি গণনায় ভুল। পুণ্যির ছালাটা ভরতে তো তর সইল না।

—না হোক গে। এমনিই আপনার অনেক আছে, পরের ধনে পোদ্দারি করে লাভটা কী? সে ভদ্দরলোক যা করে মঙ্গলের জন্যেই করে।

—সে 'ভদ্দরলোক'! মানে?

—কর্তা! আমার আবার ও নামটা মুকে আসে না। আপনি নিজে বুজে নিন।

www.arisumu.com

অপার্থিব

ডঃ অরুণকুমার দত্ত

কোন রহস্যের প্রসঙ্গ উঠলেই, আমার রহস্যময় পুরুষ উজাগার সিং-এর কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে।

উজাগার সিং-এর সঙ্গে আমার অল্পই আলাপ ছিল। সে পরিচয়ও হয়েছিল রজত উপাধ্যায়ের দৌলতে, এডিনবরা শহরের 'বারবিকিউ' রেস্তোরাঁতে বসে স্ন্যাক খেতে খেতে। এডিনবরা ইউনিভার্সিটি পাড়ায় গেলে 'বারবিকিউ' রেস্তোরাঁ সকলেরই চোখে পড়বে। প্রতি শনিবার আমাদের সেখানে আড্ডা বসত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের জনাকয়েক ছাত্রছাত্রীর মজলিস। আমাদের নামকরণ হল 'মিরাকল ক্লাব'।

উজাগার সিং-এর আগাগোড়াই ছিল রহস্যের অবগুণ্ঠনে ঘেরা। স্বল্পভাষী দীর্ঘদর্শন উজাগার পাঞ্জাবের অধিবাসী হলেও, সে ধর্মে যে কি ছিল, তা আমি জানি না। তার দীর্ঘ দাড়ি-গোঁফ ছিল, মাথায় জটা ছিল কিন্তু উষ্ণীষ ছিল না। প্রচুর পড়াশুনা ছিল তার, আর ছিল ভগবদ্‌দত্ত অসীম ক্ষমতা। উজাগার এডিনবরা ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃতে তখন পি-এইচ. ডি. করছিল। অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে এডিনবরাতে সংস্কৃতের একটা বিভাগ আছে।

কথায় আছে, মানুষের সঙ্গী দেখলে তার চরিত্র বোঝা যায়। রোমান্টিক ধরনের অলৌকিক ব্যাপার, প্রেততত্ত্ব, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানের বাইরের ডাক্তারী খবর জানতে আমরা ব্যগ্র ছিলাম। অন্য সঙ্গী-সাথীরা আমাদের বলত, নিজের পড়া ছেড়ে, কাজ ছেড়ে এসব নেশার পেছনে ছোটার কোন মানে হয়?

একদিন 'বারবিকিউ'-এ বসে কফি আর স্যান্ডউইচ খাচ্ছি, এমন সময় এক স্কটিশ দম্পতি এসে সরাসরি আমায় প্রশ্ন করলেন, আপনি কি ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট?

একটু আশ্চর্য হলাম। কারণ এ ধরনের মুখের ওপর প্রশ্ন সাধারণত ভদ্রতাবিরুদ্ধ। অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল। মিঃ ম্যাকফার্সন বছর বত্রিশের এক স্কচ। বোটানিতে থিসিস করছেন। তাঁর স্ত্রী, পামেলা ম্যাকফার্সন এডিনবরাতেই সোস্যাল সায়েন্স পড়ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলাম আমাদের মনের তার একই সুরে বাঁধা।

এর পরে রজত এল উজাগার সিংকে নিয়ে। রজত ভেটেরিনারির ছাত্র। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করছিল। আমাদের মজলিসে আরও দুজন সদস্য ছিল। মিশরের ডাঃ জাফর আলম, তিনি তখন এফ. আর. সি. এস. করছেন। এছাড়া ছিল কলম্বিয়ার কার্লস। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। আমাদের মধ্যে বয়সে. সবচেয়ে ছোট ছিল মিসেস ম্যাকফার্সন। আর সবচেয়ে বড় মিঃ ম্যাকফার্সন। ম্যাকফার্সন দম্পতি ছাড়া আর আমরা সকলেই অবিবাহিত ছিলাম।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের ক্লাবের মিটিং বসত শহরের কোথাও না কোথাও। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল উজাগার। সে কথা বলত কম। কিন্তু যখন বলত বা কিছু করত, তখন সকলকে তাক লাগিয়ে দিত। স্বল্পবাক, দীর্ঘদর্শন বিচিত্র প্রকৃতির উজাগারের ব্যক্তিত্ব আমাদের সকলের ওপরেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন রজত তার সম্পর্কে এক মজার গল্প করেছিল। উজাগার তখন থাকত এডিনবরার ইস্ট লোদিয়ানের এক ল্যান্ডলেডির ডিগসে। ডিগস, অর্থাৎ যে পরিবারে অর্থের বিনিময়ে থাকা খাওয়া দুই-ই চলে। এরকম এক ল্যান্ডলেডির চারতলার ফ্ল্যাটে অ্যাটিক-এ উজাগার থাকত। 'অ্যাটিক'-এর অর্থ হল, ছাদের এক ঘর। যার মাথার চালে স্কাইলাইট অথবা জানলা থাকে। দড়ি দিয়ে সেই স্কাইলাইট খুললেই ওপরের আকাশ দেখা যায় ও হাওয়া পাওয়া যায়। একদিন শীতের সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত উজাগার না ওঠায়, তার ল্যান্ডলেডি তার ঘরের দরজায় করাঘাত করলেন। কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেললেন। দরজা খুলেই এক অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন। সবাই ছুটে এসে অবাক হয়ে দেখে, অ্যাটিকের খোলা জানলা দিয়ে অজস্র ধারায় বরফ পড়ছে খাটে ও মেঝেতে। আর উজাগার সিং সেই বরফের কবরে গভীর নিদ্রামগ্ন।

জানলাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে, বরফ ঝেড়ে যখন [illegible] তার হিমশীতল দেহস্পর্শে ল্যান্ডলেডি শিউরে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হল। অনেক করে তাকে গরম করা হল। কিন্তু হা হতোস্মি! তবু উজাগারের নাড়ীর গতি নেই। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ।

ডাক্তার রায় দিলেন 'ডেথ—ডেথ টু অ্যাক্সিডেন্টাল হাইপোথারমিয়া।' সোজা কথায় প্রবল তুষারপাতের শীতলতায় উজাগার মারা গেছে।

এমন সময় চোখের জল পড়ার আগেই সকলকে হতবাক করে দিয়ে উজাগার সিং দাঁড়িয়ে উঠল—গুড মর্নিং লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন! কুড্ আই হ্যাভ এ কাপ অফ কফি প্লীজ?

পরে সেই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিলে। আগের দিন রাত্রে সে কুম্ভক করে সমাধিস্থ হয়েছিল। এটা হিন্দু যোগীদের একরকম আসন। বাহ্যত প্রাণের স্পন্দন না থাকলেও এ অবস্থায় অনেকদিন জীবিত থাকা যায়। কখন বরফ পড়েছে উজাগার কিছুই জানে না।

মিশরের জাফর আলামও বেশ অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতেন। তাঁর দেশে নাকি এক ধরনের লোক এখনো আছে, যারা কবরের ভেতরকার মড়ার সঙ্গে কথোপকথন করতে পারে। এইভাবে তারা মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের কাছে মৃতের অনেক অতৃপ্ত কামনা বহন করে নিয়ে যায়। আমরা জাফর সাহেবকে জিজ্ঞেস করতাম, 'মমি' করা বিদ্যাটা তাদের দেশে এখনো কারুর জানা আছে কিনা।

জাফর সাহেব গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বলতেন, না সে বিদ্যে অনেকদিন আগেই লুপ্ত হয়েছে।

কলম্বিয়ার কার্লস একটু ভিন্ন ধরনের কথা বলতেন। তাঁদের দেশে প্যাটাগনিয়ান নামে একদল আদিম অধিবাসী আছে, যাদের বিরাট পায়ের পাতা, যারা ক্ষিপ্রবেগে মানুষের কল্পনার বাইরের গতিতে ছুটে যেতে পারে।

ম্যাকফার্সন দম্পতির কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল হিন্দুদের পুনর্জন্মবাদ নিয়ে। জতিস্মর ব্যাপারটা তাদের কাছে বিস্ময়কর বস্তু ছিল। অসীম আগ্রহে তারা রজতের কাছে তার এক জানা জতিস্মরের গল্প শুনত। যার জন্ম ছিল উত্তরপ্রদেশের এক গ্রামে। জন্ম থেকেই তার মুখে এক দগ্ধ ক্ষতের চিহ্ন ছিল। সে প্রায়ই আমেরিকায় তার আগের জন্মের কথা, আগুন লাগার কথা বলত। পরে খোঁজ নিয়ে নাকি তা মিলে গিয়েছিল। আমিও ভারতীয় যোগীদের অদ্ভুত কাহিনীগুলো বলতাম।

এক শনিবারের সন্ধ্যায় 'বারবিকিউ'তে বসে চা খাচ্ছি। আমাদের আড্ডা তখন খুব জমে উঠেছে। আমাদের কথা [illegible] যুবতী ওয়েট্রেসরা ছুটে এসে আমাদের বার বার জিজ্ঞেস করছিল আর কিছু চাই কিনা। আমরা তাদের যথেষ্ট টিপস দেবার জন্য তারা আমাদের আড্ডা ভাঙতে চাইত না।

সেদিন আমাদের প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। টেবিলের ওপর একটা ঘুসি মেরে জন ম্যাকফার্সন বলে

www.arisumu.com

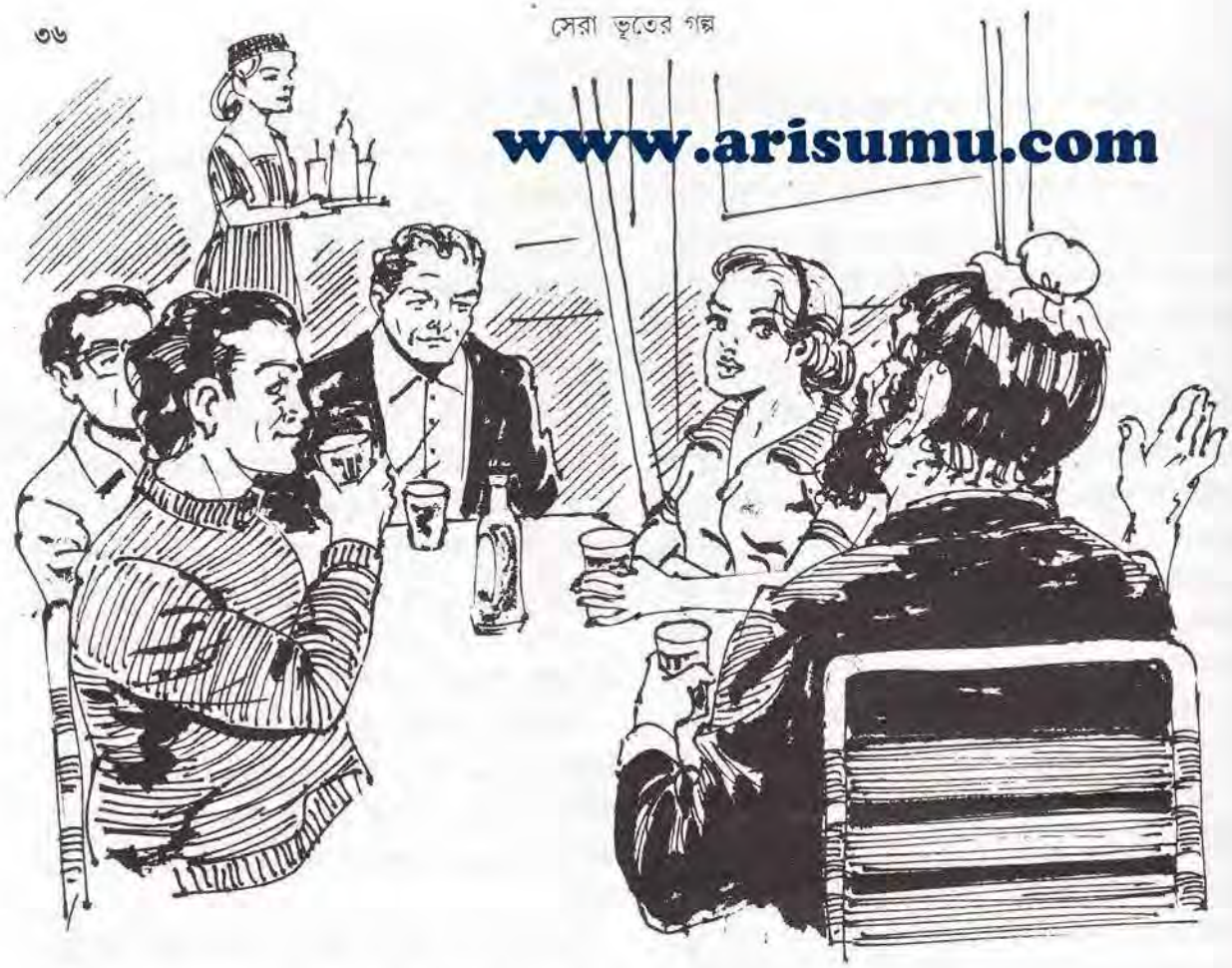

উঠলেন, মানুষের মৃত্যুর পরে তার অস্তিত্বই আছে বলে আমি বিশ্বাস করতে পারি, যদি তাদের দেখা বা প্রমাণ কখনো পাই।

আপনার চারদিকে যে হাওয়া আছে তার অস্তিত্ব কি আপনি অবিশ্বাস করেন? সেটাও তো আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না—বিতর্কের সুরে ডাঃ আলম বলেন।

না, তা দেখতে না পেলেও বাতাসকে আমরা অনুভব করতে পারি। এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। —জন বলেন।

তোমার সবকিছুতেই তর্ক করা স্বভাব জন।—গ্রীবা বেঁকিয়ে মিসেস ম্যাকফার্সন স্বামীকে বলেন।

তাঁদের কথায় বাধা দিয়ে কার্লস বলে ওঠে, যাই হোক আমাদের এখন তর্কের বিষয়বস্তু হচ্ছে, প্রেত বলে কিছু আছে কিনা। তা যদি থাকে, তাহলে তার অস্তিত্বের প্রমাণ না পেলে মিঃ ম্যাকফার্সন এসব আজগুবি বলে ধরে নিচ্ছেন।

আমি আর রজত টেবিলের একপাশে বসে বাদানুবাদ উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ আমাদের আলোচনা থেমে গেল একজনের দৃপ্ত অথচ ধীর কণ্ঠস্বরে।

মিঃ ম্যাকফার্সন, আপনি যদি প্রমাণ পান মানুষের মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে, তাহলে কি বিশ্বাস করবেন? —সোজা হয়ে উজাগার সিং কথাগুলো বলে। তার চোখ দুটো তখন জ্বলছে।

হ্যাঁ, হাতেনাতে প্রমাণ পেলে আমি সহজেই বিশ্বাস করব। —জন উত্তর দেন।

বেশ, আমি তার প্রমাণ দেব আমাদের পরবর্তী বৈঠকে। —উজাগার বললে।

আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। উজাগার প্রমাণ কেমন করে দেবে? এই কথাই সবার মনে গুন-গুন করতে থাকে। থমথমে নীরবতা ভেঙে অবশেষে জন

বলেন—বেশ, মিঃ সিং-এর চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী আগামী শনিবার রাত আটটার সময় আমাদের ফ্ল্যাটে এই বৈঠক অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। আমরা সবাই রাজি হলাম।

উজাগার সিং শুধু মৃদুস্বরে বললে—আগামী শনিবার গ্লাসগোতে একটা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে আমাকে যেতে হবে। তাহলেও রাত আটটার সময় প্রমাণ দেবার জন্য আপনার বাসায় আমি নিশ্চয় হাজির থাকব।

কিন্তু গ্লাসগো গিয়ে আবার ঐদিন রাত আটটার সময় আমার বাড়িতে আসা আপনার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে না কি? বৈঠকটা আর দু হপ্তা বাদে আমরা করতে পারি। আপনারা কি বলেন? — আমাদের দিকে তাকিয়ে জন প্রশ্ন করলেন।

না। আগামী শনিবার সন্ধ্যা আটটার সময় আপনার বাড়িতে প্রেতের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে আমি হাজির হবই। উজাগার সিং কখনো তার কথার খেলাপ করে না। —বলে উজাগার সিং।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, তার চোখ দুটো ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে।

সেই শনিবারের রাতের কথা আমি জীবনে ভুলব না। তড়িৎবিহীন 'বিদিশার নিশা' কত অন্ধকার হতে পারে তা আমার জানা নেই। কিন্তু সেই শনিবারের রাতের এডিনবরার মত অন্ধকার দুর্যোগময় রাত আমি জীবনে দেখিনি।

সেদিন বিকেল থেকে হঠাৎ বরফ পড়তে শুরু করল, কোন নোটিশ না দিয়েই। সেটা সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ। তখন বরফ সাধারণত পড়ে না। তবুও বরফ পড়ল। ঘন কুয়াশা নামল। মিঃ ম্যাকফার্সনের রয়েল টেরাসের ফ্ল্যাটে আমি পৌঁছলাম। তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। ঘরে ঢুকতেই দেখি ফায়ারপ্লেসের সামনের চেয়ারে কার্লস বসে আছেন। তাঁর দুদিকে ম্যাকফার্সন দম্পতি। কাচের শার্সিটা দিয়ে একবার বাইরে আকাশের দিকে তাকালাম। রয়েল টেরাসের ঢালু রাস্তার পাশ দিয়ে উঠে গেছে কার্লটন হিল। ভূতুড়ে দৈত্যের মত পপলার আর বার্চ গাছগুলো জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। শার্সির পর্দা ভেদ করে বরফগুলোর শৈত্য অনুভব করছিলাম। সাতটা চল্লিশে এলেন ডাঃ আলম। তাঁর দু মিনিট পরেই উপাধ্যায়।

রাত তখন সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিতে দিতে মিসেস ম্যাকফার্সন বললেন, মিঃ সিং ছাড়া আর সবাই আমরা এসে গেছি।

হ্যাঁ, মিঃ সিং-এর প্রতীক্ষাই আমরা এখন করব। এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাতে গ্লাসগো থেকে ফিরে আসা যে কোন মানুষের পক্ষেই দুরূহ ব্যাপার। দারুণ বরফ পড়ছে। রাস্তা স্কিডি হয়ে গেছে। গাড়ি চালান অসম্ভব। তার ওপর মিঃ সিং শুধু রাত আটটার মধ্যে গ্লাসগো থেকে ফিরে আসবেনই না, আবার চ্যালেঞ্জ করে আমাদের প্রেতের অস্তিত্ব প্রমাণ করবেন। আর মিনিট পনরোর মধ্যেই আমরা তার প্রমাণ পাব। —খানিকটা ব্যঙ্গের সুরে মিঃ ম্যাকফার্সন বলেন।

ঘরে আর কেউ কোন কথা বললেন না। কার্পেটে মোড়া লাউঞ্জ। এক কোণে ফায়ারপ্লেসে ভর্তি করে কয়লা চাপান হয়েছে। ধিকিধিকি করে আগুনের উত্তাপে সারা ঘর গরম। ফায়ারপ্লেসের ওপরে ম্যান্টলপিসে রাখা একটা টাইমপিস টিকটিক করে চলছে। তার ওপরে একটা ওয়ালক্লকের পেন্ডুলাম দুলছে। ফায়ারপ্লেসের চারদিকে গোল হয়ে সোফাগুলো আমরা দখল করে আছি। এক কোণে টি. ভি. সেটটা বন্ধ রয়েছে। ঘরটার পশ্চিম দিকে দুটো জানলা। তার পেছনেই কার্লটন হিল উঠে গেছে। শার্সির ওপর বরফের ঝাপটা দমাদম আছড়ে পড়ছে। পুবদিকে একটা সরু প্যাসেজ। প্যাসেজটা পেরিয়ে সদর দরজা। কারোর মুখে কোন কথা নেই। একটি চেয়ার শুধু খালি উজাগারের জন্য। মাঝখানকার সেন্টার টেবিলে নিঃশেষিত চায়ের কাপ সবাই তখন নামিয়ে রেখেছে।

আটটা বাজতে আর মাত্র দুমিনিট বাকি। ওয়ালক্লকটা আমি রেডিওর সঙ্গেই মিলিয়ে রেখেছি। সাময়িক স্তব্ধতা ভঙ্গ করে জনই প্রথম কথা বললেন।

মিঃ ম্যাকফার্সনের কথা শেষ হবার আগেই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

মিঃ ম্যাকফার্সন সেটা ছুটে গিয়ে ধরলেন।

—হ্যালো। হ্যাঁ, এটা মিরাকল ক্লাব। . . .হ্যাঁ, আমি মিঃ ম্যাকফার্সন। . . .কি, কি বললেন?

ফোনের ওপাশ থেকে আসা কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না। তবু আমরা বুঝতে পারলাম কোন

উত্তেজক খবর এসেছে।

. . . সে কি? কখন? সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়? —মিঃ ম্যাকফার্সন আর্তনাদ করে উঠলেন।

ঢং ঢং করে ওয়ালক্লকে আটটা বাজতেই হঠাৎ বাইরের কলিংবেলটা বেজে উঠল। 'কাম ইন' বলেই মিসেস ম্যাকফার্সন সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

যেও না, যেও না। খবরদার, দরজা খুলো না— আতঙ্ক মেশানো গলায় জন আর্তনাদ করে উঠলেন।

খুলব না কেন? —বলে স্বামীর দিকে তাকাতেই কলিং বেলটা আবার বেজে উঠল। মিসেস ম্যাকফার্সন তখন বলে উঠলেন, মিঃ সিংকে এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। ছুটে গিয়ে তিনি সদর দরজাটা খুলে দিলেন। কিন্তু কোথায় উজাগার সিং? খোলা দরজা দিয়ে তুষার ঝড়ের সঙ্গে একরাশ হিমেল হাওয়া ঢুকে পড়ল।

কেউ নেই! —বলে মিসেস ম্যাকফার্সন দরজার বাইরে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।

ও। গড, নো! —বলে ছুটে গিয়ে মিঃ জন ম্যাকফার্সন স্ত্রীকে টেনে ঘরে ঢুকিয়েই দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমরা যে যার চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লাম। মিঃ ম্যাকফার্সনের মুখটা ভয়ে নীল হয়ে গেছে। অত ঠাণ্ডাতেও তাঁর কপালের ঘাম আমি লক্ষ্য করলাম।

জন! কি হয়েছে? সব খুলে বল। তুমি ওরকম করছ কেন? কে ফোন করেছিল? —একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে উঠলেন মিসেস পামেলা ম্যাকফার্সন।

—বলছি। সবই বলছি। গ্লাসগোর রয়েল ইনফরমারী থেকে ফোনটা এসেছিল। মিঃ উজাগার সিং কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে গ্লাসগো থেকে গাড়ি চালিয়ে এডিনবরার দিকে আসছিলেন। রাস্তা খুব পিচ্ছিল ছিল। চারদিকে কুয়াশায় কেউই কাউকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। সে অবস্থায় গ্লাসগোর দিকে আসা আর একটা গাড়ির সঙ্গে তাঁদের 'হেড অন' কলিশন হয়। সাঙ্ঘাতিকভাবে জখম হয়ে মিঃ সিং গ্লাসগোর রয়েল ইনফরমারীতে ভর্তি হন। আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় তিনি সেখানেই মারা গেছেন।

মারা গেছেন! — সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন। ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও আমরা এতটা আশ্চর্য বোধ হয় হতাম না।

হ্যাঁ। —একটু থেমে মিঃ ম্যাকফার্সন বলতে শুরু করেন—মারা যাবার আগে মিঃ সিং আমাদের মিরাকল ক্লাবের কথা ডাক্তারের কাছে বলেন। আমার ফোন নাম্বার দিয়ে বলেন, আমি তাঁর বন্ধু ও আত্মীয়ের মত। তাঁর কিছু হলে আমাকে যেন ফোন করে তাঁর সমস্ত কিছু দায়িত্ব নিতে বলা হয়। ডাক্তারকে তিনি বার বার এই অনুরোধ জানিয়ে গেছেন।

কিন্তু তাহলে দরজায় কলিংবেল কে দিল? —অসহ্য বিস্ময়ে মিসেস ম্যাকফার্সন প্রশ্নটা করেন।

কলিংবেল দুটো মিঃ উজাগার সিং দিয়েছিলেন। —জন বলেন।

—কি বলছ তুমি!

—হ্যাঁ, পামেলা। মিঃ সিং মারা গিয়ে প্রমাণ করলেন—দেয়ার আর মেনি থিংস ইন আর্থ অ্যান্ড হেভেন। আরও প্রমাণ করলেন, ইন্ডিয়ানরাও কথা রাখতে জানে। আমি মিঃ সিং-এর কাছে হেরে গেছি।

সে রাত্রেই আমরা গাড়ি চালিয়ে রয়েল ইনফরমারীতে যাই। উজাগার সিংকে গ্লাসগো ক্রিমেটোরিয়ামে দাহ করে তাঁর চিতাভস্ম বিমানে তাঁর আত্মীয়ের বাড়ি পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দিই।

আজও যখন কোন রহস্যের কথা ওঠে তখন আমার চোখের সামনে রহস্যময় উজাগার সিং-এর মূর্তিটা ভেসে ওঠে। সে রাতে অমন পরিষ্কার কলিংবেল কে বাজিয়েছিল? আর ঠিক রাত আটটায়! এসবই কি 'মিরাকিউলার কো-ইনসিডেন্স?' এর উত্তর আমি আজও পাইনি।

কেন দেখা দিল না

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

www.arisumu.com

আমার বন্ধু শঙ্করকে গুয়াহাটি যেতে হয়েছিল অফিসের কাজে। আমিও তখন যাচ্ছিলাম দিল্লি হয়ে রাজস্থান। দু'জনে সম্পূর্ণ দু' দিকে যাব। দমদম এয়ারপোর্টে বসে গল্প করলাম খানিকক্ষণ। আমার প্লেন সাড়ে পাঁচটায় আর শঙ্করের প্লেন ছাড়বে সাড়ে ছ'টায়।

শঙ্কর বলল, "তুই রাজস্থানে ঘুরবি। শুনে আমার খুব লোভ হচ্ছে। অফিসের কাজ না থাকলে আমি তোর সঙ্গে চলে যেতাম।"

আমি বললাম, "আমারও তো ওদিককার ট্রেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। না হলে দিল্লির বদলে ঘুরে আসতাম গুয়াহাটি।"

প্লেনে ওঠার জন্য আমারই আগে ডাক পড়ল।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করল, "তুই কবে ফিরবি, সুনীল?"

আমি বললাম, "কুড়ি তারিখ শনিবার সকালে।"

শঙ্কর বলল, "আমি ফিরে আসব তার অনেক আগেই। তা হলে ওই কুড়ি তারিখ ফিরেই তুই আমার বাড়িতে চলে আসিস। তোর বেড়াবার গল্প শুনব। আর রাত্তিরে আমরা খাব একসঙ্গে।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে, ওই কথাই রইল।"

আমি চলে গেলাম প্লেনের দিকে। তারপর দিল্লি ছুঁয়ে রাজস্থানে ঘোরাঘুরি করলাম বেশ কয়েকদিন। ইচ্ছেমতন এক-এক জায়গায় থেকেছি। কোথায় কোন হোটেলে উঠছি, তা আমার বাড়ির কেউ জানত না, জানবার দরকারও বোধ করেনি।

ফিরে এলাম ঠিক কুড়ি তারিখেই। আরও কয়েকদিন থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আজকাল তো ট্রেনের টিকিট যে-কোনও সময় চাইলেই পাওয়া যায় না!

বাড়ি ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি, দোতলার মুখে দাঁড়িয়ে আছে আমার ছোটভাই। আমাকে দেখে তার মুখখানা যেন ছাই রঙের হয়ে গেল।

সে বলল, "দাদা, তুই খবরটা শুনেছিস?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী খবর?"

"তুই শঙ্করদার খবর এখনও জানিস না?"

"শঙ্করের খবর? কী হয়েছে শঙ্করের?"

আমার ছোটভাই চুপ করে গেল। আমি দৌড়ে ওপরে উঠে এসে তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "কী হয়েছে? কিছু বলছিস না কেন?"

"শঙ্করদা মারা গেছে!"

কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন আমার জ্ঞান চলে গিয়েছিল। মাথায় কিছু ঢুকল না।

তারপর আমি চিৎকার করে বললাম, "মিথ্যে কথা! হতেই পারে না!"

এই তো সেদিন দেখা হল শঙ্করের সঙ্গে। আমি বিদায় নেওয়ার সময় সে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল,

"কুড়ি তারিখে দেখা হবে। আমার চেয়েও শঙ্করের স্বাস্থ্য অনেক ভাল। সুন্দর চেহারা। সে কী করে হঠাৎ মরে যাবে?"

কিন্তু এক-একটা ঘটনা থাকে, চিৎকার করে প্রতিবাদ জানালেও মিথ্যে হয়ে যায় না। এইসব খবর নিয়ে কেউ মিথ্যে ঠাট্টাও করে না।

শঙ্কর সত্যিই নেই। গুয়াহাটিতে গিয়ে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। কোনও চিকিৎসার আগেই তার শেষ নিশ্বাস পড়ে।

অন্য বন্ধুবান্ধবরা কেউ শঙ্করের মৃতদেহ দেখেনি। খবর পাওয়া গিয়েছিল প্রায় এক দিন পরে, কারণ টেলিফোনের লাইন পাওয়া যাচ্ছিল না। প্লেনে ফিরিয়ে আনার অনেক ঝামেলা। শঙ্করের মামা গুয়াহাটি চলে গিয়ে পোড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমি সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম। আমার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়াতে লাগল। শঙ্কর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না? আজ কুড়ি তারিখ, শনিবার, আজ সে আমাকে নেমন্তন্ন করে রেখেছিল, তার বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করার কথা। আজ আমি শঙ্করের মায়ের সামনে দাঁড়াব কী করে?

শঙ্করের মৃত্যুর পরেও তার চিঠি আসতে লাগল। ও খুব চিঠি লিখতে ভালবাসত। পোস্টকার্ডে ছোট-ছোট চিঠি লিখত অনেককে। সেইসব চিঠি এসে পৌঁছতে লাগল অনেক পরে। সেইসব চিঠি দেখলেই বুকটা ধক্ করে ওঠে। মনে হয় না, মানুষটা বেঁচে আছে?

এয়ারপোর্টে শেষ দেখা শঙ্করের সেই চেহারা এখনও আমার চোখে ভাসে, তার কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাই।

তারপর কেটে গেল তিন মাস। শঙ্করের বাড়ির বৈঠকখানায় আমাদের বন্ধুদের একটা আড্ডা ছিল, এখন আর সেখানে কেউ যায়ই না। তবু প্রায়ই শঙ্করের কথা মনে পড়ে।

আমি আবার একটা নেমন্তন্ন পেলাম মানসের জঙ্গল ঘুরে দেখার। জঙ্গল আমার খুব প্রিয়। ডাক পেলেই ছুটে যাই। আর মানস ফরেস্ট তো অতি বিখ্যাত। থাকার ব্যবস্থা জঙ্গলের মধ্যেই, ডাকবাংলোতে।

তিন দিন ধরে সেই জঙ্গলে প্রচুর ঘোরাঘুরি করার পর একজন অসমিয়া বন্ধু আমাকে তার জিপ গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে গেল গুয়াহাটির সার্কিট হাউসে। সেখানে আমার নামে একটা ঘর বুক করা আছে।

কী একটা কারণে যেন অসমের সব সরকারি অফিসে স্ট্রাইক চলছে, তাই সার্কিট হাউসে খাবার পাওয়া যাবে না। অসমিয়া বন্ধুটি বাইরে থেকে একগাদা খাবার কিনে নিয়ে এল আমার জন্য।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর সে বিদায় নিল। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। সারাদিন জিপ গাড়িতে চেপে এসেছি বলে ধুলোয় গা একেবারে চিটচিটে হয়ে গেছে। তাই আমি স্নান সেরে নিলাম ভাল করে। তারপর খেতে বসলাম।

আজ আর ডাকলে বেয়ারাদেরও পাওয়া যাবে না। প্লেট, চামচ, কিংবা এক গ্লাস জলও কেউ দেবে না। সবাই ছুটি নিয়েছে। সার্কিট হাউসের আর কোনও ঘরে কোনও লোক নেই। এত বড় সার্কিট হাউসটা একেবারে নিস্তব্ধ।

আমি একা থাকতে ভালবাসি। হাতে একটা বই খুলে নিয়ে একা-একা খাওয়াটাও পছন্দ করি। যত ইচ্ছে সময় লাগুক, কেউ মাথা ঘামাবে না।

একখানা লুচিতে আলুর দম ভরে সবে মাত্র মুখে দিয়েছি, জানলার কাছে কিসের যেন একটা শব্দ হল। মুখ তুলতেই মনে হল, কে যেন জানলার পাশ দিয়ে চট করে সরে গেল।

আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, "কে?"

কেউ কোনও উত্তর দিল না। যতদূর জানি, আজ সার্কিট হাউসে কোনও লোক নেই। তাহলে কে দাঁড়িয়ে ছিল? কেউ থাকলেও লুকিয়ে পড়বে কেন? চোরটোর নাকি?

দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম। না, কেউ নেই। তাহলে আমারই ভুল হয়েছে। জানলার পরদাটা উড়ছে, সেই জন্যই ভুল হতে পারে।

ফিরে এসে বইটা তুলে নিয়ে খাওয়া শুরু করতেই আবার ঠকাস করে জানলার একটা পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল। এবার যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম, জানলার পাশ দিয়ে সরে গেল একটা মুখ।

আবার ধমকের সুরে চেঁচিয়ে বললাম, "কে? কে ওখানে?"

কোনও উত্তর নেই। চোখে এত ভুল দেখছি!

উঠে গিয়ে আবার দরজা খুলে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। অন্য সব দরজায় তালা লাগানো, মাঝখানে লম্বা বারান্দা, চোর যদি হয় সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শব্দ করবে কেন? কেউ কি আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে!

এই লুকোচুরি কথাটা মনে আসতেই মনে পড়ল শঙ্করের কথা।

শঙ্কর এই গুয়াহাটিতে এসেই মারা গেছে। শঙ্করের বড়মামা ছাড়া আর আমাদের চেনাশোনা কেউ শঙ্করের মৃতদেহ দেখেনি। মামা-ভাগ্নেতে মিলে কোনও ষড়যন্ত্র করেনি তো? কোনও কারণে শঙ্কর গুয়াহাটিতে লুকিয়ে থেকে নিজের মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে দিয়েছে?

কিন্তু শঙ্করের ছোটভাই আর বোনকে আমি কী দারুণ কাঁদতে দেখেছি। শঙ্করের মা শোকে-দুঃখে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের কাছে কি কেউ ছেলের নামে এমন মিথ্যে বলতে পারে? শঙ্করের বড়মামাও খুব গম্ভীর ধরনের মানুষ, তিনি এ-ধরনের নির্মম রসিকতা করতেই পারেন না।

নাঃ, শঙ্কর বেঁচে থাকতে পারে না।

আবার খাওয়া শুরু করলাম। এবার ঘরের মধ্যে একটা দমকা হাওয়া ঢুকে এল, ঘরের একদিকের দেওয়ালে একটা জঙ্গলের ছবি, আর একদিকের দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার। হাওয়ায় ক্যালেন্ডারটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে।

আমি ক্যালেন্ডারটা তুলবার জন্য উঠতে গিয়েও ভাবলাম, থাক, খাওয়ার পর তুললেই হবে।

তখনই মনে পড়ল, আজকের দিনটাও শনিবার, আর এ-মাসের কুড়ি তারিখ। সঙ্গে-সঙ্গে আমার শরীরে একটা শিহরন বয়ে গেল।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, "শঙ্কর, শঙ্কর, তুই কি লুকিয়ে আছিস? আমার সামনে চলে আয়। আমাকে সব কথা বল!"

কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

তিন মাস আগেকার এক কুড়ি তারিখ, শনিবারে শঙ্করের সঙ্গে আমার খাওয়াদাওয়া করার কথা ছিল, আজও সেইরকম একটা দিন। শঙ্কর নেই। আজ কি আমি একা একা খেতে পারি?

খাবার সরিয়ে রেখে আমি বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে নিলাম। শঙ্করের জন্য বুকটা হু-হু করে উঠল।

বাথরুমের জানলা দিয়ে বাইরে দেখা যায়, অন্ধকার একেবারে ঘুটঘুট করছে। পাশেই বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদী। জলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু নদীটা দেখা যাচ্ছে না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি, ঝড়ের মতন হাওয়ায় জানলার পরদা উথালপাথাল করছে। এ-ঘরের সব দরজা-জানলায় বড়-বড় ভারী পরদা। এমন পরদা, যার আড়ালে কোনও মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে।

একেবারে ফাঁকা সার্কিট হাউস, চোর ডাকাত ঢুকে পড়া অসম্ভব নয়। আমার কাছে টাকা-পয়সা প্রায় কিছুই নেই, কিন্তু চোর-ডাকাতরা তা জানবে কী করে?

আমি সবকটা পরদা সরিয়ে-সরিয়ে দেখলাম। দরজায় লাগালাম খিল আর ছিটকিনি। কাচের জানলাগুলোতে শক্ত গ্রিল লাগানো আছে, কেউ ঢুকতে পারবে না।

বইটা পড়ার চেষ্টা করতেই ঝড়ের হাওয়ায় একটা জানলার পরদা খুব উড়তে লাগল। কাচের পাল্লা তো বন্ধ করেছিলাম, খুলে গেল কী করে?

উঠে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। ছিটকিনিটা একটু আলগা মতন, হাওয়ার ধাক্কায় নিজে-নিজেই খুলে গেছে। হাওয়া আসছে দারুণ জোরে। অন্য একটা জানলার পরদা সরিয়ে দেখলাম, তার দুটো পাল্লাই খোলা, এটা বোধ হয় বন্ধই করিনি।

এই প্রথম আমি ভয় পেলাম। একই দিকে দুটো জানলা। দুটোই নদীর দিকে। কিন্তু একটা জানলার পরদা দমকা হাওয়ায় উড়ছিল, আর অন্য জানলার পরদাটা একটুও নড়েনি। দুটো জানলাই খোলা, দুটো জানলা দিয়েই তো সমান হাওয়া আসার কথা।

বাইরে কিছুই দেখা যায় না। এমন হতে পারে, অন্য জানলাটার কাছেই কোনও বড় গাছ আছে কিংবা দেওয়াল-টেওয়ালে কিছু আছে, তাই হাওয়া বাধা পাচ্ছে। এ ছাড়া আর তো কোনও কারণ থাকতে পারে না।

এইসব কথা ভাবলেও সত্যি কথা বলছি, আমার বেশ ভয় করতে লাগল।

এখন আর বই পড়া যাবে না। দুটো জানলায় ভাল করে ছিটকিনি এঁটে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরেই মনে হল, জানলায় কেউ ঠক ঠক করছে।

আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, কেউ না। কেউ না। ওটা ঝড়ের শব্দ, বাতাসের ধাক্কা। তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় সেই প্রথম জানলাটার পাল্লা খুলে গেল হাট করে, ঝোড়ো বাতাস ঘরের মধ্যে যেন তাণ্ডব শুরু করে দিল। ঝনঝন শব্দে পড়ে ভেঙে গেল দেওয়ালের ছবিটা।

আমি দারুণ ভয়ে আঁ-আঁ চিৎকার করে উঠলাম।

অন্য জানলাটায় একটুও শব্দ নেই, বাতাসের ঝাপটা নেই। তাহলে এ নিশ্চয়ই অলৌকিক কাণ্ড!

শঙ্কর নেই, তবে কি তার প্রেতাত্মা দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে? অর্থাৎ ভূত!

এতকাল ভূতে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন ভয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। সত্যিই মনে হচ্ছে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেডসুইচটা টিপে আলো জ্বালতেই অবশ্য দেখা গেল ঘর খালি। কেউ নেই, এলোমেলো বাতাস বইছে শুধু। ছবিটা পড়ে ভেঙে গিয়েছে।

এবার আমি ঠাস করে নিজের গালে এক চড় কষালাম।

যদি শঙ্কর ভূত হয়ে এসেও থাকে, তাতে আমার ভয় পাওয়ার কী আছে? শঙ্কর আমার অতি প্রিয় বন্ধু ছিল, সে কি আমার কোনও ক্ষতি করবে? কখনও না।

ছেলেমানুষের মতন ভয় না পেয়ে আমার ধৈর্য ধরে দেখা উচিত। ভূত আছে না নেই, তার প্রমাণ হয়ে যাবে। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূত হলে ভয় পাওয়ার কোনও কারণই নেই। তার কাছ থেকে ভূতেদের ব্যাপারস্যাপার সব জেনে নেওয়া যাবে।

নিজেকে চড় মারার ফলে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলাম। খুলে দিলাম দুটো জানলার পাল্লা। আসুক হাওয়া। আরও যদি কেউ আসতে চায় তো আসুক।

বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বসলাম বইটা নিয়ে। জোরে বললাম, "শঙ্কর, আয়, দেখা দে। কিংবা যদি কিছু বলতে চাস, বল। আমি ভয় পাব না। আয় শঙ্কর, আয়, তোর সঙ্গে আমার অনেক গল্প বাকি আছে।"

তারপর মাঝে-মাঝে বই পড়া আর মাঝে-মাঝে জানলার দিকে তাকানো, এইভাবে কেটে গেল সারারাত। চেয়ারে বসে। কেউ এল না। কেউ কিছু বলল না। শঙ্কর দেখা দিল না।

www.arisumu.com

নিশির ডাক

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমরা তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। জায়গাটা কলকাতার কাছে হলেও বেশ গ্রাম-গ্রাম। পশ্চিমে গঙ্গা। সেদিকে সব মন্দির, বাগানবাড়ি, বাঁশ-বিচালির গোলা। পশ্চিম থেকে একটি মাত্র পিচ বাঁধানো রাস্তা পুবে বাসরাস্তার দিকে চলে গেছে। বাকি সব অলি-গলি, গলির গলি, তস্য গলি। পাকা বাড়ি, সাবেক কালের বাড়ি অনেক ছিল, আবার সেই সঙ্গে ছিল টিন, টালি, খড়ের চালা। বড়-বড় গাছ। নিম, তেঁতুল, বট, অর্জুন। জংলা অবসর্তি, বাগান। একটা বাগান ছিল, সেখানে শুধু কুল গাছ। আমরা সেখানে শীতকালে কুল চুরি করতে যেতুম। হরি মালী তাড়া করলে, মার দৌড়। ধরবে কী করে, আমরা যে ছোট ছিলুম, হরিণের মতো দৌড়তে পারতুম। কিছু না পেরে হরিদা চিৎকার করে বলত, সরস্বতী পুজোর আগে কুল খাওয়া, দাঁড়া, মা কালীকে বলে দেব।"

সেই সময় একদিন আমাদের বন্ধুমহলে খবর রটে গেল, আজ রাতে নিশির ডাক বেরোবে। আজ অমাবস্যা। সেটা কী জিনিস! বিমানই এই গোপন খবরটা এনেছিল। সে সব জানে। বিমান বললে, জমিদার অনাদি মল্লিকের এখন-তখন অবস্থা। অত বড় বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, ঘোড়ার গাড়ি। তাঁকে তো সহজে মরতে দেওয়া যায় না। ডাক্তার-বদ্যি সব জবাব দিয়ে গেছেন। তাই এই শেষ চেষ্টা। অন্যের পরমায়ু কেড়ে নিয়ে তাঁকে বাঁচানো হবে। এক তান্ত্রিক এসেছেন পশুপতিনাথ পাহাড় থেকে। সারা গায়ে তেল-সিঁদুর মেখে তিনি রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে পথে বেরোবেন। হাতে থাকবে জলসমেত মুখ খোলা একটা ডাব। তিনি পল্লীবাসী সকলের নাম ধরে ডাকতে থাকবেন একে-একে। যেই কেউ সাড়া দেবে, অমনই ডাবের খোলার মুখটা টপ করে চাপা দিয়ে দেবেন। অমনই তার প্রাণ ওই ডাবের জলে আবদ্ধ হয়ে যাবে। ওই জল মল্লিকমশাইকে খাওয়ালে তিনি বেঁচে উঠবেন, আর এ মারা যাবে।

বিমান বললে, "খুব সাবধান! আজ আমরা সারারাত জেগে থাকব। ঘুমের ঘোরে ডাক শুনে সাড়া দিয়েছিস কি মরেছিস।"

"পশুপতিনাথের তান্ত্রিক আমাদের নাম জানবে কী করে!"

"এ-পাড়ার লোকই জানিয়ে দেবে।"

বাড়িতে এসে মাকে খুব চুপিচুপি কথাটা বললুম। বাবা খুব কড়া মানুষ। ভূত, প্রেত, তন্ত্র, মন্ত্র মানেন না। শুধু বলবেন, "অঙ্ক কষো, অঙ্ক। অঙ্কই জীবন, অঙ্কই ভগবান।" আর ওই অঙ্কটাই আমি পারি না। তাই বাবাকে না বলে মাকে বললুম। তা ছাড়া মায়ের চেয়েও বড় বন্ধু মানুষের আর কে আছে!

মা খুব ভয় পেলেন। মায়ের ছেলেবেলায় এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। মা এইসব অলৌকিক ব্যাপার খুব বিশ্বাস করেন। সিঙ্গুরে একবার ভুলভুলাইয়া ভূত মাকে সারারাত জঙ্গলে ঘুরিয়েছিল। আধমাইল দূরে মায়ের বাড়ি, মা কিন্তু কিছুতেই পৌঁছতে পারলেন না। ভুল রাস্তায় সারারাত চক্কর মারলেন।

সব শুনে মা বললেন, "আমরা তো জেগে থাকবই, তবে একজনকে নিয়েই আমার ভয়। সে তোর বাবা। যদি জানতে পারে সারারাত লাঠি হাতে রাস্তার রকে বসে থাকবে। এলেই পিটিয়ে শেষ করে দেবে, তারপর যা হয় হবে। না জানানোই ভাল। সেখানেও ভয়, ঘুমের ঘোরে ডাক শুনে উত্তর দিয়ে দিলেই হয়ে গেল।"

আমি বললুম, "বাবার পাশে আমিই তো শুই। জেগেই থাকব। যদি দেখি উত্তর দিতে যাচ্ছেন, সঙ্গে-সঙ্গে মুখ চেপে ধরব।"

আমাদের রাত জাগার সব পরিকল্পনা প্রস্তুত। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গার ধারের বটতলায় বসে ওই একই আলোচনা হল। সন্ধে হব-হব, বাড়ি ফিরে এলুম। চারপাশ এরই মধ্যে কেমন যেন থমথম করছে। কালীবাড়িতে অমাবস্যার রাতের পুজোর আয়োজন হচ্ছে দেখে এসেছি। অন্য অমাবস্যায় আমরা বন্ধুরা গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি-ভোগ খাওয়ার লোভে ঠিক হাজির হয়ে যেতুম। সে রাত বারোটাই হোক, একটাই হোক। আজ আর কোনও বেরনো-টেরনো নয়। টাইট হয়ে বসে থাকো বাড়িতে।

অমাবস্যার রাত অন্ধকার হয় ঠিকই, তবে আজ যেন আলকাতরা-রাত। ঘরের জানলায় আকাশটা আটকে আছে, মনে হচ্ছে ওইখানেই শেষ। ওর পরে আর কিছু নেই, মাথা ঠুকে যাচ্ছে। তারাগুলো যেন আগুনের মতো জ্বলছে ধকধক করে। রাস্তাতেও আজ যেন তেমন লোক চলাচল নেই। রাত ন'টার আগেই সব যেন নিঝুম মেরে গেল। দোকানপাট বন্ধ। মিষ্টির দোকানের পেছন দিকের ছেঁচা বেড়ার দরজাটা খোলা। মাঠে আলো পড়েছে। মজা পুকুর। কচু গাছের ঝোপ। কালো কুকুরটা কড়ার চাঁছি খাওয়ার লোভে সামনের থাবায় মুখ রেখে বসে আছে। এই সবই আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের রান্নাঘরের জানলায় বসে।

রাত দশটার সময় মা বললেন, "দেখছিস পলাশ, আজ এরই মধ্যে ঘুমে শরীর যেন ভারী হয়ে আসছে। তোর কিছু মনে হচ্ছে না!"

"মনে হচ্ছে না আবার! ইতিহাস পড়ছিলুম, এমন ঢুল ধরল, মাথাটা ঠাঁই করে দেওয়ালে ঠুকে গেল। তাই তো এই জানলায় এসে বসে আছি।"

"বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা। সারা পাড়াটাকে মন্ত্রের প্রভাবে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে।"

"কীভাবে করে মা?"

"আমি জানি। খুব একটা উঁচু জায়গায় উঠে বিশাল একটা ধুনুচিতে আগুন জ্বালিয়ে ধুনো দিতে থাকে। তার সঙ্গে মন্ত্র। যেদিকে বাতাস সেই দিকে ধোঁয়াটা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মানুষের শরীর ভারী হয়। ঘুম পায়। বেশ একটা সুখ-সুখ লাগে। এই সুখের মধ্যে থেকেই একজন চলে যায়।"

"এর হাত থেকে বাঁচার উপায়?"

"আমার জানা আছে। লঙ্কা পোড়া। দাঁড়া, চাটুতে কয়েকটা লঙ্কা পোড়াই। সব প্রভাব কেটে যাবে।" কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িসুদ্ধু সবাই হাঁচি আর কাশিতে অস্থির। আমাদের পুসিটা একপাশে থুপ্‌পি মেরে ঘুমোচ্ছিল। ফিঁচ-ফিঁচ করে হাঁচতে-হাঁচতে উঠে বসল। অবাক হয়ে গেছে। রাত দশটার সময় এ আবার কী! বাবা বাইরের ঘর থেকে ছুটে এলেন, "কী করছ তুমি! এরপর লোকে যে থানায় ডায়েরি করবে আমাদের নামে।"

মা শুধু গম্ভীর মুখে একটা কথাই বললেন, "যা করছি সবই জীবের মঙ্গলের জন্যে।"

"এর চেয়ে অমঙ্গল আর কী হতে পারে!" বলে, বাবা উদ্দাম কাশতে-কাশতে পালিয়ে গেলেন। মন্দিরে অমাবস্যার রাতের পুজো শুরু হয়ে গেছে। কাঁসর, ঘণ্টা, জগঝম্পের শব্দ ভেসে আসছে।

রাত এগারোটার সময় রোজ যেমন আমরা শুয়ে পড়ি, সেই রকমই শোয়া হল। আলো-টালো সব নিভে গেছে। এক বিছানায় বাবা আর আমি পাশাপাশি। আর এক বিছানায় মা। দোতলার ঘর। ঠিক নীচেই রাস্তা।

গরম কাল। জানলা-টানলা সব খোলা। বাবার শ্বাসপ্রশ্বাস যেই বড় হল, মা মশারির ভেতর থেকে ফিসফিস করে ডাকলেন, "পলাশ!"

"সব ঠিক আছে মা।"

"সাবধান, সজাগ থাকিস।"

"ঠিক আছে মা।"

বাবা পাশ ফিরলেন। আমরা দু'জনেই চুপ করে গেলুম। মন্দিরের আরতি শেষ। রাত নিঝুম। কোথাও একটা কুকুরও আজ ডাকছে না। শুধু দেওয়াল ঘড়ির ঠকাস্-ঠকাস্ শব্দ। ঠং করে একটা বাজল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে; আর বোধহয় জেগে থাকতে পারলুম না। আমাকে সাবধান করে মা নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। জোরে-জোরে নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। ভীষণ ভয় করছে আমার।

রাত দেড়টা। আজ আর বোধহয় নিশি বেরোল না। সবটাই গুজব। এমনও হয় না কি! এই সব ভেবে সবে পাশ ফিরে শুয়েছি, এমন সময় দূরে কোথাও চিং করে একটা শব্দ হল। আমার কান খাড়া। বিছানায় আধশোয়া। গম্ভীর গলায় কে টেনে-টেনে সুর করে ডাকছে, "অনাথ, অনাথ।" তিনবার। পরের নাম, "দীনবন্ধু, দীনবন্ধু।" গলাটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে ডাকতে-ডাকতে। আমাদের বাড়ির সামনে। বাবার নাম ধরে ডাকছে, "হরিশঙ্কর, হরিশঙ্কর।" আমার হাত বাবার ঠোঁটের কাছে। তেমন হলেই চেপে ধরব।

খুব ইচ্ছে করছে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি। ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছে। বাবাকে ছেড়ে উঠতে পারছি না তাই। ডাকটা ক্রমশই গঙ্গার দিকে চলে যাচ্ছে, "কানাই, কানাই, বনমালী, বনমালী, হারাধন, হারাধন।" শেষে আর শোনা গেল না। বাতাসের শাঁ শাঁ শব্দ। গঙ্গায় শেষ রাতের স্টিমারের ভোঁ। ডাকটা কী আবার এদিকে ঘুরে আসবে! এইসব ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

পরের দিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল। বাইরের রাস্তায় লোকজন, হইচই। রাতের অতবড় একটা ঘটনার কোনও চিহ্নই পড়ে নেই। আরও একটু বেলা বাড়তেই পবিত্রদের বাড়ি ছুটে গেলুম। ওইখানেই আমাদের আড্ডা বসে। তারপর ওইখান থেকেই কোমরে গামছা বেঁধে আমরা গঙ্গায় গিয়ে পড়ি।

সেদিন আর কোনও আলোচনা নয়। একটাই বিষয়, নিশির ডাকে কেউ কি সাড়া দিয়েছিল! না, নিশি ডেকে-ডেকে সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল! আমরা অনুসন্ধানে বেরোলুম। ডেকে-ডেকে জিজ্ঞেস তো করা যায় না, কে মারা গেছে। যেন কিছুই হয়নি, এই ভাবে ঘুরে-ঘুরে দেখতে হবে।

এ পাড়া-সে পাড়া, এ গলি-সে গলি ঘুরছি আমরা। জীবন স্বাভাবিক। কোথাও কিছু নেই। তার মানে সব বাজে। কোনও এক পাগলের কীর্তি! বিমান আবার সাহস করে দোতলার বারান্দা থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে নিশি দেখেছে। বেঁটেখাটো, চারচৌকো, জটাজুটধারী একটা জীব। দগদগে লাল। বেলুনের মতো রাস্তার এক হাত ওপর দিয়ে ভেসে-ভেসে চলে যাচ্ছে। শেয়ালের মতো কণ্ঠস্বর, "নিতাই, নিতাই।"

পাড়ার শেষ মাথায় রাস্তার কলে দাঁড়িয়ে দু'জন কাজের মেয়ে বলাবলি করছে, কুলবাগানের হারু কাল শেষ রাতে হঠাৎ মারা গেছে! রাতে খাটিয়া পেতে দাওয়ায় শুয়েছিল। সুস্থ, সবল একটা মানুষ। অসুখ নেই, বিসুখ নেই। সকালে দেখা গেল, বিছানায় মরে পড়ে আছে।

ছোট-ছোট। হারুদার কুলবাগান। গাছের পর গাছ। গোল গোল পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে আসছে প্রখর সূর্যের আলো। ছায়া আছে, তবে কেমন যেন শুকনো ছায়া। মাঝখানে একটা কুঁড়েঘর। খবর পেয়ে কিছু লোকজন এসেছে। খাটিয়ায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে আমাদের হারুদা। চেহারাটা কাগজের মতো ফ্যাকফ্যাকে সাদা। সবাই বলাবলি করছে, হার্ট অ্যাটাক।

একমাত্র আমরাই জানি ব্যাপারটা কী! রাত দুটোর সময় মৃত্যুর কণ্ঠস্বর—"হারুউ, হারুউ।" আধো ঘুম, আধো জাগরণে একটি উত্তর—"যাই।" খপ করে ডাবের খোলার মুখ বন্ধ।

এখন ভাবি, এমনও হয়! কিন্তু তার পরে অনাদি মল্লিক আরও অনেকদিন বেঁচে থেকে শেষে আত্মহত্যা করেছিলেন।

www.arisumu.com

রাত তখন এগারোটা

বিমল মিত্র

ঘটনাটি ঘটল রাত এগারোটার সময়।

কলকাতা থেকে দেশে যাচ্ছি। দেশ বলতে যেখানে আমি জন্মেছি। কলকাতা থেকে ট্রেনে যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে।

সকাল পাঁচটায় একটা ট্রেন আছে। তাতে গেলে মাজদিয়া রেলস্টেশনে সকাল আটটা সাড়ে আটটা বেজে যায়। স্টেশনে নেমে আরও পাঁচ ক্রোশ হাঁটা। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটলেও তাতে সময় লাগে আরও দু'ঘণ্টা।

তারপর আর একটা ট্রেন আছে। সেটা ছাড়ে সকাল ন'টায়। তারপর দুপুর দুটোয়। তারপর সন্ধে ছ'টায়।

সন্ধে ছ'টার ট্রেনে গেলে রাত ন'টায় পৌঁছতে পারা যায় মাজদিয়া স্টেশনে। কিন্তু তাতে গেলে বাড়ি পৌঁছতে রাত এগারোটা বেজে যায় বলে সাধারণত সে ট্রেনে যাই না।

তখন আমি কলকাতার একটা মেসে থেকে পড়াশোনা [illegible] শনিবার [illegible] যাই। তাতে [illegible] ট্রেনে ভিড়ও কম থাকে। আর সন্ধের আগেই বাড়িতে পৌঁছনো যায়।

কিন্তু সব সময় সে ট্রেনে যাওয়া সুবিধে হয় না। লেখাপড়া ছাড়া ফুটবল খেলার নেশা আছে। রবিবার দিনটায় দেশে না কাটিয়ে কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কাটাতে বেশি ভাল লাগে।

কোনও শনিবার বাড়িতে না গেলে বাবার চিঠি আসে। লেখেন—"তুমি গত শনিবারে বাড়ি আস নাই কেন? আমরা তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলাম। তোমার শরীর খারাপ হইল কিনা ভাবিয়া খুবই চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ উত্তর দিবে. . ." ইত্যাদি. . .

আমি বাবার একই সন্তান। বাবার বয়স হয়েছে। আমাকে নিয়েই তাঁর যত ভাবনা-চিন্তা-স্বপ্ন সব কিছু। আমি বড় হব, আমি মানুষ হব, আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করব।

কিন্তু ততদিনে আমারও একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠেছে। দেশের চেয়ে কলকাতার আকর্ষণই আমার কাছে বেশি। আমার জন্যে বাবা মোটা হাত-খরচ পাঠান. সেই টাকা দিয়ে আমি ময়দানে ফটবল খেলা দেখি, ক্রিকেট খেলা দেখি, আবার কখনও-কখনও বা সিনেমা দেখতে যাই। কলকাতার জীবন গ্রামের জীবনের মতো একঘেয়ে নয়। সেখানে চারদিকে এঁদো পানা-পড়া পুকুর আর কেবল খেতখামার আর বন-জঙ্গল। আমাদের মতো যাদের অবস্থা ভাল নয় তারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কেবল বারোয়ারিতলায় বটগাছের ছায়ায় হারু মুদির দোকানের মাচায় বসে আড্ডা মারে। তাস খেলে। আর আমি গেলে তারা আমার কাছে কলকাতার গল্প শোনে। কারোর কোনও কাজ নেই। বাড়ির অবস্থা খারাপ বলে

তারা কলকাতায় আসতে পারে না। সে-পয়সা তাদের নেই। তাই আমাকে তারা একটু-একটু হিংসেও করে। আমার চাল-চলন, জামা-প্যান্ট দেখে তারা অবাক হয়ে যায়।

আমার জুতো, আমার চুল-ছাঁটা, আমার সাবান-মাখা দেখে তাক লেগে যায়। কারণ, আমাদের গ্রাম এমন এক গ্রাম যেখানে শহরের কোনও সভ্যতা ঢোকবার সুযোগ পায়নি।

আমাদের পাড়ির পাশেই থাকতেন নসুকাকা। আসল নাম বোধহয় ছিল নৃসিংহ ভট্টাচার্য। বাবা তাঁকে নসু বলে ডাকতেন। তিনি গ্রামে গ্রামে যজমানদের বাড়িতে গিয়ে পুজো করে বেড়াতেন। বড় ভাল লোক। আমি দেশে গেলেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বলতেন, "কী রকম লেখাপড়া হচ্ছে বাবা? ভালো তো?"

আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম। বলতাম, "হ্যাঁ।"

তিনি বলতেন, "হ্যাঁ, খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করবে বাবা। এখন দিন-কাল খুব খারাপ, আর কলকাতা শহরে যে-রকম গাড়ি-ঘোড়া-ট্রাম-বাস শুনেছি, খুব সাবধানে চলা-ফেরা করবে।"

নসুকাকা আমাদের দেশের নাম-করা পুরুত-মশাই। তিনি না হলে কারোরই কোন পুজো-আচ্চা হত না। কেউ হাতেখড়ি দেবে, তাতেও যেমন তাঁর ডাক পড়ত, আবার তেমনি কারও বাড়িতে ছেলের অন্নপ্রাশন হবে, তাতেও তাঁকে চাই। তারপর আছে বারোয়ারিতলার দুর্গাপুজো, কালীপুজো থেকে আরম্ভ করে তিন ক্রোশ দূরে জমিদারবাবুদের বাড়িতে যত উৎসব, যত বিয়ে, ব্রত-উদ্‌যাপন, সবেতেই তাঁর ডাক পড়ত।

তা এই আবহাওয়াতেই আমি মানুষ। কিন্তু এই আবহাওয়াতে মানুষ হয়েও যে ঘটনাটা ঘটল তার কথাই বলি।

কলকাতায় তখন আমার স্কুলের পরীক্ষা চলছিল। তিন সপ্তাহ দেশে যেতে পারিনি। বাবাকে সে-কথা লিখে দিয়েছিলাম যে, আমি তিন সপ্তাহের জন্যে দেশে যেতে পারব না।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হল সেদিন শনিবার। মেসে এসে ভাবলাম দুটোর ট্রেন ধরব। কিন্তু কয়েকদিন ধরে রাত জেগে পড়বার পর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা। ভাবলাম, আধঘন্টা ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

কিন্তু যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখলাম দেয়াল-ঘড়িতে বেলা সাড়ে তিনটে। আমার বন্ধু, যে আমার পাশের বিছানায় শুত, সেও দেখলাম অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

মনে হল, সর্বনাশ! দুটোর গাড়ি তো কখন ছেড়ে দিয়েছে। এর পরে তো সেই সন্ধে ছ'টার আগে দেশে যাবার আর কোনও গাড়ি নেই। সে-গাড়িতে গেলে দেশের বাড়িতে পৌঁছতে তো সেই রাত এগারোটা বেজে যাবে।

কিন্তু শেয়ালদা স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়তেই সেদিন কেন জানি না আধঘন্টা দেরি হয়ে গেল। ভাবলাম, ট্রেনটা হয়তো একটু দেরি করেই মাজদিয়াতে পৌঁছবে। তার মানে যখন পাঁচ ক্রোশ হেঁটে বাড়ি পৌঁছব তখন রাত বারোটা বেজে যাবে।

বাবা হয়তো বকাবকি শুরু করে দেবেন। বলবেন—দুপুর দু'টোর ট্রেনে আসতে পারলে না?

কিন্তু না, ট্রেনটা ঠিক সময়েই মাজদিয়া স্টেশনে গিয়ে পৌঁছল।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। এদিককার প্লাটফর্ম ছেড়ে উল্টোদিকের প্লাটফর্মে পৌঁছে টিকিট দেখিয়ে গেট পার হলাম। বেশি যাত্রী ছিল না ট্রেনে। গেটের বাইরেই বাজার।

রাত বলেই বাজারে লোকজনের ভিড় বেশ পাতলা। তাড়াতাড়ি বাজার ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পৌঁছলাম। ভেবেছিলাম, একটা সাইকেল রিক্‌শা ভাড়া করে বাড়ি পৌঁছব।

কিন্তু কোনও রিক্‌শাওয়ালাই অত দূরে যেতে চাইলে না। বেশি টাকার লোভ দেখিয়েও কাউকে রাজি করাতে পারলাম না।

সবাই-ই এক কথা বললে—অত দূরে সওয়ারি নিয়ে

গেলে ফিরে আসতে রাত একটা বেজে যাবে।

আমি বললাম—আমি তোমাদের ডবল ভাড়া দেব।

তবু কেউ যেতে রাজি হল না।

অগত্যা হাঁটতে শুরু করলাম। হাতে অনেক জিনিস ছিল আমার। বাবা কাশির ওষুধ কিনে নিতে লিখেছিলেন। শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছবার আগে ওষুধের দোকান থেকে তা কিনে নিয়েছিলাম। মার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম হাজার মলম। মার পায়ে হাজা হয়েছিল। তারপর গামছা কিনেছিলাম একটা বাবার জন্যে। আরও অনেক খুচরো-খুচরো জিনিস কিনেছিলাম—যা যা বাবা কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

রাস্তা দিয়ে একলা-একলা হেঁটে চলেছি। চারিদিকে নিশুতি অন্ধকার। রাতে গ্রামের লোকজন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ ভোর-ভোর উঠতে হয় সকলকে। বড় বড় গাছগুলোকে দূর থেকে অন্ধকারে পাহাড় বলে মনে হচ্ছে।

খানিক দূর গিয়েই পিচের রাস্তা শেষ হয়ে গেল। আকাশে যে চাঁদটা ছিল তাও ডুবে গেল। তখন শুধু তারাগুলো জ্বলছে মাথার ওপর। মাঝে মাঝে শেয়ালের হুক্কা-হুয়া কানে আসছে। দু-একটা কুকুর আমাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল। কিন্তু আমাকে চিনতে না পেরে আবার চুপ করে গেল। তবু আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। কিন্তু কিসের যে ভয় তা বলতে পারব না।

একটা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। চারিদিকে কয়েকটা বড়-বড় বটগাছ ডালপালা ছড়িয়ে জায়গাটিকে ঢেকে রেখেছে। শনি-মঙ্গলবার ও-জায়গাটায় হাট বসে। হাট বেলাবেলি শেষ হয়ে গেছে। চারদিকে দু'চারটে ছোট-খাট দোকান। তারাও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে তখন যে-যার বাড়ি চলে গেছে।

বহু দিন আগে ওই বটগাছের ডালে একজন মানুষ গলায় গড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সে ছোটবেলাকার ঘটনা। কিন্তু তখন থেকেই জায়গাটায় এসে দাঁড়ালেই দিনের বেলাতেও কেমন গা-ছমছম করত। আর তখন তো রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

মনে পড়ল, বাবা-মা বোধহয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে রাত হয়ে গেল। তাঁরা ভাবছেন আমি আর আসব না। মা আমার জন্যে ভাত রান্না করে বসেছিলেন।

বাবা বলছেন—আর কেন বসে আছো, খোকা আজকে বোধহয় এল না, তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

মাও বোধহয় তখন খেয়ে নিয়েছেন। তারপর আমার কথা ভাবতে-ভাবতেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

এই সব কথা ভাবতে-ভাবতেই হেঁটে চলেছি। রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। রাস্তাটা গিয়ে নলগাড়ির নাবালে গিয়ে মিশেছে। আগে এখানে একটা নদী ছিল। আগে যখন নদীতে জল ছিল, তখন খেয়া নৌকোয় এপার-ওপার করতে হত। কিন্তু এখন নদীটা শুকিয়ে গিয়েছে। সেখানে ঢালু জমিতে এখন চাষ-বাস হয়। তারই একপাশ দিয়ে গরুর গাড়ি যাবার রাস্তা হয়েছে। বর্ষার পর গরম পড়াতে রাস্তায় আবার ধুলো জমেছে। এখানকার লোক তাই ও-জায়গাটার নাম দিয়েছে 'নলগাড়ির নাবাল।'

আমি ঢালু রাস্তায় নামতে লাগলাম। তারপর সামনের দিকে নজর পড়তেই যা দেখলাম তাতে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে এল।

দেখলাম, ওপারের রাস্তা দিয়ে একটা দাড়িওয়ালা মূর্তি ঢালু রাস্তা দিয়ে আমার দিকে নেমে আসছে। রাস্তায় তার পা নেই, শুধু হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতেই এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

আমি আর এগোলাম না। এগোতে ভয় করল। ও কি তবে সেই লোকটার মূর্তি যে একদিন বটগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল? তখন কত লোকের মুখে শুনতে পেতুম যে, সে নাকি ওই অঞ্চলে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়! কিন্তু আমি নিজের চোখে কখনও তা দেখিনি।

হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে মূর্তিটা কথা বলে উঠল। বললে, "কে ওখানে?"

আমি কি জবাব দেব বুঝতে পারলাম না। শুধু একটু থেমে বললাম, "আমি।"

"আমি কে?"

বলতে-বলতে মূর্তিটা আমার দিকে আরও এগিয়ে আসতে লাগল।

সামনে মুখের কাছে এসে বললে, "কে? কে তুমি?"

আমি ভয়ে শিউরে উঠেছি তখন। কিছুই জবাব দিতে পারলাম না সেই মুহূর্তে।

মূর্তিটা জিজ্ঞেস করলে, "ও, তুমি! বিমল! ধীরেশদার ছেলে?"

আমার তখন যেন জ্ঞান ফিরে এল! চিনতে পারলাম মূর্তিটাকে! আমার নসুকাকা।

বললাম, "নসুকাকা, আপনি?"

নসুকাকা বললেন, "হ্যাঁ, আমি। তা তোমার আসতে এত দেরি হল যে?"

বললাম, "দুপুর দু'টোর ট্রেনটা ধরতে পারিনি, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই সন্ধে ছ'টার ট্রেন ধরে আসছি।"

নসুকাকা বললেন, "তা আজকে এই অমাবস্যার রাতে না এলেই পারতে! এই রাতবিরেতে আসা কি ভাল? আমাদের গাঁয়ে পরশুদিন বাঘ বেরিয়েছিল। তারপর ক'দিন আগে বাবুদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল—।"

বললাম, "তা, আপনি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছেন?"

নসুকাকা বললেন, "জমিদারবাবুর স্ত্রী হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর বড় ছেলের খুব অসুখ, আমাকে সেখানে গিয়ে শান্তি-সস্তেন্ করতে হবে। যত রাতই

থেকে, আমাকে যেতেই হবে। তাঁর বড় ছেলের এখন যায়-তখন যায় অবস্থা। তাই খেয়ে নিয়েই দৌড়চ্ছি। আমাকে যে ডাকতে এসেছিল তাকে বলেছি, তুমি এগিয়ে যাও, আমি খেয়ে উঠেই যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে রাস্তায় কোনও লোকের দেখা হয়নি?''

আমি বললাম, ''কই, না তো—''

নসুকাকা বললেন, ''তা রাত্তির বেলা হয়তো ঠাহর হয়নি তোমার। তা, তুমি বাবা একলা এত রাত্তিরে এসে ভাল করোনি। চলো, আমি তোমাকে গাঁ পর্যন্ত পৌঁছে দিই।''

বললাম, ''আপনি আবার কেন এত কষ্ট করতে যাবেন। আর আপনারও তো তাড়াতাড়ি আছে।''

নসুকাকা বললেন, ''সে কী কথা! এই এত রাতে তোমাকে কি এই অবস্থায় একলা ছেড়ে দিতে পারি? তোমার ধীরেশদা যে আমার ওপর রাগ করবে। বলবে, তুমি খোকাকে ওই অবস্থায় একলা ফেলে কী করে চলে গেলে?''

কী আর করা যাবে। ওদিকে জমিদারবাবুর বাড়িতে তাঁর বড় ছেলের এখন যায়-তখন যায় অবস্থা, আর তিনি কিনা নিজে আমাকে আমার বাড়ি পৌঁছে দিতে চান?

রাস্তায় যেতে-যেতে নসুকাকা বলতে লাগলেন, ''তুমি তিন সপ্তাহ বাড়ি আসনি, সেজন্যে ধীরেশদা খুব ভাবছিলেন। কলকাতায় থাক, হপ্তায় একদিনের জন্যে বাবা-মাকে দেখতে আসতে পার না? তুমি যখন বড় হবে, আর নিজে বাবা হবে, তখন বুঝবে ছেলেকে দেখতে না পেলে বাপের মনে কী কষ্ট হয়।''

আমি নসুকাকার কথা শুনে কোনও জবাব দিতে পারলাম না, চুপ করে নসুকাকার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম। তারপর যখন বাড়ির কাছাকাছি এসেছি তখন নসুকাকা বললেন, ''ওই দেখ, তোমাদের বাড়ি, এবার আর কোনও ভয় নেই, আমি চলি, আমার খুব তাড়া আছে।''

বলে তিনি চলে গেলেন।

আমি আমাদের বাড়ির সদর দরজায় কড়া নেড়ে ডাকতে লাগলাম, ''বাবা, বাবা, বাবা।''

বাবা আমার ডাক শুনেই ধড়ফড় করে জেগে উঠেছেন। মা-ও জেগে উঠেছেন।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে আমাকে দেখে বললেন, ''খোকা, তুমি এসে গেছ? কোন ট্রেনে এলে? দুপুরের ট্রেনে আসতে পারলে না?

বললাম, ''দুপুরবেলা পরীক্ষা দিয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই—''

বাবা বললেন, ''তা বলে সন্ধের ট্রেনে আসতে হয়? জানো বাড়ি পৌঁছোতে রাত এগারোটা বেজে যাবে। তা ছাড়া গাঁয়ে পরশু দিন বাঘ বেরিয়েছিল, তা জানো? কদিন আগে বাবুদের বাড়ি ডাকাত পড়েছিল—''

আমি বললাম, ''আমি তো তা জানতুম না। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল নসুকাকার সঙ্গে, তিনিই আমাকে নিজে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন।''

''নসু? নসুকাকা?''

বললাম, ''হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে নলগাড়ির নাবালে দেখা হয়ে গেল। তিনি জমিদারবাবুদের বাড়ি যাচ্ছিলেন, তাঁদের বড় ছেলে মরো মরো, তাই তিনি শান্তি-সস্তেন করতে সেখানে যাচ্ছিলেন।''

বাবা আমার দিকে হতবাকের মতো চেয়ে রইলেন।

মা-ও অবাক।

বাবা বললেন, ''তুমি ঠিক দেখেছ? তোমার নসুকাকা? তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন? তুমি কী সব আবোল-তাবোল বকছ?''

আমি বললাম, ''বা রে, আমি ভুল দেখব কেন? আমি নসুকাকাকে চিনতে পারব না?''

বাবা বললেন, ''কিন্তু তোমার নসুকাকা যে পরশুদিন মারা গিয়েছেন, আমরা যে নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর সৎকার করে এলুম—!''

সস্তার বাড়ি

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

www.arisumu.com

বাড়ি খুঁজে খুঁজে হয়রান—শুধু হয়রানই নয়, উদভ্রান্ত, এমন সময় কল্যাণ এসে খবর দিলে, উত্তর কলকাতায় একটা বাড়ি আছে, দোতলা বাড়ি, উপরে নিচে চারখানা শোবার ঘর, রান্না ভাঁড়ার—এছাড়া তেতলায় একটা চিলে কোঠা—মাত্র পঞ্চান্ন টাকা ভাড়া!

'কত?'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে বিজয়।

নিশ্চয় একশো পঞ্চান্ন বলতে গিয়ে কল্যাণ ভুল করেছে। শুধু পঞ্চান্ন বলে ফেলেছে।

কল্যাণ কিন্তু আবারও বলে—'পঞ্চান্ন, শুধু পঞ্চান্ন! রাজী আছ উত্তরে যেতে?'

উত্তরে কেন—যমের দক্ষিণ দোরেও যেতে বিজয়ের আপত্তি নেই—এমনই ওর অবস্থা তখন। কোথাও একটা আশ্রয় পেলেই বাঁচে। নীচের দুটি ঘর নিয়ে সে থাকে, ভাড়া পঞ্চাশ—সেটাকে বাড়াতে না পেরে বাড়িওলা তাকে তাড়াবার জন্যে এমন সব কৌশল অবলম্বন করেছে যে এক মুহূর্ত সেখানে থাকাও সমস্যা। ওরা উঠে গেলে নাকি সে পঁচাত্তর টাকা ভাড়া পাবে ঐ দুখানা ঘরের। তা পাক—কিন্তু তার জন্য মানুষ এত [illegible] হ'তে পারে? বিজয় বাড়ি খুঁজছে প্রাণপণে, [illegible] পেলেই উঠে যাবে— এ কথাটা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন। তারা ওপরে থাকে—ওরা নিচে [illegible] ছোটখাটো অসংখ্য এমন অত্যাচারের সুযোগ তাদের আছে যা নিয়ে নালিশ মকদ্দমা তো করা যায়ই না—পাঁচজনের কাছে বলতে গেলেও উপহাসাস্পদ হবার সম্ভাবনা। যারা ভুক্তভোগী নয় তারা সে দুঃখ বুঝবে না। আর তাছাড়া ছা-পোষা কেরানী লোক, বারো মাস মামলা-মকদ্দমা করারই বা সময় কই? ঝগড়াঝাঁটি করতেই বিরক্তি বোধ হয়—ক্লান্তি আসে।

কিন্তু সে যাক্—কল্যাণ বলে কি?

পঞ্চান্ন টাকায় গোটা বাড়ি? এই বাজারে? পাগল নাকি ও?

গত দেড় মাস দু মাস বিজয় কম করে অন্ততঃ দেড়শো' বাড়ি দেখেছে। চোরকুঠরীর মতো দুখানা ঘর যার আছে সে যদি বা দয়া করে একশো টাকা না চায় তো আশি চাইবেই! তাও তার না আছে জল না আছে পায়খানা—ছত্রিশ ঘর ভাড়াটের জন্য হয়ত একটি কল এবং একটিমাত্র পাইখানা। এমনও আছে যারা বলে দেয়, 'বিপদ আপদ হয় সে আলাদা কথা—তা নইলে খাওয়ার জল আপনাদের রাস্তার কল থেকেই আনতে হবে।'

[illegible]

দক্ষিণ কলকাতার বাড়িগুলো এত পুরনো নয় বলেই ওর এই দিকে ঝোঁক। নইলে উত্তরে আর আপত্তি কি?

সে সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে বলে, 'পঞ্চান্ন টাকায় একখানা গোটা বাড়ি? কি রকম বাড়ি রে?'

কল্যাণ একটু বিরক্তই হয়, 'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার বাবা—একবার দেখে এলেই পারো। তোমার তো দুখানা ঘরের দরকার, যদি ড্যাম্প্ হয়—নিচের ঘরগুলো না-ই ব্যবহার করলে!'

'তা বটে। চলো এখনই দেখে আসি। কিন্তু এ খবর কে দিলে?'

কল্যাণ বললে, 'এই আত্মীয়দের মধ্যেই—আমার পিসেমশাইয়ের এক ভাগ্নী-জামাইয়ের কাকার বাড়ি।'

কল্যাণের আত্মীয়তাবোধের সঙ্গে বিজয়ের বহুদিনের পরিচয়—সে আর বৃথা বাক্যব্যয় করলে না, শুধু গম্ভীর-ভাবে বললে, 'তাহলে তো আপনা-আপনির মধ্যেই, জানা শোনা। চলো বেরিয়ে পড়ি—'

কিন্তু বাড়ি দেখে আরও অবাক হলো বিজয়। শ্যামবাজারের মধ্যেই, বাড়ি খুব পুরনো নয়—নিচের ঘরগুলো'ও বাস করা যায় স্বচ্ছন্দে। জল কল সব সুবিধে। দিব্যি বাড়ি।

বিজয় দেখেশুনে অবিশ্বাসের সুরে বললে, 'তুই নিশ্চয় ভুল শুনেছিস কল্যাণ। এবাড়ি শুধু পঞ্চান্ন হ'তে পারে না। হয় ভুল শুনেছিস নয় তো ঠাট্টা করেছে তোর কাকা।'

'অত কথার দরকার কি তোর!' কল্যাণ বলে, 'আজই চল্ না দুপুর বেলা অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাড়িওলাকে ভাড়া জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে আসবি। তাহলেই বিশ্বাস হবে তো? ওদের অফিস আমাদের অফিসের দুখানা বাড়ি পরেই—'

বিজয় তবু প্রশ্ন করে, 'ক বছরের অ্যাডভান্স দিতে হবে? হয়ত তাইতেই মেরে দেবে রে! কিংবা সেলামী। ফার্নিচার তো নেই, নইলে হয়ত কতকগুলো ভাঙা কাঠ দিয়ে দু হাজার টাকা নিয়ে নিত। কোন্ দিকে পুষিয়ে নেবে তাই ভাবছি।'

কল্যাণ বললে, 'না, তা নয়। পিসেমশাইয়ের কাছে যা শুনেছি—লোকটা খুব নির্বিবাদী। এখন সব রেন্ট কন্ট্রোল থেকে যা ভাড়া কমিয়ে দিচ্ছে, ও বলেছে, কি দরকার ওসব হ্যাঙ্গামে যাবার। যা রয় সয়—তাই ভালো! তবে জানাশুনো লোক নইলে ভাড়া দেবে না, নালিশ মকদ্দমা দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে না হয়—এই ওর একমাত্র চিন্তা।'

কথাটা বিজয়ের মনে লাগল।

তখন আর অঞ্জলির সঙ্গে কথা কইবার সময় নেই। কোনমতে দুটো নাকে-মুখে গুঁজে অফিস দৌড়োনো—তাও পনরো মিনিট লেট হয়ে গেল। নেহাৎ সরকারী অফিস বলেই রক্ষে। এখানে ঠিক সময় হাজির দেওয়াটা কেউই আশা করে না আজকাল।

ঘণ্টাখানেক কাজ করেই দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ল। বাড়িওলা মানুষটি খুব ভদ্র, বছর পঞ্চাশ বয়স, গোলগাল মোটাসোটা—গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। সমাদর করে বসিয়ে চা আনতে পাঠালেন। তারপর কল্যাণের মুখে বিজয়ের পরিচয় পেয়ে শুধু প্রশ্ন করলেন, 'বাড়ি আপনার পছন্দ হয়েছে?'

বিজয় সোৎসাহে বললে, 'খুব। বলেন তো এগ্রিমেন্ট করতে রাজি আছি।'

'না না—থাক্। মানে আমি কি চাই জানেন, কোন পক্ষেই কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। আপনিই বা বাঁধা পড়বেন কেন?'

'কিন্তু সে যে আবার বিপদ, দু মাস বাদেই যদি আপনি বলেন দেড়শো টাকা ভাড়া দাও, নইলে পথ দ্যাখো—আমি বেশি ভাড়া পাচ্ছি। তখন? এই বিপদেই তো দিশেহারা, আবার ভাজনা খোলা থেকে আগুনে ঝাঁপ দেব?'

'না না—সে সব কোন ভয় নেই। আমি জেন্টলম্যান্স্ ওয়ার্ড দিচ্ছি। বলেন তো আমার তরফ থেকে আমি একটা লিখে দিচ্ছি যে এক বছরের মধ্যে ভাড়া বাড়াবো না। তারপরও বাড়ালে কত বাড়াবো বলুন, পঞ্চান্ন টাকাটা তো একশো হতে পারে না।'

'সে ভালো কথা। এখন তাহলে আমাদের কি করতে হবে?'

বাড়িওলা নীরবে কিছুক্ষণ পেপার ওয়েট্টা নিয়ে নাড়াচাড়া করে বললেন, 'ভাল হয় যদি দু মাসের ভাড়া জমা রাখেন। এছাড়া প্রতিমাসের ভাড়া আগাম দিতে

হবে। এই জমাটা দু মাস থাকার পর মাসে দশ টাকা করে কাটা যাবে। আর যদি তার আগেই উঠে যান বা ভাড়া ঠিকমতো না দেন তো ও টাকাটা বাজেয়াপ্ত হবে। আমি বেচুন স্পষ্ট কথার মানুষ—আমার অপরাধ নেবেন না।'

'না না, ঠিক আছে। এত ভদ্রতা আমি আশাই করি নি।' বিজয় পকেট থেকে চেক বই বার করে তখনই একশো পঁয়ষট্টি টাকার চেক দিয়ে রসিদ নেয়। তারপর চা খেতে খেতে বলে, 'তাহলে বাড়ি কবে পাচ্ছি আমি?'

'আজই পেতে পারেন। শেষ ভাড়াটে চলে যাওয়ার পর চুনকাম করিয়ে দিয়েছি। আবার যদি দরকার হয় তো করিয়ে নিতে পারেন—আমি খরচ দিতে পারি। আমার পক্ষে করে দেওয়া শক্ত।'

'কতদিন আগে গেছেন তাঁরা?' বিজয় কতকটা অন্যমনস্কভাবেই প্রশ্ন করে।

'তা মাস ছয়েক হবে বোধ হয়।'

'এতদিন বাড়ি খালি আছে? সে কি!' বিজয় বিস্মিত হয়।

কল্যাণ বলে, 'তোমার কপালে আছে। আর কি!'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বাড়িওলা বলেন, 'না, মানে আমি ঠিক যাকে-তাকে ভাড়া দিতে প্রস্তুত নই—বুঝলেন না? হাঙ্গামা করা আমার পোষায় না।'

বিজয় বিজয়গর্বে রসিদখানা অঞ্জলির চোখের সামনে মেলে ধরে বললে, 'বাড়ি তৈরি, এখন কবে উঠবে বলো!'

'সে কি! একেবারে পাকা?' অঞ্জলির বিশ্বাসই হয় না।

তারপর সব কথা শুনে সে বলে, 'হ্যাঁগো, এখনও এমন সত্যযুগের মানুষ আছে?'

'আছে তো দেখছি।'

দুজনে মিলে পরামর্শ করে স্থির হল যে আগামী রবিবারেই উঠে যাওয়া সুবিধা। ওদের ঝিকে যদি শনিবার অফিস যাবার আগেই বিজয় ও বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায় তো সে কতক ধোয়া মোছা করে রাখতে পারবে। তারপর অফিস থেকে ফিরলে ওরা ছেলেমেয়ে নিয়ে সবাই গিয়ে ঠিকঠাক করে রেখে আসবে। কতক কতক বাজে জিনিসপত্রও চাইকি রেখে আসতে পারে।

সেইমতো ব্যবস্থাই হয়ে গেল। ওরা উঠে যাচ্ছে শুনে পুরনো বাড়িওলা নিজে প্রস্তাব করলেন, 'বলেন তো আমরাও গিয়ে ধুয়ে মুছে দিয়ে আসতে পারি।'

'না, দরকার হবে না—ধন্যবাদ।' ব্যঙ্গের সুরে বিজয় উত্তর দিলে।

শনিবার দিন অফিস থেকে ফিরে বই কাগজ ইত্যাদি কিছু কিছু জিনিস একটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে বিজয় স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে রওনা হল। গিয়ে কড়া নাড়তেই ওদের ঝি এসে দোর খুলে দিয়ে একটু বিস্মিতভাবেই বললে, 'ওমা, দোর দেওয়া আছে? ছেলেটা তাহলে গেল কোথা দিয়ে?'

'কে ছেলে? কাদের ছেলে?' অঞ্জলিও বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

'তা জানি নি বাপু। কে একটা ছেলে—এই বছর সাত-আটের—এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি যখন বারণ করে দিলুম যে দেখো খোকা, ধোওয়া ঘরে কাদা পায়ে ঢুকো না, তখন নিচে নেমে এলো। তাও যতবার নিচে জল নিতে এসেছি দেখেছি খালি ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'তা সে এলো কি করে? দোর দাওনি তুমি?'

'একটু দেরি হয়েছিল। দাদাবাবু চলে যাওয়া পর তো আর দোর দেওয়া হয়নি। পরে মনে হল বটে, একা রয়েছি,—কেউ যদি বদমাইশ এসে ঢুকে পড়ে? তাই তখন এসে দোর দিয়ে গেলুম। সদরে খিল লাগিয়ে যখন উঠেছি তখনই দেখি ছেলেটা ছাদ দিয়ে নামছে। যখন দোর খোলা ছিল তখনই ঢুকে পড়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, অ খোকা তোমার নাম কি, কোথায় থাকো—তা মুচকি মুচকি হাসলে, জবাব দিলে না। ভারি ফুটফুটে ছেলে—'

অঞ্জলি বললে, 'নিশ্চয়ই এই পাশের কোন বাড়ির ছেলে হবে। তার মা হয়ত খুঁজছে। তা সে গেল কোথায়?'

'কি জানি, আমি তো ভাবলুম চলে গেছে। এখন তো দেখছি দোর দেওয়া—'

বিজয় বললে, 'দ্যাখো কোন ফাঁকে আবার হয়ত

ওপরে উঠে গেছে।'

অঞ্জলি বললে, 'দেখো তো তরুর মা—থাকে তো ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। কার ছেলে—সে হয়ত কেঁদে কেটে খুন হচ্ছে—'

ঝি দোতলা তেতলা সব খুঁজে এসে বললে, 'কৈ বৌদি, কোথাও তো নেই। গেল কোথা দিয়ে?'

বিজয় বললে, 'হয়ত ছাদ দিয়ে রাস্তা টাস্তা আছে। তাহলে তো বিপদ, এতটুকু ছেলেই যদি যেতে আসতে পারে তাহলে তো অন্য লোক সহজেই পারবে।'

কিন্তু ছাদে উঠে দেখা গেল যে ছোট ছেলে কেন—খুব জোয়ান ছেলেও কেউ আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। একদিকে গলি অপর তিন দিকেই উঁচু উঁচু বাড়ি, আসা যাওয়ার পথ নেই।

তখন সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

অঞ্জলি বললে, 'নিশ্চয়ই কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল, [illegible]ন আবার আমরা যখন ওপরে খুঁজছি তখন পালিয়েছে।'

তা অবশ্য হতে পারে। সদর দোরের কপাট ভেজানোই ছিল।

পরের দিন সকাল করে খাওয়া দাওয়া সেরে দুপুরের মধ্যেই এ বাড়িতে সবাই চলে এল মালপত্র লরীতে বোঝাই করে। ওরা ট্যাক্সিতে করে আসবার সময় হাতিবাগান থেকে অঞ্জলির মা আর ছোট বোন মিনুকে তুলে এনেছিল। মা সব গোছগাছ করে দিয়ে বিকেলের চা খাবার করে খাইয়ে—সন্ধ্যাবেলা চলে গেলেন। মিনু রইল—নতুন বাড়িতে অনেক কাজ, দিনকতক থাকলে সুবিধাই হবে, এই ভেবে অঞ্জলিই তাকে রেখে দিলে।

সন্ধ্যার পর অঞ্জলি মিনুকে ডেকে বললে, 'আমি ততক্ষণে রুটিগুলো সেঁকে নিই—তরুর মা বেলে দেবে'খন—তুই খুকিকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দে—'

'খোকা?'

খোকা তখন তরুর মার [illegible] গল্প শুনছে। সে বললে, 'আমি [illegible] বুঝি? বা রে! আটটায় [illegible]—তার পরে তো ঘুম। মাসী কিচ্ছু জানে না।'

'তোমার বুঝি আজ নতুন বাড়ির অনারে পড়াশুনো সব ডকে উঠল খোকন?' অঞ্জলি হেসে বলে।

'বাবা তো পড়াবে—বাবা কোথায়?'

কি সব খুচরো জিনিস কিনতে বিজয় বাজারে গিয়েছিল। মিনু খুকির দুধ গরম করে নিয়ে তাকে কোলে করেই ওপরে চলে গেল। দুধ খাইয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে সে বিছানায় বসে খুকীকে ঘুম পাড়াতে শুরু করেছে এমন সময় দেখলে ঘরে গুট্‌গুট্‌ করে ঢুকছে একটি ছোট ছেলে। খোকনেরই বয়েসী হবে, তবে খোকন নয়।

এঘরে আলো নেই, কিন্তু বাইরের বারান্দায় আলো জ্বলছে, তারই আভাতে বেশ দৃষ্টি চলে। ছেলেটি একেবারে ওর কাছে এসে দাঁড়ালে—দুটো হাত বেশ করে ছড়িয়ে খাটের কানাটা ধরে হাসিহাসি মুখে চেয়ে রইল মিনুর মুখের দিকে—

মিনু তখন খুকিকে কোলে শুইয়ে প্রাণপণে চাপড়াচ্ছে আর গুনগুন করে গান গাইছে, কাজেই ছেলেটিকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারল না। তবে অনুমানে বুঝলে এ কালকের সেই ছেলেটি—বাড়ি ধোবার সময়ে যে ঢুকে পড়েছিল। ওর বেশ কৌতুক বোধ হল। ছেলেটা তো অদ্ভুত, বলা-কওয়া নেই—অচেনা লোকের বাড়ি সপ্রতিভ ভাবে ঢুকে আসে। পাগলা আছে বোধহয় একটু।

ভাবতে ভাবতেই মনে হল জামাইবাবু বেরিয়ে গেছেন, নিশ্চয়ই তারপর তরুর মা দোর দেয়নি। দেখো দিকি কি অন্যায়—এমনিভাবে লোকও তো ঢুকে পড়তে পারে!

খানিকটা চাপড়াবার পর খুকীর চোখ দুটো যেমন একটু বুজে এসেছে, মিনু সামনের দিকে ঝুঁকে চুপি চুপি ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললে, 'ও খোকা, তোমার নাম কি? কোন বাড়িতে থাকো?'

ছেলেটা [illegible]ত্তর দিল না। মুচকি মুচকি হাসতে লাগল শুধু।

মিনুরও আর বেশি কথা কইতে ভরসা হল না পাছে খুকি উঠে পড়ে। খানিক পরে খুকির ঘুমটা আর একটু গাঢ় হতে তাকে সন্তর্পণে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলে, সে সময় ওকে ছেলেটার দিকে পেছন ফিরতে হয়েছিল, কিন্তু সে এক মিনিটের বেশি নয়—তারপর ফিরে আর ছেলেটাকে দেখতে পেলে না।

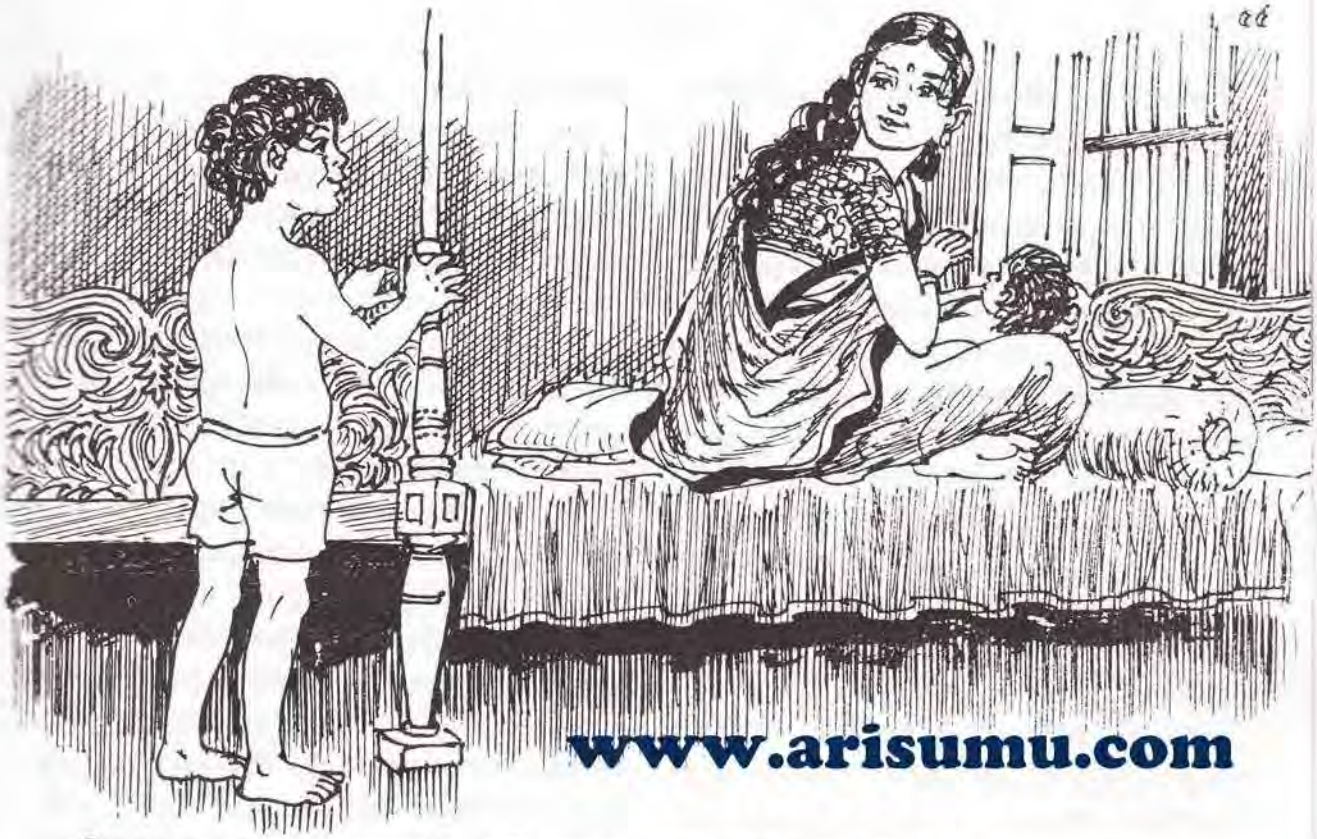

www.arisumu.com

মিনু তাকে ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে বারান্দায় এল। সেখানেও সে নেই। ছাদের দিকে উঁকি মেরে দেখলে সিঁড়ির দরজা বন্ধ। পাশের ঘরেও কেউ নেই। নিশ্চয় নিচে গেছে। সে নিচে নামছে এমন সময় কট কট করে সদরের কড়া নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ের ডাক, 'খোকন!'

মিনুই গিয়ে তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিল।

তারপর আবার বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে এসে তরুর মাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তরুর মা তখন জামাইবাবু যাবার কত পরে দোর দিয়েছিলে?'

'ও মা, কি বলছ গো! আমি তো ওনার সঙ্গে গিয়ে দোর দিয়ে এলুম।'

বিজয়ও সায় দিলে, 'হ্যাঁ, আমি ডেকে নিয়ে গেলুম যে। নতুন পাড়া—কিছু কি বলা যায়! কেমন লোক সব—চোর ছ্যাঁচড় আছে কিনা জানি না তো!'

'কিন্তু—কিন্তু তাহলে সে ছেলেটা গেল কোথায়?'

'কে ছেলে রে?' অঞ্জলিও বেরিয়ে আসে।

'ঐ একটা খোকা। খোকনেরই মতো হবে, কি আর একটু বয়স বেশী। খুকিকে যতক্ষণ ঘুম পাড়ালুম সমস্তক্ষণ আমার কাছে সে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেমন পেছন ফিরে খুকিকে শোয়াতে গেছি—কোথায় যে পালিয়ে গেল! ওকেই বোধহয় তরুর মা দেখেছিল সেদিন!'

অঞ্জলি একটু চিন্তিত মুখে বললে, 'গেলই বা কোথায়? সে না হয় দুপুর বেলা—রাস্তা দিয়ে এসেছিল। আজ এই রাত্তিরে ওর বাপ মা ছেড়ে দিয়েছে? কোথা দিয়ে ঢুকেছে বাড়িতে—সত্যি এটা দেখা দরকার!'

ওরা এদিক ওদিক দেখলে। খাটের নিচে [illegible] কোণ, বাথরুম,—ওপরের ছাদ পর্যন্ত। কোথাও [illegible] চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

এবার বিজয়ও একটু চিন্তিত হল, 'তাই [illegible] দোর বন্ধ, বাড়ি থেকে বেরোবার আর কোন রাস্তা নেই—গেল কোথায়?'

খানিকক্ষণ সবাই চুপ করে থাকার পর [illegible] সভয়ে বললে, 'হ্যাঁ বাবু, ভূত টুত নয় [illegible]'

'দূর দূর—চুপ কর।' তাকে ধমকে দিয়ে [illegible] 'ঐটুকু ছেলে ভূত—শুনেছিস কোথাও?'

'তা বটে বাপু।' স্বীকার করে তরুর মা—'শুনিনি তো কখনও খোকা-ভূতের কথা!'

সেদিনের মতো সে প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেলেও অঞ্জলির গা-টা ছম-ছম করতে লাগল। আগে কথা ছিল যে বড় ঘরে অঞ্জলি ছেলেমেয়ে এবং বোনকে নিয়ে শোবে—বিজয় থাকবে পাশের ঘরে, ঝি শোবে নিচে। কিন্তু তরুর মার মুখের চেহারা দেখে তাকেই পাশের ঘরের ব্যবস্থা করা হলো—বিজয় বড় ঘরের মেঝেতে শুল আলাদা বিছানা করে।

কিন্তু এর পর দুটো দিন কাটল নিরুপদ্রবে। বিজয় ক্ষ্যাপাতে শুরু করলে মিনুকে, 'এটা তোমার অলস মস্তিষ্কের কল্পনা মীনাবতী—তরুর মা যেমন দিনদুপুরে ভূত দেখে, তুমি আবার সেই কথা শুনে ভাবলে বুঝি তুমিও দেখছ। ওইটে ইনফ্লুয়েন্স করলে আর কি তোমাকে—'

'আপনার যেমন কথা!' মিনু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'সন্ধ্যাবেলা বুঝি স্বপ্ন দেখে কেউ?'

'স্বপ্ন নয়, কল্পনা!'

তুমুল কৃত্রিম কলহ জমে ওঠে শালী-ভগ্নীপতির মধ্যে।

বুধবার দিন কিন্তু আবার দেখা গেল তাকে। এবার দেখলেন খোদ কর্তাই। কী একটা উপলক্ষে অফিস সেদিন বন্ধ ছিল। টানা একটা দিবানিদ্রা দিয়ে বেলা চারটে নাগাদ বিজয় ছাদে উঠে পায়চারি করছিল। খোকন তার মামার বাড়ি গেছে সকালে—খুকি তখনও ঘুমুচ্ছে। মিনু অঞ্জলি তরুর মা নিচে। রান্নাঘরে চায়ের জল চাপিয়ে দুই বোনে বসে গল্প করছে, তরুর মা কলতলায় বাসন মাজছে। সমস্ত দোতলাটা নির্জন ও নিস্তব্ধ।

ছাদের একটা কোণ থেকে নিচের ঘরের বড় বিছানাটা দেখা যায়। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ সেই কোণে এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায় বিজয়। ঠিক সেদিকে চায়নি সে, চোখের পাশে দৃষ্টির যে আবছায়া থাকে একটা, তাতেই মনে হল যেন ঘরে নড়ছে কী একটা—নিয়মিত-ভাবে। তখন ভাল করে তাকিয়ে দেখল সে—একটি বছর সাতেকের ছেলে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত খুকিকে হাওয়া করছে। দিব্যি ফুটফুটে ছেলে, পরনে হাফ প্যান্ট, খালি গা। একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে খুকির দিকে, চোখের দৃষ্টিতে অগ্রজের সস্নেহ অথচ সকৌতুক ভাবটি ফুটে উঠেছে।

ভাল করে তখনও এর পরিপূর্ণ অর্থটা মাথায় যায়নি—বিজয় কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপরই সব ইতিহাসটা মনে পড়ায়, ছেলেটিকে অতর্কিতে গিয়ে ধরবে বলে পা টিপে টিপে যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে নেমে এল।

নিচে নামতে বড় জোর ওর দু মিনিট গেছে সবসুদ্ধ। কিন্তু কই? সে তো নেই। খুকি যেমন ঘুমোচ্ছিল তেমনি ঘুমোচ্ছে। তবে কি সেও স্বপ্ন দেখছিল, কিংবা কল্পনা? মিনুকে যা বলেছে তারও তাই?

কিন্তু না, ঐ তো পাখাখানা পড়ে আছে—ওটা সাধারণতঃ দেওয়ালের গায়ে পেরেকে আটকানো থাকে।

তাহলে ছেলেটা গেল কোথায়?

খাটের নিচে উঁকি মেরে দেখলে বিজয়, পাশের ঘর, ওপরের ছোট বাথরুমটা—কোথাও তো নেই। আবার ছাদে উঠল—যদি অন্য দিক দিয়ে উঠে গিয়ে থাকে তার অলক্ষ্যে—না, তাও তো নেই। দোর বন্ধ করে নেমে এসে দোতলাটা আবার ভাল করে দেখল তারপর একতলায় নেমে সিঁড়িতে এল। রান্নাঘরে ওরা বসে কাপে চা ঢালছে, তরুর মা বাসন ধুয়ে জমা করে রাখছে চৌবাচ্চার পাড়ে। পাশের ঘর দুটোরই কপাটে শেকল তোলা। সদর দরজা বন্ধ।

'হ্যাঁগো—তাকে দেখেছ কেউ?'

'কাকে গো?' ওর গলার আওয়াজে বিবর্ণ হয়ে অঞ্জলি বেরিয়ে আসে। মিনুর হাত কেঁপে খানিকটা চা মাটিতে পড়ে যায়।

সংক্ষেপে বিজয় সব কথা খুলে বলে। অঞ্জলি সবটা ভাল করে শোনবার আগেই ছুটে গিয়ে খুকিকে বুকে তুলে নিল। তারপর সবাই মিলে বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কোথাও তার চিহ্ন মাত্র নেই।

তরুর মা তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। ওর গলায় কান্নার সুর।

'কি হবে বাবু, আমি আর ওপরে যেতে পারবনি!'

অঞ্জলি তাকে ধমক দিয়ে ওঠে—'কেন কী হয়েছে কী? এই তো তিন দিন এসেছিস। সে তোদের ভয় দেখিয়েছে, না কোন অনিষ্ট করেছে?'

তরুর মা তখন যেন একটু প্রকৃতিস্থ হল, 'তা বটে

বাপু। তা ঠিক কথা। কৈ ভয়ডর তো কারুক্ষে দেখায়নি—'

অঞ্জলি বিজয়কে বললে, 'এইজন্যে বোধ হয় বাড়িওলার এত সাধুতা, তাই ভাড়া এত কম। তুমি এক কাজ করো—পাড়ায় দু'একজনের সঙ্গে দেখা করো। জানো ভাল করে ব্যাপারটা কি।'

বিজয়ের কথাটা মনে লাগল।

চটিটা পায়ে গলিয়ে সে তখনই বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

পাশেই থাকেন এক রিটায়ার্ড সাবজজ, তিনি তখন বাইরের রকে বসে সকালের খবরের কাগজটা পড়ছেন। বিজয় নমস্কার করে পাশে গিয়ে বসতে তিনি মুখ না তুলেই বললেন, 'দেখা দিয়েছে বুঝি?'

ভালরকম বুঝতে না পেরে বিজয় বললে, 'আজ্ঞে?'

কাগজখানা নামিয়ে রেখে এবার ওর দিকে চাইলেন ভাল করে সাবজজ বাবু, 'বলছি সেই ছেলেটাকে দেখেছেন তো? তাই তো এসেছেন? সাধারণতঃ এত দেরি হয় না, বাড়িতে আসার পরের দিনই ছুটে আসে সবাই!'

একটু হাসলেন তিনি। বিদ্রুপ ও করুণা মাখানো হাসি।

বিজয় বললে, 'দেখেছি আমরা আসবার আগেই। তবে আপনাদের কাছে খবরটা নিতে আসবার ঠিক অবসর পাইনি।' ইচ্ছে করেই একটু খোঁচা দেয় বিজয়।

'ও। দেখেছেন আগেই! আপনাদের সাহস আছে তো!' একটু ক্ষুণ্ণই হন ভদ্রলোক, 'মজা এই, আপনারা একবারও ভেবে দেখেন না যে চারিদিকে যখন বাড়ির আকাল তখন এত সস্তায় বাড়ি দেয় সে কী করে। আগে কেউ আসেন না আমাদের কাছে—তখন মনেই পড়ে না পাড়ায় এতগুলো লোক আছে। আসেন ঠকে, ঘা খেয়ে। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে ছুটতে ছুটতে।. . .কত তো দেখলুম। তিন দিনও কেউ থাকতে পারে না। আবার সেই পুরনো আস্তানাতেই ভাড়া বেশী দিয়ে ছুটে যেতে হয়! হুঁ!'

ক্লান্ত হয়েই যেন থামেন তিনি। বিজয় মনে মনে ততক্ষণে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, সে সেটা গোপন না করেই বললে, 'কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি?'

'ভূত! আবার কি!'

ভূত!'

'হ্যাঁ মশাই—ভূত। তবে বলি শুনুন—'

এই বলে তিনি কাহিনীটা খুলে বললেন।

'বছর পাঁচেক আগে একটি ভদ্রলোক এই ঘরটি ভাড়া নেন। আগে খুব বড় জমিদার ছিলেন তিনি—নানা বদ খেয়ালীতে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। এখানে আসার পরই ওঁর স্ত্রীর কি ভারী ব্যারাম হয়—ডাক্তার-ফাক্তার ডাকেননি, ভুগে ভুগে তিনি মরে গেলেন। নিয়ে দিয়ে রইল ঐ ছেলে—দিন কতক ঝি রেখেছিলেন সে-ই রেঁধে দিত, অন্য কাজও করত। কিন্তু সে মাইনে পায় না, কত দিন থাকবে? তা ছাড়া রান্না খাওয়ারও জিনিস থাকত না অর্ধেক দিন। তখন কর্তা নিজেই একবেলা রান্না ধরলেন, বিকেলের জন্যে কোনদিন সেই ভাতই থাকত, কোনদিন বা—মানে যেদিন পয়সা-কড়ি জুটত—সেদিন হোটেল থেকে রুটি মাংস কিনে আনতেন। প্রায়ই মদে বুঁদ হয়ে ফিরতেন—ছেলেটাকে ঠেঙাতেন বেদম। আবার নেশা ছুটে গেলে খুব আদরও করতেন। ছ'টা হয়ে মরে গিয়েছিল, ঐ এক ছেলে—শিবরাত্রির সলতে। উপার্জনের মধ্যে ছিল শুনেছি জুয়া খেলা—যেদিন কিছু মিলত সেদিনই মদের মাত্রা বেশী। যেদিন হেরে যেতেন সেদিন চুপচাপ। ছোট ছেলে, একাই থাকত বাড়িতে—উনি দোরে চাবি লাগিয়ে বেরিয়ে যেতেন। আমাদের সঙ্গে কোনদিন আলাপ পর্যন্ত করেননি। তবু আমি একদিন মশাই উপযাচক হয়ে বললুম, আমাদের কাছে রেখে যান না কেন ছেলেটাকে—সারাদিন তবু খেলাধূলা করতে পারে, আমার একপাল নাতি-নাতনী রয়েছে। ও হরি, মুখের উপর বললে কিনা, ধন্যবাদ। দরকার নেই কিছু—যত সব বদ ছেলে আপনার বাড়ির—অত মিশলে ছেলে বিগড়ে যাবে। . . .সেই থেকে আর কথা কইনি ওঁর সঙ্গে, ঘেন্না হত। অত অভদ্র ছোটলোককে কি বলব—ওর ছাগল ও যেদিকে পারে কাটুক।. . .তারপর এক দিন দেখি দিনেও তালা ঝুলছে। পর পর তিন দিন এমনি গেল। মনে করলুম বাড়িওলা খুব তাগাদা করছে, তাই সরে পড়েছে কোথাও বাপ বেটায়। দিন রাতই তো পাওনাদাররা আসত। একদিন বাড়িওলাও এলেন—বললেন, জানেন কিছু খবর—বললুম, না মশাই, কিছুই জানি না। তবে হ্যাঁ—আমার স্ত্রী একদিন বলেছিল

ছেলেটাকে ওর মধ্যে পুরে রেখে যায়নি তো, মাতালের কাণ্ড। আমি উড়িয়ে দিলুম—দুর, তাই ক ও পারে। হাজার হোক বাপ। তবু কান পেতে শুনতুম কোন শব্দই হত না। চার দিন পরে লোকটা ফিরল একটা রিক্সা করে— খুব রোগা হয়ে গিয়েছে, চক্ষু কোটরগত—হাত পা কাঁপছে। আমি তখন এই রকেই বসে। গাড়ি থেকে নেমে কোনমতে দরজার তালা খুলল, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আজ তারিখ কত বলতে পারেন? আমি তারিখ বললুম। তখন বললে, আমি কতদিন আসিনি বলুন তো? . . .তা চার পাঁচ দিন হবে। তখনই চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'আমার খোকা!'

বলতে বলতেই সাবজজ বাবুর চোখে জল এসে গিয়েছিল। চশমা খুলে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছলেন। বিজয় রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলে, 'তারপর?'

'আমি তো অবাক। খোকা ওর মধ্যে ছিল নাকি? চলুন চলুন, কী সর্বনাশ! ভেতরে গিয়ে দেখি ঠিক তাই—বিছানায় শুয়ে পড়ে আছে—তখনও প্রাণটা ধুক ধুক করছে। তবে সে যে বেশিক্ষণ নয় তা দেখেই বুঝলাম। ঘরে খাবার মতো একটা জিনিসও ছিল না, তার ওপর ছেলেটা নাকি কিছুদিন ধরেই ভুগছে—এই পাঁচ দিনের উপবাসে একেবারে শেষ হয়ে এসেছে। কী লক্ষ্মী ছেলে মশাই, একটু আওয়াজ করেনি, কাঁদেনি কাটেনি কিছু নয়—বরং ওর বাবা যখন এসে চিৎকার করে ডাকলে, খোকন রে বলে, একবার একটু চোখ চেয়ে হাসল। . . আমিই গেলুম ছুটে ডাক্তার আনতে। কিন্তু ডাক্তার কি করবে আর? সন্ধ্যাবেলাই ছেলেটা মরে গেল।'

'তারপর?'

'বাপটা তিন দিন ছিল পড়ে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যা জানলুম, ওর জুয়ার আড্ডায় সেদিন বুঝি অনেক টাকা জিতেছিল। যে বেশি হেরেছিল সে ওর টাকাটা কেড়ে নেবার মতলবে মদের সঙ্গে ধুতরোর রস মিশিয়ে খাইয়ে দেয়—তাতেই তিন চার দিন ওর কোন হুঁশ ছিল না—তারাও টাকাকড়ি নিয়ে সরে পড়েছে . . .এদিকে এই কাণ্ড। তিন দিন লোকটাও মুখে জল দিল না—আবার একটা নরহত্যা হয় দেখে আমরা একদিন জোর করে তাকে ভাত খাওয়ালুম। খেয়ে এখানেই পড়ে ঘুমোল, তারপর সন্ধ্যেবেলা উধাও—আর ফেরেনি। বেঁচে আছে কি মরে গেছে তা জানি না। বাড়িওলা পুলিশ কেস করে তালা ভাঙিয়ে মালপত্র ফেলে দিয়ে বাড়ি চুনকাম করিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত—কিন্তু তারপর আর ভাড়া হয় না। যে আসে সেই ছেলেটিকে দেখে, কারুর কোন অনিষ্ট করেনি কখনও—তবু ভূত দেখে কে আর থাকে বলুন।'

বিজয় ফিরে এসে আনুপূর্বিক সব কাহিনীটা খুলে বলল অঞ্জলির কাছে। মিনু তো কেঁদেই ফেললে, অঞ্জলিরও চক্ষু সজল হয়ে উঠল।

'আহা বাছা রে।'

বিজয় একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তাহলে এখন কি করা? আবার সেই পুরনো বাড়ি?' অঞ্জলি উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করে বললে, 'কী আর করব। আমি এখানেই থাকবো। সে তো আমাদের কোন অনিষ্ট করছে না। আত্মা একা থেকে হাঁপিয়ে ওঠে তাই আসে। আমার কোন ভয় নেই।'

তরুর মা বললে, 'তাই বলে ভূতের সঙ্গে থাকবে?'

'এই তো তিন দিন রইলি, কী করেছে সে তোর? অত ভয় হয় রামকবচ নিগে যা।'

'না না, সে কথা কি বলছি। আমি কি আমার লেগে বলছি, ছেলেমেয়েগুলো রয়েছে।' অপ্রতিভভাবে বলে সে।

'তা থাক। ওদের সে ভালবাসে, নইলে খুকির গরম হচ্ছে দেখে সে বাতাস করবে কেন?'

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে—সেইদিন থেকেই সে এ বাড়ি ছেড়ে দিল একেবারে। আর কোনদিন কখনও কেউ তাকে দেখতে পায়নি।

অঞ্জলি বরং দুঃখই করে, 'আহা রে, আমি দেখতে পেলুম না একবারও! তোমরা সবাই দেখে নিলে!'

বিজয় বলে, 'সে বেচারীকে সবাই ভয় করেছে, তোমার মতো ভালবাসেনি কেউ। ঐ ভালবাসাটুকুর জন্যেই তার তৃষিত আত্মা মুক্তি পাচ্ছিল না বোধহয়। এবার সে স্বর্গে চলে গেছে।'

অঞ্জলি ছল ছল চোখে বলে, 'তা হোক, এবার মহালয়ায় আমি তার নামে তিনটি বামুন খাইয়ে দেব।'

মিনু বলে, 'মাঝখান থেকে আপনি কিন্তু সস্তায় একটা বাড়ি পেয়ে গেলেন জামাইবাবু!'

'তা বটে।' বিজয়ও হাসে।

এসেচি জ্ঞানবাবু

কুমারেশ ঘোষ

আমি কখনো ভূত দেখিনি। তবে অনেক ভূতের গল্প শুনেচি। আঁতকেও উঠেচি তবে। শাস্ত্রের মতে আত্মা যে অমর তার প্রমাণ পেয়েচি। সেই ঘটনার কথা বলি। সত্যি ঘটনা—

জ্ঞানবাবুর পুরো নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য. আমাদের অফিসে কাজ করতেন। বাবার সময় থেকে। একাউন্টস-এর কাজ।

তাঁর হাতের লেখা তত ভাল ছিল না, তবে লোকটি ভাল ছিলেন। কোন সাতে-পাঁচে থাকতেন না। অফিসে আসতেন, খাতায় মুখ গুঁজড়ে কাজ করতেন, আবার ছুটি হলে চলে যেতেন।

অর্থাৎ হিসেব ঠিকমত রাখতে গেলে, হিসেব করে চলতে হয়, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, সব কিছুতেই হৈ-হৈ করা সাজে না। জ্ঞানবাবুর সে জ্ঞান ছিল। তিনি বেহিসেবী ছিলেন না। তবে হিসেব ভুল করলে বা ভুল দেখালে তাঁর মেজাজটা তখন বিগড়ে যেত। তখন তাঁর বিশেষ মন্তব্য ছিল ঃ ধ্যুত্তেরি ঘোড়ার ডিম।

মাঝে-মাঝে কামাই করতেন জ্ঞানবাবু। তার কারণ ছিল।

তাঁর একটি বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা ছিল। সেটা হচ্চে পূজা-পার্বণে বিয়ে-থাওয়ায় পুরোহিতের কাজ করা। ব্রাহ্মণ মানুষ, তাঁর বাবার কাছে জপ-মন্ত্রাদিও শিখেছিলেন, সেটাকে অর্থকরী করা তাঁর মত ছাপোষা মানুষের পক্ষে হিসাবমতই কাজ হয়েছিল।

জ্ঞানবাবু আমাদের বাড়িরও নানা পূজা-আচ্চাতেও পুরুতের কাজ করেচেন। আশীর্বাদ-পাকা দেখাতে আমাদের পক্ষের পুরুতমশায় হয়ে গেচেন অনেকবার অনেক জায়গায়।

এই জ্ঞানবাবু পরে প্রায়ই কামাই করতে লাগলেন। এবার কারণ অসুস্থতা। তাঁর বয়েস হয়েচে, তখন প্রায় পঁচাত্তর ছিয়াত্তর। প্রায়ই ভোগেন নানারকম রোগে। অবশ্য ছেলেরা বড় হয়ে গেচে, তারা চাকরি করচে, দু'একজনের বিয়েও হয়ে গেচে।

একদিন জ্ঞানবাবুর বড় ছেলে এসে খবর দিল, বাবা আর আসতে পারবেন না, শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েচে, বাসে-ট্রামেও উঠতে পারেন না। আমরাও তাই বারণ' করেচি, আর তোমার কাজে বেরুবার দরকার নেই। এখন আমরা তো বড় হয়েচি।

জ্ঞানবাবুর পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেওয়া হলো।

বাবার সময়কার মানুষটি আমাদের অফিসে তাঁর বহুদিনের চেয়ারটি ছেড়ে তাঁর বাড়িতে বিছানায় আশ্রয় নিলেন।

পরে তাঁর ঐ বড় ছেলের কাছেই শুনলাম, জ্ঞানবাবু আর তাঁর বিছানা ছেড়ে ওঠেননি। অনেকদিন ভুগে পরে তিনি দেহত্যাগ করেচেন।

ছেলেটি তার বাপের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করে গেল।

যেদিন জ্ঞানবাবুর শ্রাদ্ধ, সেদিন সকালে আমার কোথায় যেন একটা জরুরী কাজ ছিল। কাজেই তাকে বলে দিলাম, জ্ঞানবাবুর শ্রাদ্ধে আমি নিশ্চয়ই যাবো, তবে সকালের দিকে যেতে পারচিনে। বিকেলের দিকে যাবো।

তারপর সকালের সেই জরুরী কাজ সেরে, বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া করে যথারীতি বাইরের ঘরে আমার বিশেষ ধরনের সোফাটিতে তোফা আরামে খবরের কাগজটা পড়তে পড়তে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েচি।

হঠাৎ দেখি, জ্ঞানবাবু আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

সেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। যে সাজে অফিসে আসতেন।

আমি তাঁকে জিগ্যেস করলাম, আপনি এখন এলেন যে? আমারই তো বিকেলে আপনার বাড়িতে যাবার কথা!

তারপরেই দেখি, জ্ঞানবাবু আর নেই। মিলিয়ে গেলেন।

আমার ঘুমটাও ভেঙে গেল। আশ্চর্য।

মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে জামাকাপড় পরে মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের কাছে তাঁর বাড়িতে গেলাম বিকেল নাগাদ। তখন শ্রাদ্ধের কাজকর্ম সব শেষ হয়ে গেচে। আমি প্রণামী দিলাম। ছেলেরা আমাকে দানপত্র ইত্যাদি দেখালো। পরে একটা প্লেটে অনেকগুলি মিষ্টি এনে সামনে ধরলো।

খেতে-খেতে আমার দুপুরের স্বপ্নের কথা বললাম তাদের। শুনে তারা বেশ বেশিরকমই বিস্মিত হলো ঃ বলেন কি?

বললাম, হ্যাঁ, অমি স্পষ্ট দেখলাম জ্ঞানবাবুকে।

—কতক্ষণ আগে দেখেচেন বলুন তো?

—তা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আগে, বেলা আড়াইটে নাগাদ।

ছেলেরা বললে হ্যাঁ, প্রায় ঐ সময়েই মা-ও বাবাকে স্বপ্নে দেখেচেন। একটু আগেই বলছিলেন।

—কি রকম?

—মা কাজকর্মের পরে মেঝেয় শুয়েছিলেন একটু, পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দেখেন বাবা বাইরে বেরুবার সাজে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে। মা জিগ্যেস করলেন, কোথায় যাচ্চো এখন? বাবা বললেন, যাচ্ছি কুমারেশ-বাবুর বাড়িতে।

শুনে তাজ্জব বনে গেলাম।

মনে মনে তাঁর আত্মাকে প্রণাম জানিয়ে বললাম, এসেচি জ্ঞানবাবু।

রামকিঙ্করবাবুর অদ্ভুত ভাড়াটে

হিমানীশ গোস্বামী

ভাড়াটে লক্ষ্মণবাবুর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল। তিনি ইঙ্গিতে রামকিঙ্করবাবুকে কাছে আসতে বললেন। লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে রামকিঙ্করবাবুর সম্পর্ক যদিও ভাড়াটে-বাড়িওলার, কিন্তু ছত্রিশ বছর ধরে এত পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও কখনও কলহ-বিবাদ হয়নি। আর হবেই বা কেন, বাড়িওলা রামকিঙ্করবাবুর মেজাজ ছিল নরম, ভাড়াটের মেজাজও পাল্লা দিয়ে আরও নরম। দু-তিন বছর পর পর লক্ষ্মণবাবু রামকিঙ্করবাবুর কাছে বলতেন, আগামী মাস থেকে ভাড়াটা একটু বেশি নেবেন রামবাবু, যে-রকম খরচা বাড়ছে আপনার নইলে চলবে কেন? আর রামবাবু বলতেন, কী বলছেন লক্ষ্মণবাবু, এ কি কথা। এই তো তিন বছর আগে কুড়ি টাকা ভাড়া বাড়ানো হয়েছে, না-না, আর নয়। পরে দেখা যাবে। কিন্তু পরে দেখা যাবে বললেই তো হয় না, লক্ষ্মণবাবু একেবারে যেন মরীয়া! তিনি বলেন, ঠিক যদি এই মাস থেকে আরও তিরিশ টাকা বেশি না নেন তা হলে অন্য পন্থা ভাবতে হবে। অন্য পন্থার কথা শুনে রামকিঙ্করবাবু হাঁ হাঁ করে ওঠেন। তিনি বলেন, না লক্ষ্মণবাবু, অমন কর্মটি করবেন না। ঠিক আছে। আপনি ভাড়া বাড়াতে চান ঠিক আছে, কিন্তু তাই বলে এক ধাক্কায় ত্রিশ টাকার দরকার কি? পনরো টাকাই যথেষ্ট। ঐ কথা শুনে গুম হয়ে যান লক্ষ্মণবাবু। তিনি বলেন, হয় ত্রিশ টাকা বাড়াতে হবে নয়তো...।

লক্ষ্মণের এই নয়তোটাই মারাত্মক এক শক্তিশেলের মতো রামকিঙ্করবাবুকে আঘাত করে। এই 'নয়তো' ব্যাপারটা আর কিছু নয়, লক্ষ্মণ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার ইঙ্গিত করছেন। রামকিঙ্করবাবু বলেন, ঠিক আছে, পরশু থেকে আপনার ফ্লাটটির চুনকাম করিয়ে দেব, তা ছাড়া দরজা জানালাগুলোও রঙ করিয়ে দেব।

—উহুঁ! লক্ষ্মণবাবু বলেন, পাগল হয়েছেন রামবাবু? এই তো আড়াই বছর আগে চুনকাম করিয়ে দিয়েছেন, তার উপর আবার রঙও করিয়েছেন। মুখ ধোয়ার বেসিনটা একটু চিড় ধরেছিল, সেটাও বদলে দিয়েছেন। বলব কি এর উপর বাড়াবাড়ি করে একটা গীজার পর্যন্ত বসিয়েছেন, এ বছরটা আর রঙ করানো কেন, চুনকামই বা করা কেন?

রামকিঙ্করবাবু বলেন, ঠিক আছে আগামী বছরে আমাকে আর বারণ করবেন না। আর একটা কথা, কখনও এই বাড়ি ছেড়ে দেবার কথা বলবেনও না, ভাববেনও না। তা হলে কিন্তু মনে ব্যথা পাব।

লক্ষ্মণবাবু আশ্বাস দেন। বলেন, কিছু মনে করবেন না রামকিঙ্করবাবু, আপনি এমন ভাল লোক যে আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছেই করে না। কিন্তু আপনি যে একটু অবুঝ হয়ে পড়েন। সামান্য একটু ভাড়া বাড়ানো এমন কিছু অন্যায় অনুরোধ তো নয়। যাক্ আপনার

কথাই আমি মেনে নিচ্ছি, আপনার মতো ভাল বাড়িওলার বাড়ি কখনও ছাড়ব না, মরে গেলেও না।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে এই রকম কথাবার্তা হয়েছিল আদর্শ বাড়িওলা এবং আদর্শ ভাড়াটের মধ্যে। তারপর আস্তে আস্তে সময় বদলেছে। লক্ষ্মণবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন, বড় ছেলে চলে গেছে আমেরিকায় অধ্যাপনার কাজে, মেয়েরও বিয়ে হয়ে চলে গেছে, তবে কাছেই থাকে। রামকিঙ্করবাবুও প্রায় একা হয়ে পড়েছেন। তাঁর দুই মেয়ের এক মেয়ে থাকে বোম্বাইয়ে, আর একজন কাছেই থাকে, সে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে এক ছেলে আর দুটি মেয়ে নিয়ে। সেই সময়টা ভারি খুশি হয়ে পড়েন রামকিঙ্করবাবু। লক্ষ্মণবাবুরও তখন আনন্দ বেড়ে যায়। বাড়িতে সব সময়ের জন্য থাকে একজন ঠাকুর। তার বয়স হয়েছে। তার নাম দুখিরাম। বাংলাদেশে তার কিছু আত্মীয়-স্বজন থাকে, বছরে একবার চলে যায়, সেই সময়টা মেয়ে এসে থাকে। আর সেই কারণেই বাড়িওলা আর ভাড়াটের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও বেড়েছে। খাওয়া-দাওয়াও দুজনে একসঙ্গে করেন। ওঁদের যে-সব বন্ধুবান্ধব আছেন তাঁরা এলে একসঙ্গে প্রায়ই তাস খেলায় মেতে ওঠেন ওঁরা। কখনও বা দাবা নিয়ে খেলতে বসেন। কারও অসুখ হলে দেখাশোনা করেন, ডাক্তারকে খবর দেন। এই রকমই চলছিল গত কয়েক বছর। এই সময় লক্ষ্মণবাবুর খুব একটা অসুখ করে। তিনি বুঝতে পারেন তিনি আর বেশিক্ষণ বাঁচবেন না। তিনি রামকিঙ্করবাবুকে ডেকে বলেন, ভাই রাম, আমি তো চললাম। যাওয়ার আগে বলতে চাই বড় আরামে ছিলুম ভাই। এমন চমৎকার ব্যবহার! আমার মরেও শান্তি হবে না। স্বর্গে না নরকে কোথায় যে শালারা ফেলবে কে জানে, কিন্তু যেখানেই থাকি আমার ভাল লাগবে না।

—না না, কি বলছ ভাই লক্ষ্মণ। তুমি থাকবে, মরবে কেন? আমি থাকতে তোমার যাওয়া চলবে না। সে বড় অন্যায় হবে।

—আমি কি যেতে চাই রাম? কিন্তু যমদূতেরা শিয়রে দাঁড়িয়ে, এখন তো আর বাঁচার কোন কায়দা নেই।

—দাঁড়াও আমি বঙ্কিম ডাক্তারকে ডাকি। ধন্বন্তরি ডাক্তার। বহু যমদূতকে যমের বাড়ি পাঠিয়েছেন তিনি!

—ও সবে কাজ নেই। বঙ্কিম ডাক্তার আমাকে ক-দিন সুস্থ রাখবেন? আর বড় জোর তিন দিন কি ধরো তিন মাস? ওতে আমি নেই। আমি চললাম। আর আমি এখানেই থাকব। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। কেবল দেখো যেন আমার শ্রাদ্ধটা ঠিকমতো না হয়। ব্যস্, তা হলেই হবে।

—তার মানে? শ্রাদ্ধ ঠিকমতো না হয় এর মানে কি? তুমি ভুল বলছ লক্ষ্মণ। আসলে তুমি বলতে চাও শ্রাদ্ধ যেন ঠিকমতো হয়, এই তো?

—না না। আমি ঠিকই বলেছি। শোনো রাম, ছত্রিশ বছরের সম্পর্ক তোমার সঙ্গে। বড় জড়িয়ে গেছি। আমার আত্মার শান্তি হলে, মানে শ্রাদ্ধ ঠিকমতো হলে আমার আত্মার শান্তি হবে, কিন্তু সে শান্তি আমি চাই না। আমি এই পৃথিবী ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। পৃথিবী নয়, এই চারের একের এক বিড়িওলা রোড থেকে কোথাও গেলে আমি আর বাঁচব না। যমদূতেরা নিয়ে যাক যেখানে ইচ্ছে, বেচারা বাপ বাপ বরে ফেরত দিয়ে দিতে বাধ্য হবে, যদি আমার আত্মার শান্তি না হয়। দেখো রাম, জগতে থেকে এইটেই সার বুঝেছি শান্তি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি একঘেয়ে জিনিস। কোনও চিন্তা নেই, আর তাই দুশ্চিন্তাও নেই। শান্তিতে থাকা মানেই সর্ব ব্যাপারে তৃপ্তি। সেটা মোটেই একটা সুখের ব্যাপার হবে না। আমি সুখই চাই। শান্তি চাই না। যারা সুখ আর শান্তি দুইই চায় তারা মূর্খ। তারা জানে না সুখ আর শান্তি দুটি আলাদা ব্যাপার। যেখানে সুখ সেখানে শান্তি থাকতেই পারে না। শান্তি মানে সমস্ত ইচ্ছের পরিসমাপ্তি।

হাঁপাতে লাগলেন লক্ষ্মণ।

—থাক থাক, আর কথা বলো না ভাই লক্ষ্মণ, আর কথা বলো না। আমি সব বুঝে গিয়েছি। জানি না এর ফলে কি হবে, হয়ত ভয়ঙ্কর কোন কান্ড হবে, কিন্তু তোমার অনুরোধ আমি ঠেলতে পারব না। তুমি যা বলছ তাই করব।

—তাহলে আমি চোখ বুজলাম। এই বলার পরই তাঁর দেহ স্থির হয়ে গেল। রামকিঙ্করবাবুর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগল।

শ্রাদ্ধ যথানিয়মে হয়ে গেল। অনুষ্ঠান সবই হল তবে রামকিঙ্করবাবু আসল পুরোহিত না এনে এক অভিনেতাকে পুরোহিত সাজিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর যে-সব সামগ্রীর প্রয়োজন, যা না হলে শ্রাদ্ধ হয় না এমন সব সামগ্রীর বদলে অন্য রকম সব সামগ্রী সংগ্রহ করলেন। দুধের বদলে সাদা রঙ গোলা জল, চন্দনের বদলে সেগুন কাঠ, আতপ চালের বদলে গমের তৈরী খুদে খুদে সব চালের মতো দেখতে জিনিস আনলেন। গঙ্গাজলের বদলে এক ডোবা থেকে জল এনে তাতে কাদা মিশিয়ে দিলেন, একবার পুজো হয়ে গেছে সেই সব ফুল জোগাড় করলেন, আর পুরোহিত যে মন্ত্র পড়ল তার কোনও মানে হয় না। এক সংস্কৃত রামায়ণ থেকে বাংলায় কিছু তুলে নিয়ে তাই পড়লেন। ছেলে আমেরিকায় থাকে, সে অতি আধুনিক, সে মাথাও কামাল না। তাতে রামকিঙ্করবাবু খুশি হলেন। তবে মেয়ে তার অংশটি পালন করল শুদ্ধভাবেই। লক্ষ্মণবাবুর ছেলে বলল, এ বাড়ির সব জিনিসপত্র তার বোন নিয়ে যাবে। যে সব জিনিস দরকার নেই সে-সব জিনিস বিক্রি করে সেই টাকাটা তার বোন নিয়ে নেবে। বলে সে নিজের জায়গা আমেরিকায় চলে গেল ফের।

২

এর সপ্তাহ তিনেক পর রামকিঙ্করবাবু বাড়িতে ঘুমোচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে হল তাঁর ঘরে কেউ এসেছে। কেমন যেন আওয়াজ হচ্ছে। তিনি চমকে চমকে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, কে?

—আহা আমি, ঘুম ভাঙালুম বুঝি রাম? ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার।

রাম বললেন, কে লক্ষ্মণ? এসো এসো। বাঃ আসতে পারলে?

—পারব না? শ্রাদ্ধ যা করেছিলে তাতে না এসে কি পারি? ব্যাপারটা কি হয়েছিল শুনবে?

—শুনব বই কি! বাঃ তোমার কথা শুনব না?

—কিন্তু তার আগে এক কাপ চা হলে হত না?

—চা খাবে? বাঃ বেশ তো। চা খাবে বইকি।

—বড় তেষ্টা। সেই কোথায় যমের বাড়ি। সেখান থেকে এতটা পথ প্রায় উড়তে উড়তে এসেছি। ক্লান্তি নেই বেশি, তবে তেষ্টা বেশ পেয়েছে।

রামবাবু উঠে পড়েছেন বিছানা ছেড়ে। বললেন, আমিই চা করে দেব। দুখিরামকে ডাকার দরকার নেই। তোমার কথা শুনলে সে হয়তো ভয়েই অজ্ঞান হয়ে যাবে।

লক্ষ্মণবাবু বললেন, আরে এ-সব কাজ আমিই করতে পারতাম। আমারই করবার কথা। কিন্তু জানো তো মরবার কতদিন পর পর্যন্ত যেন আত্মার শারীরিক ক্ষমতা তেমন থাকে না। মন আমার আগের মতো হলেও আত্মার বয়স তো কম। সবে তিন সপ্তাহ। মনে হয় সময় লাগবে গায়ে জোর হতে।

সে রাতে দুজনে মিলে অনেক কথা হল চা খেতে খেতে।

তারপর লক্ষ্মণবাবু বললেন, আমি চললাম।

—কোথায় যাবে এত রাত্রে?

—কেন আমার ঘরে? আমার ঘর ঠিক আছে তো?

—ঘর তো ঠিক আছে, কিন্তু আসবাবপত্র তো কিছু নেই।

—সর্বনাশ! গেল কোথায় সে-সব?

—তোমার মেয়ে সব বিক্রি করে দিয়েছে। ঘর এখন খালিই বলতে পার।

—তাহলে তো ভারি বিপদ! সব নিয়ে গেছে?

—সব।

—আমার টেলিফোন?

—সেটাও।

গুম হয়ে গেলেন লক্ষ্মণবাবু। বললেন, তুমি একটু বুদ্ধি খরচ করতে পারলে না? আমি তোমাকে এত করে বলে গেলাম ফিরে আসব।

—ভুল হয়ে গেছে ভাই, আমাকে মাপ করো।

আবার নতুন করে সব সংগ্রহ করা কি সোজা কথা? খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন লক্ষ্মণবাবু।

—আজকের মতো এই আমার ঘরেই কাটিয়ে দাও। কালই তোমার জন্য সব ব্যবস্থা করে দেব। নতুন খাট আলমারি চেয়ার টেবিল সব এসে যাবে।

—তাহলে ভড়াটা কি রকম হবে?

—ভাড়া? ভাড়ার কথা উঠছে কোত্থেকে? তুমি আমার বন্ধু। বন্ধুর কাছ থেকে ভড়া নেওয়া হয় কখনও? তাছাড়া আগে সে অন্য রকম ব্যাপার ছিল, এখন তোমার. . .।

চুপ করে গেলেন রামকিঙ্করবাবু।

—আমার কি?

—তোমার. . .মানে তোমার স্ট্যাটাস বদলে গেছে না?

—হুঁ, বললেই হল স্ট্যাটাস বদলে গেছে?

রামকিঙ্করবাবু বললেন, নিশ্চয়ই বদলে গেছে। আগে তুমি ছিলে শরীরী। এখন তুমি হচ্ছ অশরীরী।

—তাতে কি হয়েছে? ওজনটা একটু হালকা হয়েছে বলতে পারো। উঃ শরীরটা যখন ভারি ছিল তখন চলতে ফিরতে বেজায় কষ্ট হত। এক হালকা হওয়া ছাড়া আর কি আমার বদল ঘটেছে?

—ঘটেনি বলতে চাও?

—ঘটেনি। আমি আগে যা ছিলাম তাই তো আছি।

—ঠিক তাই আছ? আচ্ছা একটা পরীক্ষা করব তোমাকে, রাজি?

—রাজি।

—আমার নাম জানো?

—জানি বইকি?

—বলতো?

—বামকিঙ্কর।

—মোটেই না। বামকিঙ্কর আমার নাম নয়।

—ঘামকিঙ্কর।

—হলো না।

—দামকিঙ্কর? হল না? অ্যাঁ, তাও হল না?

—তুমি নিজের নাম বলতো।

—বক্ষণ মুখোপাধ্যায়।

হা হা করে হাসলেন রামকিঙ্কর। বুঝতে পারলে কেন হাসলাম?

—না।

—তোমার স্ট্যাটাস বদলে গেছে বন্ধু! তুমি রাম লক্ষ্মণ উচ্চারণ করতে পারবে না।

—আচ্ছা আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি যে চা খেলে সেটা কেমন লাগল?

—যাচ্ছেতাই।

—কেন জানো? চা কিন্তু চমৎকার, দার্জিলিঙই ছিল।

—দার্জিলিঙ চা এমন খারাপ লাগবে কেন?

—তোমার পরিবর্তন হয়েছে। দেহের এবং মনের। দেহ অবশ্য নেই। আছে দেহের একটা আবছা আভাস। এখন তোমার অন্যরকম জিনিস খেতে ভাল লাগবে।

—অন্যরকম জিনিস?

—হ্যাঁ। যেমন ধর পোড়া শোল মাছ।

নাম শুনেই লক্ষ্মণবাবুর অশরীরী জিভে জল এসে গেল।

—শুঁটকি ইলিশ।

—ঠিক বলেছ ভাই, শুঁটকি ইলিশ। একটু পচা হলে আরও ভাল হয়। গঙ্গার ইলিশ হবে বা না হবে পদ্মার এই রকম ইলিশ একটু বাসী করে রেখে রোদ্দুরে শুকিয়ে সঙ্গে একটু সরষের তেল. . .।

—ঠিক আছে, কাল থেকে ব্যবস্থা হবে।

—এবার কিন্তু ভাড়াটায় আপত্তি করো না। কেবল তো একটা পুরো ফ্ল্যাট দখল করে থাকা নয়, নতুন আসবাবপত্র, তার উপর দু বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা, না ঘামবাবু, তোমাকে এই হাজার পাঁচেক টাকা মাসে নিতেই হবে।

রামকিঙ্করবাবু প্রায় আঁতকে উঠলেন। বললেন, বলো কি লক্ষ্মণ, তা কখনো হয় নাকি? পাঁচ হাজার টাকা!

—আরে আমার কি টাকার ভাবনা আছে নাকি? লক্ষ্মণবাবু বললেন, তুমি শুধু বলবে অমুক লোক বদমায়েশ, তমুক লোক বউকে মারে, কিংবা কেউ ঘুষ খায়, ব্যস্ আমি তাদের বাড়ি থেকে সব নিয়ে আসব জিনিসপত্র। আচ্ছা হরিদাস বাবু তো অন্যের ফ্ল্যাট করিয়ে দেবে বলে কত লোককে ফাঁকি দিয়ে কত লক্ষ টাকা গায়েব করেছিল, তার বাড়িতে কালই যাব। গিয়ে মজা দোব যা একখানা।

—না না লক্ষ্মণ, অমন কাজও করো না। অন্যের জিনিসপত্র এ বাড়িতে এনে রাখলে আমাকে চুরির দায়ে জেলে পুরে দেবে। সে এক কেলেঙ্কারি হবে। না লক্ষ্মণ, ও সব বদ মতলব ছেড়ে দাও।

লক্ষ্মণ বললেন, তাহলে আর কি কেবল টাকাই নিয়ে আসব। সুহাসবাবু আদালতে সামান্য কেরানিগিরি করে গোলপার্কের কাছে এক বিঘে জমি কিনেছে, হুঁ, ওর বাড়িতে কাল রাত্রেই হানা দেব। বাড়িতে নিশ্চয় টাকার পাহাড় আছে শয়তানের. . .।

রামবাবু বললেন, দ্যাখো লক্ষ্মণ, যখন তুমি জ্যান্তো ছিলে তখন তো এসব আইডিয়া মাথায় আসেনি। তখন তো কারুর বিরুদ্ধে কোনও কিছুই করনি। এখন হঠাৎ এই বাতিক উঠল কেন?

—হঠাৎ নয়। আমি যমের বাড়ি থেকে ফিরবার পথে এই সব কথা নতুন করে মনে উদয় হচ্ছিল। ভাবলাম, সারা জীবনটা নিজের নিজের করেই গেলাম। নিজের কথা ছাড়া ভাবিনি অন্য কারুর কথা। কত লোক কত ভাবে অত্যাচারিত, শোষিত! আর আমরা কি করেছি?

রামকিঙ্করবাবু বললেন, তুই শুধু ছিন্নবাঁধা পলাতক বালকের মত সারাদিন বাজাইলি বাঁশি! এখন আর আক্ষেপ করে কি হবে?

—এখন কি কিছুই করা যাবে না?

—ভয় দেখিয়ে লোককে অজ্ঞান করতে পার। কিন্তু তাতে কি দেশ থেকে পাপ উধাও হয়ে যাবে?

লক্ষ্মণবাবু অনেকক্ষণ কি ভাবলেন। বললেন, মানুষের দুঃখ দুর্দশা এসব এই রকমই চলতে থাকবে?

—কি জানি। রামকিঙ্করবাবু বললেন, যা হচ্ছে তা ঠেকাবার উপায় তো নেই। এখন একটু ঘুমনো যাক।

—আমি কোথায় শোব?

—কেন, পাশের ঘরে একটা খাট আছে, বিছানাটা একটু ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

—না না, পরিষ্কার করার কি দরকার? একটু ধুলো বালি থাকা ভাল।

রামকিঙ্করবাবু বললেন, গুড নাইট।

লক্ষ্মণবাবু পাশের ঘরে চলে গেলেন।

সকাল হলে রামকিঙ্করবাবু ফ্রিজ থেকে একটা মাছ বের করে পুড়িয়ে লক্ষ্মণবাবুকে ডাকতে গেলেন, দুখিরাম

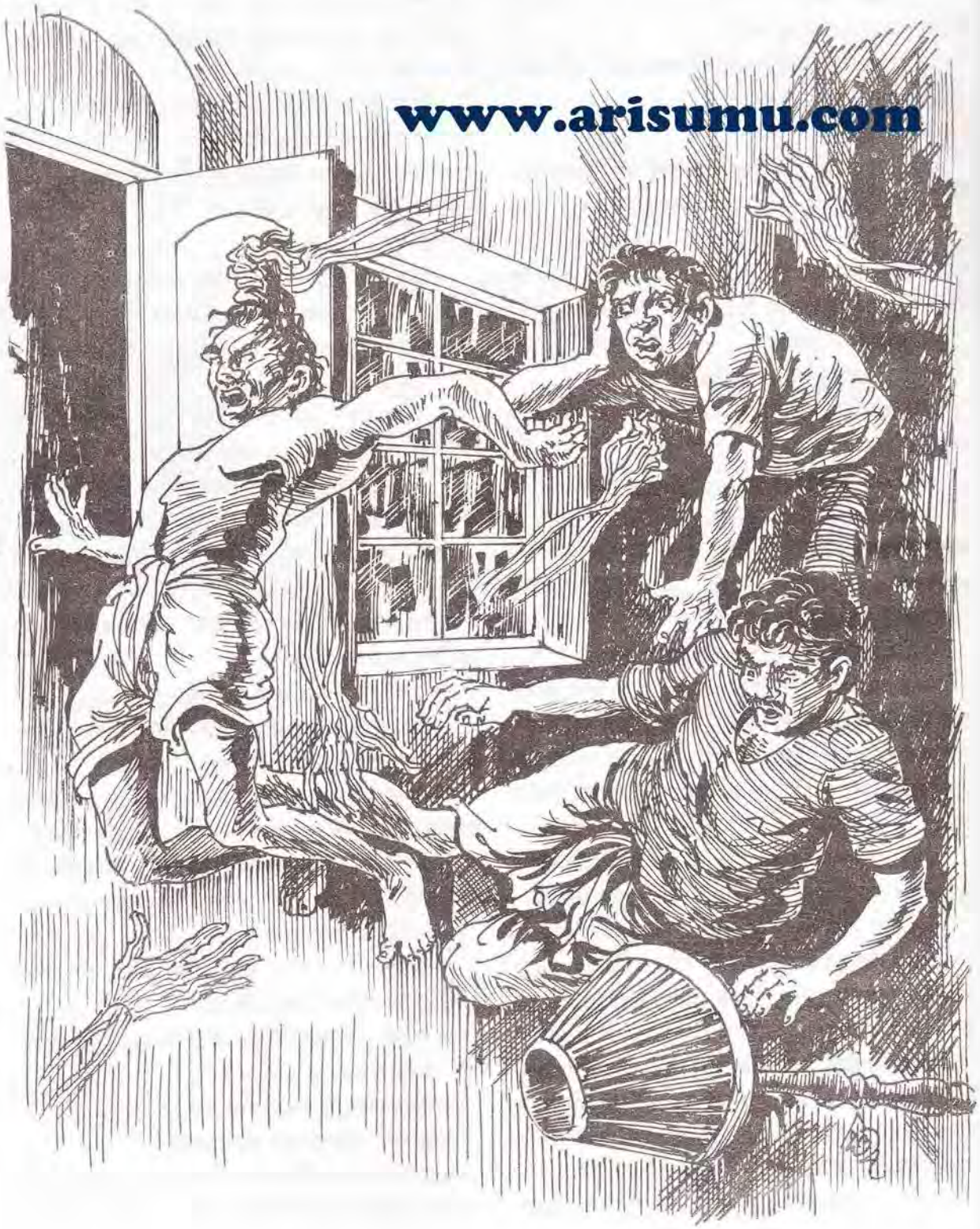

www.arisumu.com

ঘুম থেকে ওঠার আগেই। দুখিরাম জানতে পারলে কি কাণ্ড করবে কে জানে!

পাশের ঘরে গিয়ে ডাকলেন, ও লক্ষ্মণবাবু!

কোনও উত্তর নেই।

অনেকক্ষণ ডাকবার পর ব্যাপারটা বোঝা গেল। দিনের আলোয় অশরীরীদের পাত্তা পাওয়া যায় না।

যাই হোক, তিনি সকালেই পাড়ার একটা ফার্ণিচারের দোকান থেকে আনালেন একটা ভাল খাট, গদি, বিছানার চাদর, বিছানা-ঢাকা বালিশ। এমনকি মশারিও একটা কিনে ফেললেন। ভাবলেন, কি জানি যদি দরকার হয়। পাড়ার লোক একটু অবাকই হলেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করলেন, কি রামবাবু, বাড়িতে নতুন ভাড়াটে বসাচ্ছেন বুঝি?

—না না, নতুন ভাড়াটে কোথায়? বলে অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন।

অনেকেরই লোভ ছিল রামকিঙ্করবাবুর বাড়ির ঐ ফ্ল্যাটটায়। ফ্ল্যাট তো চমৎকার, তা সে তো কত চমৎকার ফ্ল্যাটই পাওয়া যায় কিন্তু অমন বাড়িওলা আর ভূভারতে পাওয়া যায় না যে সে বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না।

অনেকে এসে অনুরোধ উপরোধ করেন, কিন্তু রামকিঙ্করবাবু একেবারে অনড়। তিনি কোনও কথাই কানে তোলেন না। না, ফ্ল্যাট যেমন আছে তেমনি থাকবে, ও ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। না না না!

এইভাবে চলছে বেশ। দুখিরামকেও শেষ পর্যন্ত বলতে হয়েছে ব্যাপারটা। লোকটি সরল আর একটু বোকা হলেও সে বুঝে নিয়েছে লক্ষ্মণবাবুর ব্যাপারটা। তা ছাড়া রামকিঙ্করবাবুর প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। আর লক্ষ্মণবাবুর প্রতি তার ছিল দারুণ একটা আকর্ষণ। লক্ষ্মণবাবু বেঁচে থাকতেই তার প্রতি কখনও খারাপ ব্যবহার করেননি, আর মরে গিয়ে সূক্ষ্ম শরীরে খারাপ ব্যবহার করবেন সেটা দুখিরাম বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না বটে তবে সে এক গুণিনের কাছ থেকে একটা সাধারণ শক্তির তাবিজ নিয়ে পরেছে। গুণিন বলেছে, ভাল ভূত হলে এতেই কাজ হবে। তবে যদি ভূত ভাল না হয় তাহলে আরও অন্য রকম সব তাবিজ আছে সেগুলো দরকারমতো দেওয়া যাবে।

ফলে দুখিরামের মনে যেটুকু ভয় ছিল তাও চলে গিয়েছিল।

এই রকমই চলছিল বেশ। অবশ্য পাড়ার লোকেরা বুঝতে পারত না। প্রায় রোজ দুখিরাম শেয়ালদার বৈঠকখানায় গিয়ে গাদা গাদা শুঁটকি মাছ কেন কেনে? কয়েকদিন পাড়ার শিবেন সমাদ্দারের সঙ্গে দুখিরামের দেখাও হয়ে গেছে শুঁটকি মাছ কেনার সময়। একদিন তো তিনি বলেই বসলেন, ও দুখিরাম, বলি ব্যাপার কি বলত, অ্যাত অ্যাত শুঁটকি মাছ নিয়ে কি করো তুমি? দুখিরাম বোকা-বোকা হলে কি হবে, সে বলেছিল, ওই একটু ব্যবসা করি। শিবেন সমাদ্দার বলেছিল, ব্যবসা করার আর জিনিস পেলে না? দুখিরাম বলেছিল, এই ব্যবসায় লাভ হয় বাবু। দিনে দশ বারো টাকার উপর লাভ থাকে।

এইভাবেই চলছিল। একবার একটা কাণ্ড হল।

রামকিঙ্করবাবুর এক যাত্রাওলা বন্ধু এসে অনেক করে বলে গেল নন্দীভৃঙ্গি যাত্রা দেখতে। তা সে তো কাছে নয়, শ্রীরামপুরের এক মাঠে। খুব নাকি চলছে। ওঁর বন্ধুর সামান্য একটা পার্ট আছে, তবে আসলে সগৌরবে শততম রজনী অভিনয়ের রাত্রে দুশোর উপর বিশিষ্ট আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। যাত্রা শেষ হওয়ার পর ছিল খাওয়া-দাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা। আগে রামকিঙ্করবাবুর যাত্রাওলা বন্ধু বলেছিলেন খুব তাড়াতাড়িই সব শেষ হয়ে যাবে। শীতের সন্ধে সাতটায় যাত্রা শুরু করে সাড়ে নটায় শেষ, তারপর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে, ভাড়া করা লাকসারি বাসে করে সব কলকাতায় ফেরত পাঠানো হবে। তারা এগারোটা সাড়ে এগারোটায় সবাই বাড়ি পৌঁছে যাবেন। কিন্তু সেদিন শীতকাল হলেও খুব বৃষ্টি পড়ছিল, আর যাত্রা শেষ হবার পর শুরু হয়েছিল প্রবল ঝড়। কোনও মতে ওঁদের বাস অন্ধকারে আর বৃষ্টিতে একেবারে এক খানায় গিয়ে পড়ল। রাত্রে আর তাঁদের ফেরা হল না।

আর এই দুর্যোগে তিন চারটে চোর রামকিঙ্করবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির। তারা ঠিক চুরি করতে নয়, ঝড়-বৃষ্টিতে আশ্রয় নেবার জন্যই বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। দরজা খোলাই ছিল। রাত্রে সব দিন সদর দরজা বন্ধ করাও হত না, কেননা লক্ষ্মণবাবু সারারাত জেগে থাকতেন, আর বাড়িতে চোর কেন, বেড়াল কুকুর কিচ্ছু

ঢোকার সাধ্য ছিল না।

একবার একটা চোর এসেছিল। বাড়িতে ঢুকে একটা রেডিও আর গোটা দুয়েক ঘড়ি নিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করতেই অকস্মাৎ সে বুঝতে পারল কে যেন তাকে ধরে একটু উড়িয়ে নিয়ে কোথায় যেন ফেলে দিয়ে এল। সে সেখানে পড়তেই কারা সব ছুটে এল। চোর বুঝতে পারল এক বিচ্ছিরি জায়গায় তাকে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে! জায়গাটা তার চেনা। বার পাঁচেক এখানে সে আগে এসেছে, সব সমেত আড়াই বছর তার এখানে কেটেছে। দমদম সেন্ট্রাল জেল!

তা এই বাড়িতেই তিনটে চোর ঢুকে দেখল ভারি মজা। বাড়িতে জিনিসপত্র অঢেল কিন্তু একটা লোকও নেই! চোরেরা করল কি এ আলমারি সে আলমারি খুলে ঘড়ি, কয়েক হাজার টাকা, দুটো ট্রানজিস্টর রেডিয়ো এই সব বার করে এক জায়গায় জড়ো করে রেখে যেমনি সেই লোকটা একটা বিরাট বস্তায় ঢোকাতে যাবে এমন সময় জিনিসগুলো অদ্ভুত আচরণ শুরু করল। রেডিয়ো দুটি হালকা হয়ে উড়তে উড়তে যথাস্থানে গিয়ে স্থির হল। টাকাগুলি শাঁ করে উড়ে গিয়ে আলমারির মধ্যে আগে যেখানে ছিল সেখানে ঢুকে গেল। তিন তিনটে ঘড়ি অন্য আলমারিতে চলে গেল। দরজা খুলে ঢুকল, ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল! চোরেরা তো ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে রয়েছে। বুঝতে পারছে এ কোনও অপদেবতার কাজ হবে। তারা তো রাম রাম রাম বলছে আর আতঙ্কে তাদের দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। এদিকে তারা দেখে কখন ঘরের আলো গেছে নিভে আর তাদের কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি ধপাধপ করে কিল মারছে আর চটাপট চটাপট করে চড় মারছে। কখনও কখনও তাদের চুল ধরে শূন্যে তুলছে আর ধপ্ করে ফেলছে, তারা ব্যথায় চিৎকার করতে গিয়েও ভয়ে তাদের চিৎকার বন্ধ হয়ে আসছে। এইভাবে ঘণ্টা তিনেক তাদের নাস্তানাবুদ করার পর যখন ভোর হয়ে এল তখন তারা সব ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল মেঝেতে। সকালবেলায় রামকিঙ্করবাবুরা ফিরে এসে চোরদের ঐ অবস্থায় দেখে সবই বুঝতে পারলেন। তাছাড়া কানের কাছে লক্ষ্মণবাবুর আওয়াজ পেলেন। লক্ষ্মণবাবু বললেন, উঃ বড় মেহনত গেছে রাত্রে। বড় গায়ে ব্যথা। আমি শুতে চললুম। আমবাবু, দিনের আলোয় আর কথা বলব না, ভূত সমাজে তাহলে ভারি নিন্দে হবে। সন্ধে বেলা সব বলব যখন সে ভারি মজা!

এই রকম কত ঘটনা যে ঘটেছিল ঐ বাড়িতে। মনে করে লিখতে পারলে একখানা বড় বই হয়ে যায়। আমার আরও লেখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু এখন তো আর জায়গাও নেই।

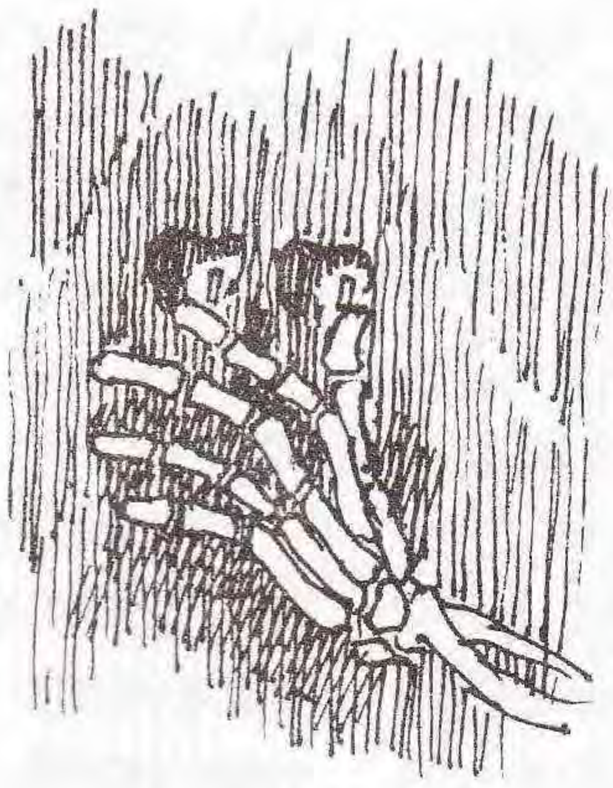

www.arisumu.com

রাত্রির যাত্রী

মঞ্জিল সেন

এই পাহাড়ি অঞ্চলে ডাকবাংলোটাই যে একমাত্র ভরসা সেটা সুখেন্দুর অজানা ছিল না। নির্জন অঞ্চল, গাঁ বলতে দূরে কয়েক ঘর মানুষের বাস—গরীব, পরিশ্রমী মানুষ, কিন্তু শিশুর মতো সরল। রুক্ষ পাথুরে মাটিতে বহু পরিশ্রমে তারা ফসল ফলায়, কিন্তু তাতে সারা বছর তাদের চলে না, তাই তারা বেরিয়ে পড়ে গতর খাটা কাজে, তার মধ্যে ভ্রমণবিলাসী মানুষের মালপত্তর বইবার কাজও আছে। ঘর ছেড়ে অনেক দূর চলে যায়।

সুখেন্দুও একজন ভ্রমণবিলাসী। ওর আবার পাহাড়ের আকর্ষণটাই বেশি, নদী বা সমুদ্র অতটা নয়। পাহাড় যেন ওকে টানে। দু'তিন বছর অন্তর ও বেরিয়ে পড়ে। এই মাঝখানের সময়টা ও টাকা জমায়, পাহাড়ে বেড়াবার টাকা। একটা সওদাগরি আপিসের কেরানির চাকরি, তার পক্ষে এই ভ্রমণের নেশাটা বড়লোকি শখ বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।

এই ডাকবাংলোর কথা ও টুরিস্ট গাইড বুকেই জেনেছিল। এখানে অবিশ্যি ও রাত কাটাবে না। ডাকবাংলোর মাইল খানেক দূরে একটা রাস্তা গিয়ে মিশেছে মানালি যাবার রাস্তার সঙ্গে। সুখেন্দু যাবে সেখানে। একটা বাস ওই দ্বিমুখী রাস্তার মোড়ে রাত ন'টায় আসে। ওখান থেকে যায় মানালি। ওই বাসটাই ধরবে ও। সুখেন্দু অবিশ্যি আগেই মানালির বাস ধরতে পারতো, কিন্তু ও পায়ে পায়ে অনেকটা ভেতরে চলে গিয়েছিল। নতুন জায়গায় হেঁটে বেড়াবার আনন্দই আলাদা, বিশেষ করে এইসব অচেনা, অজানা পাহাড়ি এলাকায়; যেন নতুন জায়গা আবিষ্কার করা। এখানে প্রকৃতি ঘন ঘন রূপ বদলায়। চারদিক সবুজ আর সবুজ। সবুজের মধ্যেই কত রকমভেদ আছে তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। আবার কখনও পাহাড়ের শিখরে শিখরে শুভ্র তুষারে হীরক-দ্যুতি, কখনও বা সূর্যের আলো ওই তুষারে প্রতিফলিত হয়ে পাহাড়ে যেন রঙের ঢেউ খেলে যায়। তা ছাড়া কত রকম গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি আর নাম না জানা অজস্র ফুল; কি তাদের রঙের বাহার! এ সব দু'চোখ ভরে না দেখলে পাহাড়ে বেড়িয়ে লাভ কি!

সুখেন্দু যখন ডাকবাংলোয় পৌঁছালো তখন সূর্য প্রায় ডুবু-ডুবু। পাহাড়ের পেছনে মস্ত এক সিঁদুরে থালা কিছুক্ষণ যেন থমকে গিয়েছিল, তারপর টুক করে ডুবে গেল। পাহাড়ে যখন সন্ধ্যা নামে তার রূপ আবার অন্যরকম। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, চারদিকে নির্জনতার মধ্যে যেন গা শিরশির করা একটা নিস্তব্ধতা। সুখেন্দুর সঙ্গে অবিশ্যি তিন ব্যাটারির টর্চ একটা ছিল।

ডাকবাংলোর চৌকিদারকে ও ট্যুরিস্ট আপিসের অনুমতিপত্র দেখালো এবং এও জানালো যে, ও রাত্রিবাস করবে না, রাত আটটার বাস ধরবে। ঘণ্টা দুই বিশ্রাম

আর রাতের খাওয়াটার জন্যই এই ডাকবাংলোয় আশ্রয় নেওয়া। নইলে সারারাত হয়ত উপোসই থাকতে হবে।

চৌকিদার যেন ভীষণ বিপাকে পড়েছে, মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, এই সময় এখানে কেউ বড় একটা আসে না। তাই বাবুকে খেতে দেবার মতো ভাঁড়ারে তেমন কিছু নেই। সুখেন্দুর সঙ্গে অবিশ্যি কয়েক টুকরো পাঁউরুটি আর খানিকটা মাখন আছে। যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় তাই সঙ্গে কিছু রাখতে হয়।

"কি আছে?" তবুও জিজ্ঞেস করল।

"চাওল, থোড়াসে আলু ঔর দো আন্ডা।"

"তবে আর কিছু নেই বলছ কেন!" সুখেন্দু সোল্লাসে বলে উঠল, "ভাতের সঙ্গে আন্ডার ঝোল দারুণ হবে।"

চৌকিদার মাথা চুলকে বলল, তেল নেই, দোকান ওখান থেকে অনেক দূরে।

সুখেন্দু একটু দমে গেল। তারপর বলল, "কুছ পরোয়া নেহি, চাওল বানাও, উসমে আলু ঔর আন্ডা ছোড় দো, মেরা পাশ বাটার হ্যায়।" মনে মনে ভাবল তোফা হবে। "মির্চ মিলেগা?" ও আবার জিগ্যেস করল, "শুখা নেহি মাংতা, কাচ্চা. . ."

"সমঝা," চৌকিদার বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে হাসলো, বলল, "মেরা ঘরওয়ালীকে পাস জরুর হোগা, বহুৎ ডাঁটতা হ্যায় মুঝে।"

সুখেন্দুও না হেসে পারল না। চৌকিদারের ধারণা ওর বৌ খুব কাঁচালঙ্কা খায় বলে ওকে খুব মুখ করে। চৌকিদারের হাতে ও একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিল।

চৌকিদার গরম জল করে দিয়েছিল, বাথরুমে গিয়ে ও স্নান করল, দূর হল সারাদিনের ধুলো আর ক্লান্তি।

ওকে যেন ঠিক সময় ডেকে দেয় এই বলে নরম বিছানায় ও গা এলিয়ে দিল। ঘুমিয়েই পড়েছিল, বেশ গাঢ় ঘুম। চৌকিদারের ডাকে ঘুম ভাঙল, চোখে মুখে জল দিয়ে ও খেতে বসল। সুগন্ধী আতপ চালের গরম গরম ভাত, একটু ফেনা ফেনা, তার সঙ্গে আলু আর ডিম সেদ্ধ, তায় মাখন আর কাঁচা লঙ্কা, ফার্স্ট ক্লাস ডিনার হল।

খাওয়ার শেষে ও প্রস্তুত হয়ে নিল, চৌকিদারকে বখশিশ দিয়ে ও বেরিয়ে পড়ল। বেরোবার মুখে চৌকিদার একটু যেন ইতস্তত করে দেহাতি ভাষায় বলল, "সাবধানে যাবেন বাবু, আকাশের অবস্থা ভাল নয়, আর দেখেশুনে গাড়িতে চড়বেন।"

সুখেন্দু হেসে ওকে আশ্বস্ত করে হাঁটা দিল।

জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়েছে, কুচি কুচি বরফ পড়ছে মাঝে মাঝে। ও গায়ে একটা ওভারকোট আর মাথায় ফেল্টের টুপি চাপিয়েছিল, নইলে চলা কঠিন হয়ে পড়ত। পাহাড়ে এমন অবস্থায় ও আগেও পড়েছে, নতুন নয়, তাই খুব দুশ্চিন্তা ছিল না।

মোড়ের মাথায় যখন পৌঁছালো তখন আটটা পঁয়ত্রিশ। বাস আসবে ন'টায়। প্রায় পঁচিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তুষার আরও ঘন হয়ে পড়ছে, সামনের কিছু দেখা যায় না। সঙ্গে টর্চ আছে তাই রক্ষে। ওভারকোটের কলারটা ও তুলে দিল।

কেটে গেল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ তুষার ভেদ করে দুটো আলোর রেখা দেখা গেল। বাস আসছে। সুখেন্দু হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পৌনে ন'টা। বাসটা পনরো মিনিট আগেই এসে গেছে, কয়েক মিনিট দেরি হলেই বাসটা ও ধরতে পারত না। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল।

বাসটা কাছে আসতেই ও হাত তুললো। সশব্দে ব্রেক কষে থেমে গেল বাস। সুখেন্দু দরজা খুলে উঠে পড়ল। বাসে কিন্তু লোক বেশি নেই, সীট খালিই পড়ে আছে। ও দরজার ঠিক পাশেই একটা খালি সীটে বসে পড়ল। যাক্ নিশ্চিন্তি। আবার ছেড়ে দিল বাস।

বাসের মধ্যে মৃদু আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় ও দেখল যাত্রীরা সবাই ঘুমোচ্ছে। কেউ সীটে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে, কারো মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের কাছে, কেউ আবার পাশের যাত্রীর কাঁধে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কন্ডাক্টারও তার নির্দিষ্ট আসনে বসে ঢুলছে। গাড়ির ড্রাইভার এক সর্দারজী, মাথায় পাগড়ি। সুখেন্দুর মনে হল স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে সেও যেন ঢুলছে। এই সব অঞ্চলে খুব সাবধানে বাস চালাতে হয়, একটু অসাবধান হলেই কয়েকশো ফুট নিচে গভীর খাদে গিয়ে পড়বে বাস, কেউ বাঁচবে না। সুখেন্দুর বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল, ভাবলো কন্ডাক্টরকে বলবে নাকি ওর

আশঙ্কার কথা।

তখুনি কন্ডাক্টর মুখ তুলে ওর দিকে তাকালো, আর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল সুখেন্দুর। দু'চোখ কোটরে ঢোকা, ফ্যাকাশে মুখ—ঠিক যেন মড়ার মুখ। ও তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল। সহযাত্রীদের দিকেও এবার চোখ ফেরালো। ওর কি চোখের ভুল! ওর স্পষ্ট মনে হল যেন বাসের সবাই ওকেই দেখছিল, ও দৃষ্টি ফেরাতেই আবার ঘুমের ভান করল, যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ফিরে গেল। একটু একটু করে আতঙ্ক গ্রাস করছে ওকে। একটা অপার্থিব পরিবেশ ওকে যেন ঘিরে আছে, বাসের সব কাচের জানালা বন্ধ তবু ভেতরটা যেন হিম ঠাণ্ডা।

জোর করেই ও বাইরের দিকে চোখ ফেরালো। হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, বন্ধ হয়েছে তুষারপাত আর ঝলমল করছে রুপোলি থালার মতো মস্ত এক চাঁদ। রাখীপূর্ণিমা নাকি! সুখেন্দু মনে মনে ভাবল, তারপর আবার ভীষণ চমকে উঠল ও। একি! বাসটা আবার সেই দ্বিমুখী রাস্তার মোড়ে এসেছে, যেখান থেকে ও বাসে উঠেছিল। এটা কি করে সম্ভব! বাসটা কি একই জায়গায় চক্কর দিচ্ছে? ড্রাইভার কি রাস্তা ভুলে গেছে, না নেশা ভাঙ্ করে উলটো-পালটা চালাচ্ছে।

হয়ত চোখের ভুল, নিজেকে এই বলে ও প্রবোধ দিল, নিশ্চয়ই এটা অন্য কোনো মোড়, একই রকম দেখতে, ও বিদেশী বলে বুঝতে পারেনি। কাচের জানালা দিয়ে চাঁদের আলোয় বাইরেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। নানান চিন্তা এসে জট পাকাচ্ছিল ওর মাথায়। তারপর আবার ও চমকালো। না, এবার আর ভুল হয়নি। বাসটা আবার সেই মোড়ের মাথায় এসেছে। ওই ঠাণ্ডাতেও ঘেমে নেয়ে উঠল ও।

ওর গলা থেকে বোধহয় গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বাসের ভেতর জেগে উঠল সবাই। সকলের দৃষ্টি ওর দিকে। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখ, কোটরে ঢোকা দু'চোখে যেন বরফশীতল দৃষ্টি—জীবন্ত মানুষের মুখ নয়। বাসের সবাই, এমনকি শিখ ড্রাইভার পর্যন্ত পেছন ফিরে দেখছে ওকে। দাড়িতে তার মুখ ঢাকা, কিন্তু অবিকল এক চোখ, মরা মানুষের

মত, ঠাণ্ডা স্থির দৃষ্টি।

তারপর সবাই একসঙ্গে দুলতে লাগল। বসে বসেই দুলছে আর খিক খিক করে হাসছে, পৈশাচিক সেই হাসি। শরীরের রক্ত যেন জল হয়ে গেল সুখেন্দুর। এরা কি মানুষ না পিশাচ! বাস কিন্তু থেমে নেই, দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। ড্রাইভার স্টিয়ারিং ছেড়ে পেছন ফিরে ওকেই দেখে যাচ্ছে।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনই হঠাৎ হাসি থেমে গেল, তারপর শুরু হল একটানা মন্ত্র উচ্চারণের মতো সমবেত কণ্ঠে একঘেয়ে সুর। যেন কাউকে বলি বা উৎসর্গ করার আগে মন্ত্রপাঠ হচ্ছে। সুখেন্দুর মেরুদণ্ড বেয়ে যেন বরফগলা জলের স্রোত নেমে এল, কেঁপে উঠল সর্বাঙ্গ। কন্ডাক্টার উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে হাত বাড়ালো, টিকিট কাটবার সময় যেমন হাত বাড়ায় তেমন। কিন্তু হাতটা একটা কঙ্কালের—যেন ওর গলার দিকে এগিয়ে আসছে।

দরজার পাশের সীটেই বসেছিল সুখেন্দু, এক ঝটকায় দরজাটা খুলে ও ঝাঁপ মারল বাইরে। একটুর জন্য গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ল না, একটা বুনো ঝোপই ওকে বাঁচিয়ে দিল, আর বাঁচালো নরম তুষারের বিছানা, অনেকক্ষণ ধরে ঝুর ঝুর করে পড়েছিল। পর মুহূর্তে ও শুনতে পেল বাসটা সশব্দে আছড়ে পড়ল গভীর খাদে। সঙ্গে সঙ্গে ও জ্ঞান হারাল।

ওর যখন জ্ঞান হল, ও একটা হাসপাতালে শুয়ে আছে, মাথায় ব্যান্ডেজ, হাতে পায়েও ব্যান্ডেজ। ও নাকি পথের পাশে একটা খাদের ধারে মড়ার মতো পড়ে ছিল। একদল পাহাড়ি ওই পথে যাচ্ছিল, তারাই একটা খাটিয়ায় ওকে চাপিয়ে কয়েক মাইল দূরে এই হাসপাতালে দিয়ে গেছে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

ডাক্তারদের প্রশ্নের জবাবে ও সমস্ত ঘটনা খুলে বলল, বাসটা যে খাদে পড়ে আছে সেটা জানাতেও ভুলল না। ওর কথা শুনে ডাক্তাররা ভাবলেন বোধহয় মাথায় চোট পেয়ে ও ভুল বকছে। কিন্তু ওই হাসপাতালের একজন পাহাড়ি কর্মী তাঁদের অবাক করে দিয়ে বলল, "বাবুজী মিথ্যে কথা বলেননি। বেশ কয়েক বছর আগে একটা যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওখানে খাদে পড়েছিল। ড্রাইভার, কন্ডাক্টার আর বাসে যে ক'জন যাত্রী ছিল সবাই মারা গিয়েছিল, চুরমার হয়ে গিয়েছিল বাস। ড্রাইভারের দোষেই ওই দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে করেছিল পুলিশ। তারপর থেকে কখনও-সখনও যে তারিখে এবং যে সময়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেই তারিখে এবং সেই সময়ে ওই ভুতুড়ে বাসকে দেখা যায়। স্থানীয় লোক ঘটনা জানে তাই তারা ওই বাসের ধারেকাছেও ঘেঁসে না। বাবুজী জানতেন না বলেই ওই বাসে চড়েছিলেন। নতুন মানুষ বাসের জন্য যখন অপেক্ষা করে তখনই ওটাকে দেখা যায়।"

"কিন্তু আমি যে বাসটা খাদে পড়ার শব্দ শুনলাম," সুখেন্দু বলল।

"তাই পড়ে বাবুজী," লোকটি বলল, "ঠিক যেমনটি পড়েছিল সেই রাতে, কিন্তু দিনের বেলা ওখানে কোনো বাসকে পড়ে থাকতে দেখবেন না।"

"আর অন্য বাসটা?" সুখেন্দু জিগ্যেস করল।

"খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওটা ঠিক সময়েই ওই মোড়ে এসেছিল," লোকটি জবাব দিল, "ভূতুড়ে বাস আগে আর আসলটা পরে—পনরো মিনিটের তফাৎ। খুব বেঁচে গেছেন বাবুজী, আপনার মতো বাইরের লোককেই ওরা বাসে তোলে, বোধহয় ওদের দল ভারি করতে চায়। এই অঞ্চলের সবাই জানে ভূতের বাসের কথা, ডাকবাংলোর চৌকিদারের উচিত ছিল আপনাকে বলা।"

সুখেন্দুর মনে পড়ল ডাকবাংলো থেকে বেরুবার সময় চৌকিদার বলেছিল, "সাবধানে যাবেন বাবু, দেখেশুনে গাড়িতে চড়বেন।" তারপর কি বলতে গিয়ে যেন থেমে গিয়েছিল।

সমস্ত ঘটনা মনে করে দিনের আলোতেও সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। সত্যি, ভগবানই ওকে বাঁচিয়েছেন।

www.arisumu.com

ভূতেরা বেইমান নয়

শক্তিপদ রাজগুরু

বাড়ি থেকে পিসীমার জরুরী তলব এসে পড়বে এইভাবে তা ভাবিনি। পিসীমাই আমাদের সংসারের কর্ত্রী।

পিসীমার বিয়ে হয়েছিল বেশ ভালো ঘরেই। কিন্তু তাঁর বরাতে সে সুখের ঘর সহ্য হয়নি। ছেলেবেলাতেই স্বামী মারা যাবার পর তিনি ফিরে এসে আমাদের সংসারেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। সংসারের সব কাজই নিজে করতেন। ছেলেবেলা থেকে আমরা তাঁকেই সংসারের কর্ত্রী বলে জানি।

বাবা মারা যাবার পর দেখলাম সেই পিসীমাই আমাদের শরিকানা সম্পত্তি থেকে আমার জ্যাঠা-কাকাদের হাত থেকে আমাদের জমিজমার হিস্যা মায় বাগান, পুকুর এর ভাগও ঠিক ঠিক বের করেছিলেন, নইলে বোধহয় গ্রামে থাকতেও পারতাম না। কারণ জমির আয়পয় নিজের বাস্তুভিটা না থাকলে গ্রামে থাকবো কি করে?

পিসীমাই আমাদের সংসার-তরণীর কাণ্ডারী। তাঁর চিঠি এসেছে। বিশেষ দরকার তাই চিঠি পাবার পরই বের হয়েছি।

বৈকালের ট্রেন—ইদানীং ট্রেন লাইন অবরোধও ঘটে যখন তখন কিছু লোকের মর্জিমত। আজও প্রথম থেকেই ট্রেনটা ছাড়ল দেরিতে।

তা প্রায় চল্লিশ মিনিট লেট হলো হাওড়া স্টেশনেই। ভাবলাম, বর্ধমান যেতে যেতে লম্বাদৌড় পড়বে আর তাতে বেশ কিছুটা মেকআপও হয়ে যাবে। কিন্তু ওমা লেট মেকআপ করবে কি—আরও কয়েকটা স্টেশনের বাইরে মাঠের মধ্যে থমকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে চললো—ফলে আরও আধঘণ্টা লেট বরং বেড়েই গেল, কমার কথা দূরে থাকুক।

চৈত্রের শেষ—শীত আর নেই।

গরমই পড়েছে। সন্ধ্যা হয়ে গেল বর্ধমানের আগেই। আরও ঘণ্টাখানেকের পথ দুর্গাপুর। আটটার মধ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছবে।

সব হিসাবই গোলমাল হয়ে গেল।

এইটুকু পথেই কোথায় অবরোধ হয়েছিল সন্ধ্যা অবধি। এখন দয়া করে তারা অবরোধ তুলেছেন কিন্তু এত গাড়ি জ্যাম আছে যে পর পর তাদের ক্লিয়ার করতে কনট্রোলের বাবুরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ফলে আমাদের গাড়ি থামতে থামতে এগোতে থাকে। কখন দুর্গাপুর পৌঁছবে কে জানে।

শেষ বাস ন'টায়—তারপর আর বাসও পাওয়া যাবে কি না তার ঠিক নাই।

এদিকে হঠাৎ এই অন্ধকারেই কালবৈশাখীর ঝড়ও শুরু হয়ে যায়। ধুলো উড়ছে—ট্রেনের জানলা দরজা বন্ধ করে বসে আছি, বেশ কিছুক্ষণ ঝড়ের তাণ্ডবের পর

এবার বৃষ্টি নামল। আর, বৃষ্টি যে বেশ জোরেই পড়ছে তাও বুঝতে পারি।

বিদ্যুৎ চমকায়—ক্ষণিক ওই বিদ্যুতের আলোয় দূরদিগন্ত চকিতের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কি রহস্যময়তা নিয়ে। ট্রেনটা কিছুক্ষণ চলে আবার দাঁড়ায়।

এমনি করে দুর্গাপুরে যখন এসে পৌঁছলো তখন রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। শেষ বাসও ছেড়ে গেছে আর বৃষ্টি তখনও চলেছে, তবে তত জোর নেই। কিন্তু বৃষ্টির সঙ্গে বিজলির ঝলক, মেঘের হাঁকডাক সবই রয়েছে।

কর্মব্যস্ত বাসস্ট্যান্ডও তখন ফাঁকা।

যাত্রীদের ভিড়, কন্ডাকটারদের চীৎকার, কলরব এসব কিছুই নেই। আমার মত দু চারজন নিরাশ্রয় যাত্রী এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে যদি কোন গাড়ি যায় ওদিকে। বাস রাস্তা থেকে নেমে আমার গ্রাম আরও প্রায় তিন কিলোমিটার পথ। তবু গ্রামের পাশ দিয়ে পথ আর চেনা যায় না—ওটা যেভাবে হোক চলে যাবো।

এখন স্টেশন থেকে ওদিকে যাবার বাস-ট্যাক্সি কিছু মেলে কিনা তাই ভাবছি।

হঠাৎ ওদিকে কয়েকজন উৎসাহী যাত্রী একটা ট্যাক্সিওয়ালাকে ধরে কোনমতে রাজী করিয়েছে।

অবশ্য সে নিজের গরজেই বাঁকুড়া শহরে ফিরছে, কিন্তু নিজের গরজ দেখালে বাড়তি ভাড়া পাবে না—তাই যাত্রীদের চাপের মুখেও বলে—এই ঝড়-বাদলে যাবো না বাবু।

যাত্রীরাও ছাড়বে না।

শেষ অবধি ডবল ভাড়ায় যেতে রাজী হয় ট্যাক্সিওয়ালা। অমি অবশ্য মাঝপথে নামবো, তবু আমাকে পুরো ভাড়াই দিতে হল।

বৃষ্টি তখনও চলছে।

পথে গাড়ি বিশেষ নেই। উঁচু নীচু পথ। বিদ্যুতের ঝিলিক দিগন্তের প্লাবনসীমা যেন অচেনা এক জগতের নিশানা আনে, গাড়িটা ছুটে চলেছে।

আমাদের বাসস্টপটা একসময় ছিল একটা গ্রামের বাইরে, যেখান থেকেই বনের শুরু। তখন ছিল বেশ গভীর শালবন। বনের মধ্যে একটা রাস্তা এসে মিশেছে বড় রাস্তায়। ওই মারাম ঢালা রাস্তাটাই বন, পতিত ডাঙ্গার বুক চিরে চলে গেছে আমাদের গ্রামের দিকে, একদিকে মাঠ—কাছিমের পিঠের মত নেমে গেছে, অন্য দিকে শালবনের শুরু।

বাসস্ট্যান্ডটা ছিল বনের মধ্যে। ছায়াসবুজ শান্ত পরিবেশ ঘেরা বাসস্টপটা, এখন সেই বন আর তেমন নেই। লোকে কেটেই সাফ করে। সেখানে গড়ে তুলেছে চায়ের দোকান কেউ বা মাটির বাড়ি তুলে মুদিখানার দোকান, মনোহারী দোকান, সাইকেল-সাইকেল রিক্সার মেরামতি কাজও করে। এটা এখন এদিকে খুব চালু ব্যবসা।

ট্যাক্সিটা এখানে একটু থামে, আমিও নেমেছি। ভেবেছিলাম একটা সাইকেল রিক্সা হয়তো পাবো, নিদেন ওদিকে যাবার কোন সঙ্গীও মিলবে।

কিন্তু ঝড়বৃষ্টির রাত, সাইকেল রিক্সাওয়ালারা আগেই খদ্দের না পেয়ে পালিয়ে গেছে। আর ঝড়-বাদলের রাতে কোন যাত্রীও নেই, কারণ তারা তো চলে গেছে আগেই।

বাসস্ট্যান্ড নিশুতি।

দোকানপত্রের ঝাঁপও বন্ধ। ওদিকে একটা চায়ের দোকানে বাতি জ্বলছে দেখে ওদিকেই চললাম, দেখি দোকানদার চায়ের পালা চুকিয়ে তার নিজের জন্য চায়ের উনুনে ভাতে ভাত চাপিয়েছে।

চায়ের আশাও আর নেই।

তবু শুধোই কোন গাঁয়ে যাবো।

দোকানদার বোধহয় নতুন, ঠিক চেনে না আমাকে। বলে সে—ওই তো পথ।

পথ তো আমিও চিনি, কিন্তু সঙ্গী-সাথী খুঁজছি দেখে বলে—আর ওদিকে যাবার কেউ নাই।

মনে হয় এই বাস-স্ট্যান্ডে থাকার কোন জায়গাও নেই। ওসব দুর্গাপুরেই ফেলে এসেছি, এখন এই পথটুকু যে ভাবে হোক হেঁটেই যেতে হবে।

বৃষ্টির তোড় কমেছে। তবে এখনও বিদ্যুতের ঝিলিক থামেনি। মেঘের বুক চিরে চলেছে বিদ্যুতের ঝলকানি। ওই আলোয় দেখি সেই পথটা।

কি ভেবে একটা শালগাছের ডাল ভেঙ্গে ওইটিকেই হাতিয়ার করে এবার হন হন করে হাঁটা শুরু করলাম বেশ বীরদর্পে। অবশ্য আগে এই বনে বনশুয়োর, ভালুক,

নেকড়ে বাঘ এসব ছিল। এখন বন প্রায় সাফ। ওসব জানোয়ার আর নেই। তবে দেগাঁয়ের ওদিকেই একটা শ্মশান, ওখানে কিছু ইয়া সাইজের কুকুর আছে। দেগাঁ পড়বে বাঁ দিকে—পথটা চলেছে প্রান্তরের বুক চিরে, ওদিকে গদার ডিহির শালবন—ওই বন পার হয়ে বেশ কিছুটা শাল মহুয়ার গাছ ভরা ডাঙ্গা নীচু হয়ে নেমে গেছে, তারই বুক চিরে মোরাম ঢালা পথটা গিয়ে পৌঁছেছে আমাদের গ্রামে।

সব পথটা আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে ছবির মত। হাতে সেই শালগাছের ডাল—চলেছি আমি। বৃষ্টি ভিজে মাটি, গাছগাছালির একটা মিষ্টি সুবাস ওঠে। শালগাছ দুচারটে এখনও আছে। তাতে শালফুল ফুটেছে।

মহুয়াগাছে এসেছে মহুয়া ফুলের কুঁড়ি। দিনে কুঁড়ি শুকিয়ে চোখ বুজে থাকে। রাতে ফোটে আর সেই রাতেই ঝরে পরে। ওদের পরমায়ু, রূপ-যৌবন সব এক রাত্রিকে ঘিরেই।

হঠাৎ কার হাসির শব্দে চাইলাম।

হাসির শব্দই মনে হল। এই গভীর রাতে এইখানে কে হাসবে? দেগাঁয়ের শ্মশান সামনেই।

জায়গার নানা বদনাম আছে। শালের ডালটা শক্ত করে ধরে চাইলাম। দেখি হাসি কোথায়—এ যে ছাগলের ডাক!

আর এই রাতে বনের ধারে ছাগল এল কি করে? শেয়ালের অভাব নেই—এখুনি শেষ করে দেবে। সাহস পাই ছাগল দেখেই, ওটাকে বাঁচাবার জন্যই এবার ওই শাল ডাল দিয়ে ওকে তাড়াতে চেষ্টা করি—হেট—হাট।

ছাগলটা এবার হঠাৎ সামনের দু পা তুলে একেবারে ফাইটিং পোজে দাঁড়ায়, তারপর হঠাৎ দেখি ছাগল নয় সেটা বিশাল একটা কালো এঁড়ে গরুতে পরিণত হয়ে শিং নাড়ছে।

সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

দেখলাম ছাগল—হয়ে গেল ষাঁড় আর তারপর আর কিছুই দেখা গেল না। সব ভ্যানিশ।

শাল ডাল হাত থেকে পড়ে গেছে। ওই দৃশ্য দেখে হতবাক। হঠাৎ দেখি সামনের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে একটা কাপড় জড়ানো মূর্তি—তার চোখ মুখ নাক কিছুই নাই, সব কোটরে ঢুকে গেছে। হাত দুটো শূন্যে তুলে কি যেন বলতে চায়—

আর কে শোনে! তখনও জ্ঞান হারাইনি—

তাই পালাবার ক্ষমতাটা হারাইনি। দৌড়বার মত সাধ্য নেই। তবু বেগ জোরেই হাঁটার চেষ্টা করছি আর আমাকে পালাতে দেখে মূর্তিটা ডাল থেকে দুটো পা যেন তরতর করে বাড়িয়ে মাটিতে সেট করে আমার দিকে চাইল। বলে সে—পালাবি! সঙ্গের সন্দেশের বাক্সটা দিয়ে যা।

পিসীমার জন্য আসার সময় কলকাতার কোন দোকান থেকে এক বাক্স সন্দেশ কিনেছিলাম। ও ব্যাটা সেই খবর জানল কি করে? ভূতই নির্ঘাৎ!

বুক কাঁপছে—পালাবার চেষ্টা করছি।

দেখি এদিক থেকে একটা লম্বা নাক শাকচুন্নীও ঠেলে উঠেছে—ওদিকে সেই ঢ্যাঙ্গা ভূত—এদিকে শাকচুন্নী—ওপাশে একটা কানকাটা ভূত।

দেগাঁয়ের শ্মশানে যে এত রকমারি ভূত ছিল জানতাম না। এবার দফা শেষই হবে। রামনামও মুখ দিয়ে আসছে না। গলা টিপে শেষই করবে এবার। কলকল করে ঘামছি।

হঠাৎ করে বাজখাঁই গলার শব্দ শুনে চাইলাম।

ভাবতেই পারিনি যে ওই রাতের অন্ধকারে আমাদের গাঁয়ের বিশু পাগলাকে এখানে দেখবো।

বিশুপাগলা যত্রতত্র ঘোরে আর গাঁজার পয়সা পেলেই বিশু খুশী। এই উপকার সে ভোলে না। অবশ্য আবার গাঁজার পয়সা তাকে দিতেই হবে।

দেব তাও সই।

তবু এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এই শ্মশানের পাশে বিশুকে পাবো ভাবিনি।

আমিই হেঁকে উঠি—বিশুদা!

বিশুপাগলা মাথায় গামছার পাগড়ি, হাতে একটা পুটুলি মত, আমাকে দেখে এগিয়ে আসে।

—আরে দাদাবাবু যে! এখানে! এসময়ে! এ্যাঁ জানাই ব্যাপারটা।

বিশু ততক্ষণে সেই শাকচুন্নী-ভূত-পেত্নীদের দিকে হাতের আধপোড়া কাঠটা তুলে গর্জে ওঠে।

—ভাগ। যত্তোসব ঘাটের মড়া। বড্ড লোভ তোদের। যা বলছি, না হলে—

ওর বাজখাঁই গলার তর্জন গর্জনে দেখি সব বিচিত্র মূর্তিগুলোও হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

আবার চারিদিক সুনসান হয়ে ওঠে।

বিশুপাগলা বলে—সব ইতর, ছোটলোকের ভিড় এখন। ভদ্দরদের জায়গা এ নয়।

আমাকে শুধোয়—বাড়ি যাবে তো?

ঘাড় নাড়ি। কথা বলার শক্তি তখনও আসেনি। বিশু-পাগলা বলে—চলো।

দুজনে চলছি। ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হাওয়ায় আবার কিছুটা সুস্থ বোধ করি। বিশুপাগলা আগে আগে চলেছে, আজ ও এসে না পড়লে কি সর্বনাশ হতো কে জানে।

কতক্ষণ চলেছিলাম জানি না।

এবার চাঁদও উঠেছে। খেয়াল হয়, গ্রামের মুখে এসে গেছি, ওদিকে আমাদের বাড়িটাও দেখা যায়।

বিশুপাগলা বলে, বাড়ি যাও—আমি যাচ্ছি।

অভ্যাসমত পকেটে হাত দিয়ে পাঁচ টাকা তুলে বলি—বিশুদা, তোমার গাঁজার জন্য—

বিশু অন্যসময় হলে ছোঁ মেরে টাকাটা নিত—খুশী হয়ে আশীর্বাদও করত। আজ টাকাটা নিল না—শুধু একটু হেসে হন হন করে ওদের পাড়ার বাঁশবনের পাশের পথ দিয়ে চলে গেল।

পিসীমা আমার হাঁকডাকে উঠেই অবাক।

মা—সরকার মশাইও উঠেছেন। কথায় কথায় জানাই আজকের ট্রেন লেট—এইভাবে বাসস্টপ থেকে হেঁটে আসার কথা।

বলি—বিশুদাই গাঁ অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল। বিশু-পাগলা গো—

এ্যাঁ! চমকে ওঠে পিসীমা। বলে—সে কিরে! বিশে তো দিন সাতেক আগেই মারা গেছে। সে এল কোত্থেকে? দুগ্গা-দুগ্গা!

আমিও অবাক। তবু বার বার মনে পড়ে সেইই আজ আমাকে বাঁচিয়েছে—বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে গেছে। আর বেঁচে নেই—তাই গাঁজারও দরকার তার নেই।

তবে সব ভূত বেইমান নয় তাই মনে হয় বিশুপাগলাকে দেখে। অকৃতজ্ঞও নয়।

www.arisumu.com

সাদা ভূত কালো ভূত

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কালো ভূতের বাচ্চাদের মনে বড় দুঃখ, সাদা ভূতের বাচ্চারা তাদের সঙ্গে খেলে না। ওরা ভাবে, আরে বাবা, সবাই তো ভূত। না হয় তোদের গায়ের রং একটু সাদা, তাই বলে একসঙ্গে একটু খেলাটেলা করলে এমন কী ক্ষতি?

তবে কালো ভূতের বাচ্চারা এসব কথা শুধুই ভাবে আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। কিন্তু সাদা ভূতের বাচ্চাদের এসব কথা কখনো বলে না। বলার সাহসই নেই। বাড়ি ফেরার পথে কখনো-সখনো সাদা ভূতের বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা হলে কালো ভূতের বাচ্চারা হাসবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওরা দাঁত কিড়মিড় করে পাশ ফিরে চলে যায়। কথাবার্তা তো দূরের কথা। কিন্তু সেবার একেবারে ছোট কালো ভূতটা সাদা ভূতের বাচ্চাদের ডেকে ফেলেছিল ভুল করে। বলেছিল, 'সাদা ভূতের বাচ্চারা। জঙ্গলের গাব গাছে অনেক গাব হয়েছে। খুব পাকা গাব। পাড়তে যাব। খুব মজা করে খাওয়া যাবে।'

কী এমন খারাপ কথা! তবু কালো ভূতের কথা শুনে কী গুমোর সাদা ভূতের বাচ্চাদের। মুখ ভেংচে বলেছিল সবচেয়ে বড় সাদা ভূতের বাচ্চাটা, 'হুঃ, গাব খাব আমরা? বলে কি! যত সব হা-ভাতে কেলো ভূত। যা যা, গাব খা গিয়ে তোরা।' বলতে বলতে রেগেমেগে হনহন করে বাঁশবন পেরিয়ে গিয়েছিল সাদা ভূতের বাচ্চারা। সাদা ভূতদের মেজাজ দেখে কালো ভূতের বাচ্চারা ভয়ে সিঁটকে গিয়েছিল। সাদা ভূতেরা এদের ওপর আবার হামলা না চালায়। অবশ্য হামলা চালালেই যে সাদা ভূতেরা জিততে পারবে, তা মনে হয় না। কারণ কালো ভূতেরা তো সংখ্যায় অনেক বেশি। তবু কালো ভূতেরা সাদা ভূতদের ভয় পায়। কিন্তু কেন পায়, তা জানে না। হয়তো ঠাকুমা-দিদিমারা বাচ্চা কালো ভূতদের প্রথম থেকেই শেখায়, সাদা ভূতের পাড়ায় যেও না, বিপদে পড়ে যাবে। সাদা ভূত দেখলেই সেলাম করবে। এমনি আরো কত কি।

আজকাল অবশ্য কালো ছোকরা ভূতরা সাদা ভূতদের সেলাম ঠোকে না। বলে, 'ওরাও ভূত আমরাও ভূত। তবে আবার সেলাম ঠুকব কেন?' এই নিয়ে বুড়ো কালো ভূতদের সঙ্গে মনকষাকষি। বুড়ো কালো ভূতেরা আজও কোনো সাদা ভূতকে রাস্তায় দেখলে, সে বয়সে যতই ছোট হোক না কেন, তাকে রাস্তা ছেড়ে দেবে, সেলাম ঠুকবে। তবে ছোকরা কালো ভূতেরা সেলাম না ঠুকলেও মনে মনে এখনো ভয় পায় সাদা ভূতদের।

তাই সেদিন গাব খাওয়ার কথা বলার পর বাচ্চা ভূতেরা বাড়ি ফিরে ভয়ে ভয়ে বলেছিল, 'এবার আমাদের কী হবে?'

অনেক ভেবেচিন্তে নাকে নস্যি গুঁজে বুড়ো ভূতেরা

সমাধান বার করল। সামনের এক সপ্তাহ এই বাঁশবনের আস্তানা ছেড়ে বাচ্চাদের কোথাও বেরনো চলবে না। তাছাড়া এরই মধ্যে একদিন কালো ভূতদের এক দূত সাদা ভূতদের পাড়ায় গিয়ে দোষ কবুল করে ভেট দিয়ে আসবে।

সাদা ভূতের পাড়া খুব একটা দূরে নয়। ওদের আস্তানা বাঁশবন ছাড়িয়ে আধ কিলোমিটার দূরে সাহেবদের পুরনো পোড়ো কুঠিতে। সেই পোড়ো ভাঙা কুঠির ভেতরে থাকে সাদা ভূতের দল। মানুষদের পাড়া থেকে জোগাড় করে আনা উচ্ছিষ্ট টোস্ট মাখন জেলি খায়। কালো ভূতের মতো জংলি গাব খেতে ভারি বয়েই গেছে ওদের।

দিনকয়েক পরে ভোরের দিকে বেশ কিছু ভেট নিয়ে সাদা ভূতের পাড়ার দিকে রওনা দিল সবচেয়ে জোয়ান কালো ভূত। কিন্তু বাঁশবন পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়ায় জোয়ান কালো ভূত। আরে! সাদা ভূতেরা নিজেদের পোড়ো কুঠি ছেড়ে এদিকেই ছুটে আসছে যেন! একটু ঘাবড়ে গেল জোয়ান কালো ভূত। তবে কি দলবল নিয়ে ওদের বাঁশবন আক্রমণ করতে আসছে সাদা ভূতেরা? সঙ্গে সঙ্গে জোয়ান কালো ভূত ছুট লাগাল বাঁশবনের দিকে। তাড়াতাড়ি সবাইকে সাবধান করতে হবে তো!

বাঁশবনে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ঐ যে, সাদা ভূতের দল এদিকেই আসছে।'

জোয়ান ভূতের কথা শুনে সবাই চিন্তিত, তাই তো কী হবে এখন! কী করে সাদা ভূতের হামলার মোকাবিলা করা যায়, এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করছে, এমন সময় বাঁশবনের মধ্যে দুদ্দাড় করে ঢুকে পড়ল সাদা ভূতের দল। বাচ্চা, বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ সবাই।

কালো ভূতেরা তো হতভম্ব। ব্যাপারখানা কী? কারো হাতে তো লাঠিসোঁটা নেই। বরং কোনো রকমে কিছু বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে সবাই হাজির। সাদা ভূতদের দলপতি বলল, 'আর বলো না ভাই। গতকাল বিকেল থেকেই একদল মানুষ শাবল, গাঁইতি, যন্ত্রপাতি নিয়ে সাহেবদের কুঠি ঘিরে ফেলল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করল, পোড়ো কুঠিগুলি ভেঙে ফেলে নাকি তৈরি করবে বিরাট দশতলা বাড়ি। আর ভোর হওয়া মাত্র শাবল গাঁইতি চালাতে শুরু করল সাহেব কুঠির ওপর। কাল রাত থেকে বাচ্চাগুলোর কিছু খাওয়া-দাওয়া হয়নি। তাই—'

কালো ভূতদের দলপতি জড়িয়ে ধরল সাদা ভূতের দলপতিকে, 'খুব ভালো করেছ ভাই। ভূতের বিপদে ভূত না দেখলে কে দেখবে বলো।'

সেই ছোট্ট কালো ভূতের বাচ্চাটা সকলের হাতে একটা করে জংলি গাব দিতে লাগল।

www.arisumu.com

www.arisumu.com

মধ্যরাতের আতঙ্ক

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আমার নাম সন্দীপ মুখার্জী। পনরো বছর পরে আবার আমি গ্রামে যাচ্ছি। পনরো বছর আগে আমেরিকায় পড়াশোনা করতে গিয়েছিলাম। আমি আমার গ্রামের কলেজ থেকেই ফিজিক্স নিয়ে বি-এস-সি পাস করি। ফার্স্টক্লাস পেয়েছিলাম। কিন্তু নম্বর ছিল নিচের দিকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলাম না।

অন্য ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেতাম। যাদবপুর তো আমায় বেশ খাতির করেই নিতে চেয়েছিল। কিন্তু মনটা খুব ভেঙে গিয়েছিল। ঠিক করেছিলাম যদি পড়তেই হয়, কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আর পড়ব না। আমেরিকায় চলে যাবো, নিদেন পক্ষে অস্ট্রেলিয়ায়।

আমি একটি স্কুলে চাকরি পেয়ে গেলাম। অবশ্য স্কুলটি বোর্ডের অনুমোদিত নয়। তাহলে আমি কিছুতেই চাকরি পেতাম না। কারণ আমি রাজনীতি করি না। আমি পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি চিরকাল। তাছাড়া, আমার বাবা নেই। দাদার আশ্রয়ে আছি। নিজের পড়ার খরচটা চালানোর জন্য টিউশানি করতে হত। এর মধ্যে রাজনীতি করার সময়ই বা কখন?

আমি স্কুলের চাকরিটা নিলাম বটে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে জি-আর-ই দিয়ে আমেরিকা যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগলাম।

মা আমাকে বলতেন, তুই ঠিক পাস করে যাবি। আমার কোল খালি করে চলে যাবি। আর তোর সঙ্গে দেখা হবে না। তবে তুই যেখানেই থাকিস না কেন, তোকে আমি আশীর্বাদ করছি তোর ভাল হবে। তুই কত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছিস। তোর বাবা যখন মারা যায় তুই তখন ক্লাস সেভেনে পড়িস। তোর দাদা সবে বি-এ পাস করেছে। তারপর কত কষ্ট করে তোকে পড়তে হয়েছে। পরীক্ষার ফি দিতে পারেনি বলে তোকে হেডমাস্টার পরীক্ষার হল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে, কি আমি ভুলব?

আমি বলি, মা, কোথায় আমেরিকা আর কোথায় আমাদের গ্রাম—এখনও পরীক্ষাই দিলাম না। জি-আর-ই খুব শক্ত পরীক্ষা মা। কত ছেলে বার বার দিয়ে পায় না।

সবাই তো তোর মত ফার্স্টক্লাস পায় না।

মায়ের, ধারণা আমি ভারতের সবচেয়ে মেধাবী ছেলে। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি হতে পারলাম না। এই ফার্স্টক্লাস দিয়ে আমি কি ধুয়ে খাবো? মাকে সেকথা বোঝাই কী করে?

আমি আমেরিকার চার-পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি লিখলাম। এর মধ্যে গোটা তিনেক বিশ্ববিদ্যালয় ফর্ম পাঠালো, আর বলল জি-আর-ই স্কোর দিয়ে ফর্ম পাঠালে তাঁরা আমার আবেদন বিচার করে দেখবেন।

ইতিমধ্যে গ্রামে কীভাবে রটে গেল আমি আমেরিকা

চলে যাচ্ছি।

আমার স্কুলের ভূগোলের মাস্টারমশাই রবীনবাবু বললেন, সন্দীপ, তুমি নাকি আমেরিকায় পড়তে যাচ্ছ? কনগ্র্যাচুলেশনস্।

আমি বললাম, চেষ্টা করছি স্যার, এখনও কিছুই ঠিক হয়নি। সবে জি-আর-ই দিয়েছি।

তুমি পাস করে যাবে। খুব ভাল খবর সন্দীপ। কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়বে ঠিক করেছ?

তিন জায়গায় অ্যাপ্লাই করবো। আমার ইচ্ছা চিকাগো।

চিকাগো নয়—শিকাগো। লেক মিচিগানের ধারে সুন্দর শহর। স্বামীজীর নামের সঙ্গে নাম জড়িয়ে আছে। যাওয়ার আগে দেখা কোর।

নিশ্চয়ই স্যার।

সবচেয়ে অভিমান করল সুতপা। ভট্টাচার্য্যি পাড়ায় ওদের বাড়ি। আমার বন্ধু অশোকের বোন। আমার প্রাণের বন্ধু বলতে অশোক। ওদের বাড়িতেই রাতদিন ওঠা বসা। সুতপা এবার থার্ড ইয়ারে উঠেছে। সংস্কৃত অনার্সে ভর্তি হয়েছে। ওকে ছোটবেলা থেকে দেখছি। আমার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটা বিশ্রীভাবে রটে গেল কীভাবে জানি না। সম্ভবত বৌদিই রটিয়ে দিয়ে থাকবে। গ্রামের মধ্যে কারও কোনও কথা গোপন থাকে না।

আমি কিন্তু অশোককেও বলিনি। সুতপাকেও নয়। যদিও সুতপাকে আমি মনের সব কথা বলতাম। সুতপা কি আমার বন্ধু? না, সেই অর্থে নয়। তার সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তা হত নানা ফাঁক-ফোকরে, কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নয়। আমরা দুজনে দুজনকে পছন্দ করতাম। দুজনের প্রতি একটি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ ছিল।

অবশেষে জি-আর-ই-তে পাস করলাম। মোটামুটি ভালই স্কোর বলা যায়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় জানাল আগামী সেসনেই আমাকে ভর্তি করা যেতে পারে। আমি যেন চলে আসি। আমার জন্য তারা একটি অ্যাসিস্ট্যান্টশিপেরও ব্যবস্থা করবে।

তবে ৩১ আগস্টের মধ্যে চলে যেতে হবে। এটি মে মাস। হাতে আর মাত্র কয়েক মাস। কিন্তু প্লেন ভাড়া ও আনুষঙ্গিক ফরেন এক্সচেঞ্জ মিলে আমার প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার মত দরকার। দাদার কাছে বললাম। দাদা বললেন, সবই তো বুঝলাম। তুই আমেরিকা যাবি শুনে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু হাজার তিন-চারের বেশি আমি দিতে পারব না। তুই বরং ব্যাঙ্ক লোনের চেষ্টা কর। আমি গ্যারেন্টার থাকব।

কিন্তু ব্যাঙ্ক লোন পাবার নানা ঝামেলা।

কার কাছে আর মনের দুঃখ খুলে বলব। বুঝলাম, যাওয়া ভাগ্যে নেই। অশোককে সব কথা বললাম।

অশোক বলল, তুই কিন্তু আমাকে একদিনও বলিসনি তুই যাচ্ছিস।

আমি চান্স পাবো কিনা জানতাম না। কোন ভরসায় বলি।

কিন্তু গ্রামসুদ্ধ লোক জানে।

সেটা গুজব হিসেবে জানে। সত্যি ঘটনাটা তোকেই জানালাম।

সুতপার সঙ্গে দেখা হল। আজ বেশ গম্ভীর। আমি বললাম, তুমি খুশী হয়েছ তো?

তুমি আগে বললে আরও খুশী হতাম।

এই তো বললাম।

এই তো খুশী হলাম। এই বলে হেসে উঠল সুতপা। কিন্তু বেশিক্ষণ হাসতে পারল না। দেখি তার চোখে জল। বললাম, তোমার খুব কষ্ট হবে আমার জন্যে।

আমার বয়ে গেছে।

আমি তো চার বছর পরেই আসছি।

অমন সবাই বলে।

সবাই সন্দীপ মুখার্জি নয়। আমি আসব, তোমার জন্যই আসব।

এই কথা শোনার পর সুতপা আর সেখানে দাঁড়াল না। ছুটে চলে গেল। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। শাঁখ বাজার শব্দ ভেসে আসছে। ঝিঁঝিঁ পোকারা ডাকতে শুরু করেছে। আকাশে পশ্চিম কোণ থেকে সোনালি রেখাটুকু মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে কালো ড্রপসিন টেনে দিল কে যেন। আমি একথা কেন বলেছিলাম আজও জানি না। আমার তেইশ বছর বয়স। হঠাৎ সেই মুহূর্তে যেন মনে হয়েছিল বিরাট একটা কিছু আমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। অথবা আমি ডুবে যাচ্ছি, কাউকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে ইচ্ছা করছে

সেই মুহূর্তে।

টাকা যোগাড় করার জন্য আমি মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম। ভাবলাম, কলকাতা গিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের ধরব। শুনেছি, তাঁদের কিছু না কিছু এমন ফাণ্ড থাকে। জীবনে যা কখনও করিনি তাই করলাম। স্থানীয় এম এল এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে গ্যাস দিয়ে তাঁর কাছ থেকে একটি ভাল সুপারিশপত্র লিখিয়ে নিলাম। রোজ ভোরের ট্রেনে বেরিয়ে যেতাম, ফিরতাম শেষ ট্রেনে। একদিন অশোক বলল, বাবা তোকে একটু দেখা করতে বলেছেন। অশোকদের বাড়ির অবস্থা ভাল। তার বাবা রতনজ্যেঠু জমিদারের নায়েব ছিলেন। নিজেও এখন কিছু ছোটখাটো ব্যবসা করেন। সম্প্রতি পুকুর ও জলাশয় লিজ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেছেন। মৎস্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর খুবই খাতির।

রতনজ্যেঠুর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি আমায় বেশ খাতির করে বসালেন। আমি প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, তুমি আমাদের গ্রামের গর্ব। এই গ্রাম থেকে এর আগে অনেকে ইমিগ্রেশন নিয়ে বিদেশে গিয়েছে। কিন্তু তুমিই সর্বপ্রথম স্কলারশিপ নিয়ে যাচ্ছ।

আমি কোনও জবাব দিলাম না।

তারপর বললেন, অশোকের কাছে শুনলাম তোমার নাকি টাকার যোগাড় হয়নি।

হ্যাঁ। লোন স্কলারশিপের জন্য চেষ্টা করছি।

কত টাকা তোমার দরকার?

অন্তত ত্রিশ হাজার। এখনই টিকিট না কাটলে শুনছি সিজন টাইমে বুকিং পাওয়া যায় না। এয়ার ইণ্ডিয়াতে গিয়েছিলাম, তারা তো তাই বলল।

তুমি তো বছরখানেক চাকরি করলে।

হ্যাঁ, আমেরিকায় চিঠিপত্র, জি-আর-ই ফিজ, বইপত্র কেনা, প্রচুর খরচ। তাতেই আমার সামান্য সঞ্চয় বেরিয়ে গেল। প্রাইভেট স্কুল, দেড় হাজার টাকা মাইনে দিত।

তোমাকে একটা কথা বলি সন্দীপ, কথাটা অন্যভাবে নিও না। কুড়ি হাজার টাকা যদি তোমাকে আমি লোন দিই—

আপনি দেবেন?

হ্যাঁ। তুমি শোধ করে দিও। আমার অবস্থা লোকে যেমন বলে তেমন নয়। যে ব্যবসা করি, তা ব্যাঙ্কের টাকায়। তবু সুতপার বিয়ের জন্য কিছু টাকা আমি আলাদা করে রেখেছিলাম। তা থেকেই তোমাকে দেবো।

সুতপার বিয়ে দেবেন না? আমি ফস করে বলে ফেললাম।

রতনজ্যেঠু বললেন, বিয়ে বললেই তো হয় না বাবা। তাছাড়া ওর পড়াশোনার খুব ইচ্ছে। হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট-ডিভিশনে পাস করেছে। ওর কিন্তু ইকনমিক্সে, হিস্ট্রিতে ভাল নম্বর ছিল। কিন্তু গোঁ ধরল সংস্কৃত পড়বে। আমি বাধা দিইনি। চাকরি-বাকরির যা অবস্থা, পড়াশোনার জন্যই পড়াশোনা। তুমি ফিজিক্সে ফার্স্টক্লাস পেয়েও চাকরি পেলে না। সবারই একদর। একটা ডিগ্রি নিয়ে কথা। ওর এম-এ পড়া শেষ হতে হতেই তুমি ফিরে আসবে। সুতরাং টাকা আমার মার যাবে না।

আমি যেন সেই মুহূর্তে হাতে আকাশের চাঁদ পেলাম। ঈশ্বর যে আমার উপর এত সদয় হবেন তা বুঝিনি। এত সহজে সব কিছুর সমাধান হয়ে যাবে তা ভাবিনি।

সেই মুহূর্তে আমি ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলাম। আমি বললাম, জ্যেঠু! সুতপার বিয়ে নিয়ে আপনি ভাববেন না। ওটি আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন। রতনজ্যেঠু একটু অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। যেন কিছু বোঝার চেষ্টা করছেন, পারছেন না। তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরে আমাকে বললেন, নিজের মেয়ে বলে বলছি না বাবা। ছেলেমেয়ে দুজনেই আমার অন্যরকম। অশোক অবশ্য লেখাপড়ায় এত ভাল নয়। ওকে ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজকালকার ব্যবসা, প্রতি পদে ঘুষ না খাওয়ালে চলে না। ব্যাঙ্ক থেকেও কিছু বন্দোবস্ত না থাকলে আর টাকা বার করা কঠিন হয়ে পড়ছে। সৎ অফিসার হাতে গোনা যায়। সব পার্টির ফাণ্ডে চাঁদা, মস্তানদের মাসোহারা, পুলিশের নিত্য প্রণামী, সবাইকে সন্তুষ্ট করে এই কমপিটিশানের বাজারে অশোকের মত সরল ছেলে কীভাবে টিকবে জানি না। তবু সে তো ব্যবসায়ে এসেছে। কিন্তু সুতপা ওর মধ্যে নেই। সে পড়াশোনা, সাহিত্য, শিল্প এই জগতেই বাস করছে। শুনলাম, এর মধ্যেই সে নাকি কলেজ

ম্যাগাজিনের এডিটর হয়েছে। ওর যা পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার, ওর বর খোঁজাও মুশকিল হবে আমাদের। ওর মাকে তো জানো। একেবারে গ্রামের ঘোমটা দেওয়া বউ থেকে গেল এতখানি বয়সেও।

আমি বললাম, সুতপাকে ওর মতই চলতে দিন। আমার তো ওকে ভালই লাগে। বেশ মার্জিত, রুচিবান।

কিন্তু বাবা হয়ে একটা উদ্বেগ তো থেকেই যায়। আমার তো বয়স হয়েছে। চাকরি করলে কবে রিটায়ার করে বুড়িয়ে যেতাম। নেহাৎ ব্যবসার মধ্যে আছি বলেই—।

হঠাৎ কি মনে করে আমি বললাম। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, সুতপাকে আমার হাতেই তুলে দিতে পারেন। আমি তো ফিরে আসছি পি-এইচ-ডি করেই। তারপর এই ক্যালকাটা ইউনি-ভার্সিটিতেই আমি পড়াব। ওদের দেখিয়ে দেব, যারা আমায় ভর্তি করেনি, তারাই আমায় পায়ে ধরে ডেকে আনবে একদিন। আমি যা শিখব তা আমার দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে উজাড় করে ঢেলে দেব। আমি বড়লোক হতে চাই না। স্বচ্ছলভাবে দিন কেটে গেলেই হল। সে সময় সুত- - মত কেউ যদি আমার পাশে এসে দাঁড়ায়।—

রতনজ্যেঠু আর থাকতে পারলেন না। উঠে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, সুতপার কি সেই সৌভাগ্য হবে বাবা। যদি হয়, তাহলে বুঝব ওর পড়াশোনা সার্থক। আমরা সবাই তোমার পথ চেয়ে থাকব।

কথাটা ঝোঁকের মাথায় বলে আমি নিজেকে নিজে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। সুতপা খারাপ কিসে? দেখতে শুনতে মন্দ নয়, চালাক চতুর। ছোটবেলা থেকে ওকে জানি; এই রকম ঘরোয়া মেয়েকেই তো আমার জীবনসঙ্গিনী করা উচিত।

সেদিনের ঘটনার পর থেকে সুতপার সঙ্গে আমার মেলামেশা সহজ হয়ে গেল। ওদের বাড়িতে আমার খাতিরও বেড়ে গেল। রতনজ্যেঠু নিশ্চয়ই ছেলেমেয়েদের জানিয়েছেন আমাদের আলোচনা। সুতপা যে খুশী তার মুখ দেখে বুঝতে পারি। আগে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় সে যেমন শঙ্কিত ছিল, এখন সে অকুতোভয়। অনেক বেশি ফ্রি। শুধু তাই নয়, আমেরিকা যাওয়ার দিন পনরো আগে কেনাকাটা করার জন্য কলকাতায় যাবার দরকার ছিল। কথা ছিল অশোক সুতপা ও আমি তিনজনে যাবো। ওইদিন অশোক আমাদের রেস্টুরেন্টে খাওয়াবে। আমি কখনও কলকাতার কোনও বড় রেস্তোরাঁয় খাইনি। কিন্তু যাবার দিন অশোকের ব্যবসার কাজ পড়ে গেল। আমি ও সুতপাই গেলাম।

যাবার সময় আমি আমার আঙুলের একটি সোনার আংটি খুলে সুতপাকে পরিয়ে দিলাম। পোখরাজের আংটি। পৈতের সময় পেয়েছিলাম। একজন জ্যোতিষী বলেছিল, আসল সাদা পোখরাজ। এটি ধারণ করে থাকুন, আপনার বাধাবিঘ্ন কেটে যাবে।

আংটিটি পরে ছিলাম ততদিন।

সুতপা বললে, শকুন্তলাকেও এমন আংটি দিয়েছিল দুষ্মন্ত।

আমি বললাম, ভাগ্যিস দিয়েছিল। শোন সুতপা, ধরে নাও আজ আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। সাক্ষী থাকল আকাশভরা সাদা তুলোর মত মেঘেরা, গাছের এই পাখিরা। আর এই সবুজ ঘাস, নরম গালচের মত সবুজ ঘাস।

তার পনরো দিনের মধ্যে উড়ে চলে এলাম শিকাগোতে। অবশ্য শহরটি তত রোম্যান্টিক নয়, বিশাল বিশাল বাড়ির মাঝে কলকাতার মত সরু সরু রাস্তা। রাস্তা অন্ধকার হয়ে থাকে দিনের বেলাতেই। রাস্তার মাঝখানে সেতু বানিয়ে পাতাল ট্রেন পাতাল ফুঁড়ে সেতুর উপর উঠে মাথার ওপর দিয়ে চলেছে। তবে লেক মিচিগানের ধারে চওড়া রাস্তাটি খুবই সুন্দর। শহরে ওয়াই.এম.সি.এ-তে উঠেছিলাম। দিন চারেক কাটিয়ে আরও ভেতরে ইউনিভার্সিটি টাউন হস্টেলে ডর্ম পেয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয় তো নয়, যেন মহাসম্মেলন। দেশ বিদেশের ছেলেমেয়েরা আসছে। ভোর ছটা থেকে ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরু হচ্ছে। চলছে রাত নটা পর্যন্ত। সারারাত ধরে লাইব্রেরি খোলা। কোথাও সিনেমা দেখানো হচ্ছে। কোথাও নাটক হচ্ছে।

ক্যান্টিন গম গম করছে হাজার খানেক ছেলেমেয়ের ভিড়ে। বুক স্টোর মানে এলাহি বই-এর দোকান। লাঞ্চের

সমস্ত রোদ্দুরে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে বসে আছে। কে কাকে জড়িয়ে ধরে আছে তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। কোথাও অর্কেস্ট্রা বাজাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। কোথাও গীটার নিয়ে কেউ গাইছে ভক্তিবাদী সঙ্গীত। কেউ বক্তৃতায় মুণ্ডপাত করছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের। ধনতন্ত্রের পতন যে আসন্ন এবং চীন মুক্তি আনবে শোষিত মানুষের দুনিয়ায়, এ নিয়ে চলছে ঝাঁঝালো বক্তৃতা।

কেউ বসে নেই, নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই, হতাশায় ভুগে ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিচ্ছে না কেউ। একটা প্রচণ্ড জীবনস্রোতের মধ্যে আমি দুদিনেই তলিয়ে গেলাম। বুঁদ হয়ে গেলাম যৌবনের নেশায়।

কিছুদিনের মধ্যেই অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তাঁরা বললেন, মুখার্জী, তোমার ওপর আমরা খুব ভরসা করছি। তোমাকে আমরা বিশ্বের সেরা পরমাণু বিজ্ঞানীদের একজন করে তুলব। তুমি পরিশ্রম করো। কঠোর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই।

সুতপার দীর্ঘ চিঠি পেতাম। অশোক লিখত। মা লিখত মাঝে মাঝে। আমি প্রথম প্রথম সুতপাকে বড় করে চিঠি দিতাম। রাত বারোটা একটায় সব নিঝুম হয়ে গেলে আমি চিঠি লিখতাম।

তাতে লিখতাম, আমেরিকায় না এলে আমার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যেত। আমার দুনিয়াকে জানা হত না।

সুতপা শুধু লিখত, আমি আমেরিকাকে জানি না। আমি শুধু তোমাকে জানি। তুমি কবে ফিরে আসবে?

কিন্তু যত দিন যেতে লাগল আমার চিঠির দৈর্ঘ্য কমতে শুরু করল। আগে প্রতি সপ্তাহে লিখতাম। তারপর প্রতি মাসে। তারপর তিন মাস অন্তর। কৈফিয়ৎ থাকত প্রতি চিঠিতে, পড়াশোনার চাপ।

পড়াশোনার চাপ ছিলই। কিন্তু আমার ভেতরের তাগিদও কমে আসছিল।

সত্যিকথা বলতে কি, আমেরিকার এই বিরাট ঐশ্বর্য একটা বিরাট অজগরের মত ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করছিল। আমি আমার গ্রামের জীবনকে ভুলতে চাইলাম। আমার খোলস থেকে ধীরে ধীরে একটি নতুন মানুষের জন্ম হল। জেনিফার নামে একটি আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করলাম।

জেনিফারের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর সুতপাকে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিলাম। আমার টেবিলে ইণ্ডিয়া থেকে প্রচুর চিঠি এসে জমত। আমি খুলতামই না। একমাত্র মায়ের চিঠি ছাড়া। মা লিখত, কবে আসছিস? তোর আশায় পথ চেয়ে বসে আছি। পি এইচ ডি পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চাকরির অফার এল বিভিন্ন জায়গা থেকে। জেনিফারকে বলেছিলাম একবার দেশে যাব। মাকে শেষ বারের মত দেখে আসব। সে সময় গিয়ে রতনজ্যেঠার টাকাটা ফেরৎ দিয়ে জানিয়ে দেব আমি বিবাহিত। তাঁরা যেন আর আমার প্রত্যাশায় বসে না থাকেন।

কিন্তু তার আর দরকার হল না।

দাদার চিঠি এল, মা মারা গেছে।

দুই

মা মারা গিয়ে আমার ভারতে যাবার শেষ আকর্ষণও চলে গেল।

আমি আর ফিরব না ঠিক করলাম। অন্তত গোটা ত্রিশ-চল্লিশ চিঠি আসার পর সুতপার চিঠি আসাও শেষ হয়ে গেল। আমি জেনিফারকে বিয়ে করে ফিলাডেলফিয়াতে চাকরি নিয়ে চলে গেলাম। আমেরিকায় বছর দশেক চাকরি করে আমি ও জেনিফার জার্মানীতে একটি চাকরি নিয়ে দু'বছর থাকলাম। তারপর আবার আমেরিকায় ফিরলাম। এবার হনলুলুতে একটা ভাল চাকরি পেলাম আমরা দুজনেই। হনলুলু খুব সুন্দর শহর; তাছাড়া আবহাওয়া মনোরম। আমরা ঠিক করলাম, এখানেই কাটিয়ে দেব বাকি জীবনটা। আমাদের এক ছেলে রবিন ও এক মেয়ে অনিতা। বাড়িতে দাদার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখি না। দেশের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলের কাছেই আমি মৃত। আমার কোনও অতীত নেই। আমি আমেরিকায় সিটিজেনশিপ নিয়েছি। তা না হলে ডিফেন্সে চাকরি পাওয়া যাবে না।

এইভাবে পনরো বছর কেটে গেল। আমি একটা আমন্ত্রণ পেলাম, কলকাতায় এবার বিজ্ঞান কংগ্রেস হবে। আমি যদি একটা ভীষণ গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপর একটি বক্তৃতা দিই তাহলে উদ্যোক্তারা বাধিত হবেন। আমার

যাতায়াতের ব্যয় কংগ্রেস বহন করবে।

পনরো বছর পরে কলকাতার কথা মনে হতেই মুহূর্তে কান্না এসে গেল। আমি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছলাম।

জেনিফারকে বলে গেলাম, ডার্লিং, তুমি ক্যালকাটা যাবে? চল না দুজনেই ঘুরে আসি।

কিন্তু জেনিফার বলল, না, আমার চাকরিতে এখন ছুটি পাওয়া যাবে না। তুমি ঘুরে এসো। আমরা এবার খ্রীস্টমাসে বালি দ্বীপে যাবো। ডেনপাসারে আমার একটা সেমিনার আছে। দুজনেই যাবো ঠিক করেছি।

অতএব একাই এসেছি। আমি যে আসব পুরনো কোনও বন্ধুবান্ধবকে জানাইনি। অশোক এখন কোথায় কে জানে! সুতপার নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে গিয়েছে এতদিনে। সঙ্গে করে কুড়ি হাজার টাকার মত ডলার নিয়ে এসেছি। আমি ঋণমুক্ত হতে চাই।

তিন

এতক্ষণ যা লিখলাম সেটা আমার গল্পের ভূমিকা বলতে পারেন। আমার আসল গল্প এইবার শুরু হচ্ছে। অবশ্য আমার আসল গল্পটা খুবই ছোট্ট। তাই বড় মুখবন্ধের দরকার হল।

কলকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমার পরিচয় ছিল প্রফেসর এস. মুখার্জী। আমি এখন খাঁটি আমেরিকান। আমার চেহারার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। আমি ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছি। বিরাট ঝুলপি। মাথায় লম্বা

www.arisumu.com

চুল। আমি বাংলা কথা বলিই না। ইংরাজি বলি ইয়াঙ্কি উচ্চারণে। আমার মুখে পাইপ থাকে সব সময়। চোখে মুখে উন্নাসিক দৃষ্টি। সাধারণ কোনও মানুষের সঙ্গে কথা বলি না। বাঙালি এ ধরনের লোককে বুদ্ধিজীবী বলে খাতির করে। আমার ইন্টারভিউ নেবার জন্য তিন-চারজন সাংবাদিক এসেছিল। আমি ইচ্ছে করে দুজনের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করলাম। শুধু স্টেটসম্যান আর আনন্দবাজারকে ইন্টারভিউ দিলাম।

কনফারেন্সে যা হয়। হই চই, পার্টি, লোকজনের দেখাসাক্ষাৎ সব মেটাতে মেটাতে দুপুর গড়িয়ে গেল। পরদিন আমার ফিরে যাবার কথা। অথচ এরই মধ্যে কলকাতা থেকে আমার গ্রামে অশোকদের সঙ্গে দেখা করে আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু তা বুঝি হয়ে উঠল না।

কলকাতা থেকে ট্রেনে চার ঘণ্টার পথ। আমি হিসাব করে দেখলাম বেলা তিনটায় যদি রওনা হই, তাহলে ঘণ্টা খানেক কাটিয়ে শেষ ট্রেনে কলকাতা ফিরতে পারি। যে করেই হোক, আজ না গেলে নয়।

আমি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসলাম।

কিন্তু গত পনরো বছরে আমার দেশে যে এত পরিবর্তন এসেছে তা বুঝতে পারিনি। ট্রামে বাসে ট্রেনে আরও ভিড় বেড়েছে। তার ওপর ঘন্টাখানেক ট্রেন চলার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। শুনলাম, রেললাইন অবরোধ হয়েছে, কি একটা দাবি নিয়ে। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম।

পাঁচ ঘণ্টা পরে ট্রেন অবরোধ মুক্ত হল। অবার চলতে শুরু করল। আমার গ্রামের স্টেশনে এসে যখন ট্রেন পৌঁছল তখন রাত এগারোটা। ট্রেন আর মাত্র তিনটে স্টেশন যাবে। কামরা ফাঁকা। স্টেশনে নেমে দেখলাম ঘুটঘুটি অন্ধকার। এ গ্রামে আমি থাকতেই বিদ্যুৎ এসেছিল। শুনলাম এখন কদাচিৎ বিদ্যুৎ থাকে। স্টেশনটিরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দুদিকে প্লাটফর্ম হয়েছে। প্লাটফর্মের ওপর বে-আইনী অনেক দোকান, ঝুপড়ি চোখে পড়ল।

আমাদের বাড়ি স্টেশনের বাঁদিকে। মায়ের মৃত্যুর পর দাদার সঙ্গেও দশ বছর ধরে কোনও যোগাযোগ নেই। দাদা এখন গ্রামে থাকেন কি না তাও জানি না। তবে অশোক নিশ্চয়ই গ্রামে আছে। বছর পাঁচেক আগে নিউইয়র্কে আমাদের পাশের গ্রামের একটি ছেলে আমেরিকায় এসেছিল। সে আমাদের পরিবারের সকলকে চেনে। অশোকদেরও চেনে। আমি তার কাছেই শুনেছিলাম অশোক প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করে আর রাজনীতি করে। অশোকের বাবা রতনজ্যেঠুর ব্যবসা উঠে গেছে। তিনি এখন রিটায়ার্ড। বাড়িতেই থাকেন। সুতপার কথা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হল। হয়তো এ ছেলেটি জানে সুতপা আমার বাগদত্তা ছিল।

আমার দাদাকে ছেলেটি চেনে। সে বলল, আপনার দাদা বিয়ে-থা করে পৈত্রিক বাড়িতেই আছেন। ওই বাড়ি থেকে হাবড়ায় অফিস করেন। দাদা পাশের গ্রামে বিয়ে করেছেন। একটি বাচ্চাও আছে। বাচ্চাটিরও বয়স বছর ছয়েক হবে। সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আমি ছেলেটিকে বলেছিলাম, দাদা আমার কথা কিছু বলে-টলে?

সে বলল, আমি আমেরিকা যাচ্ছি শুনে আপনার দাদা বললেন, আমেরিকায় আমার ভাই থাকে। কিন্তু তার ঠিকানা জানি না। সে আমাদের চিঠিপত্র লেখে না। আপনার দাদার বাড়িতে আপনার কলেজ জীবনের একটি ছবি এখনও দেওয়ালে টাঙানো আছে।

আমার মনে পড়ল যখন বি. এস. সি. পরীক্ষা দিই। তখন একটি ফোটো তুলেছিলাম। সেটি আমিই বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিলাম।

দাদা নিশ্চয়ই আছে। আমি ভেবেছিলাম দাদাকে হঠাৎ গিয়ে চমকে দেব। সঙ্গে দাদা বৌদি ও ভাইপোর জন্য কিছু টুকটাক জিনিসও এনেছিলাম।

তবে আমার দেশে যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রতনজ্যেঠুকে বিশ হাজার টাকাটা ফেরৎ দেওয়া। পনরো বছর পরে সুদে-আসলে ওই টাকা নিশ্চয়ই তিনগুণ হয়েছে। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। পঞ্চাশ হাজার পেলে বৃদ্ধ নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করে দেবেন।

স্টেশনে কামরা থেকে কাউকে নামতেও দেখলাম না। অন্য কামরায় অবশ্য লোকজন কিছু নেমেছিল। কিন্তু

তারা কোথায় মিলিয়ে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোনও টিকিট কালেকটারও আসেনি। ট্রেন ছেড়ে চলে গেল।

আমি একা একা রিক্সা স্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

স্ট্যান্ডে কোনও রিক্সা নেই। কী করব ভাবছি। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে একটি রিক্সা যেন উদয় হল।

কে যেন বলল, আরে চেনা চেনা মনে হচ্ছে, তুমি সন্দীপ না?

তাকিয়ে দেখি রিক্সাচালক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি। মাথায় ফেটি জড়ানো। কিন্তু গলার স্বর ও চোখের চাহনিতে চিনতে পারলাম, কালিদাস। আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। ক্লাস ফাইভে উঠে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না। সে সময় গ্রামে নতুন রিক্সা এসেছে। কালিপদ রিক্সা কিনে সেই বয়স থেকেই রিক্সা চালাচ্ছে। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে তার!

আমি বললাম, কালিদাস না?

চিনেছিস তাহলে? কালিদাস এবার তুমি থেকে তুইতে নামল।

তোকে চিনব না? তুই আমাদের গ্রামের গর্ব। কত বছর পরে এলি বলতো?

পনরো বছর।

ওরে বাস! তোর আশায় রোজ রাতে রিক্সা নিয়ে বসে থাকি।

বলিস কি!

কালিদাস হেসে বলল, বিশ্বাস কর। ক'দিন ধরেই মনে হচ্ছিল তুই আসবি। আজ শুনলাম, ট্রেন অবরোধ হয়েছে দত্তপুকুরে। কোনও ট্রেন আর আসবে না। তাই সব রিক্সাওয়ালা চলে গিয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল তুই আজ আসবি।

তুই কি করে জানলি আমি ইন্ডিয়ায় এসেছি? কাগজে দেখেছিস বোধ হয়?

না। আমি কাগজ টাগজ পড়ি না। সে সব তুই বুঝবি না কেমন করে জানতে পারি সব। আগে জানতে পারতাম না, এখন পারি। এই যে তুই কোথায় যাবি তাও আমার জানা—

আমি কৌতুক অনুভব করে বললাম, কোথায় যাবো বলতো?

আমি ভাবলাম, কালিদাস হয়তো বলবে, কেন, তোর দাদার কাছে। কিন্তু ও তা বলল না। বলল, তুই যাবি রতনজ্যেঠুর কাছে।

আমার অবাক হবার পালা।

আন্দাজে ঢিলটা বেশ ছুঁড়েছিস তো। নে, চল রতনজ্যেঠুর বাড়ি নিয়ে যা।

আমি রিকসায় উঠলাম।

বললাম, বাইরেটা দেখছি একদম বদলে গেছে। আচ্ছা এই তো সামনে মোহিতদাদের বাড়ি। মোহিতদা কী করছে বলতো?

মোহিতদা এখন কলেজে পড়ায়।

সামনে বড় খোকাদের আমবাগান ছিল না?

আরে এসব জমি কবে প্লট করে বিক্রি হয়ে গেছে। দেখছিস না কত বাড়ি হয়ে গিয়েছে। বড় খোকা কলকাতায় থাকে। ওর ভাইকে চিনতিস, ছোট খোকা সমরের বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

দাদার সঙ্গে পথেই যে এভাবে দেখা হয়ে যাবে বুঝিনি।

দেখো কে এসেছে? ও প্রদীপদা, প্রদীপদা। মানে আমার দাদা। আমি একটু রোমাঞ্চিত হলাম। আজ রাতটা রতনজ্যেঠুদের কাছে কাটিয়ে কাল সকালেই দাদার কাছে যেতাম।

দাদা এগিয়ে আসতে দাদাকে দেখলাম খালি গা। পরনের ধুতিটা মালকোঁচা বাঁধা। কোমরে গামছা জড়ানো।

দাদা বলল, কিছু বলছ কালিদাস? ইনি কে?

আমি বললাম, দাদা, আমি সন্দীপ। আমায় চিনতে পারছ না?

দাদা বলল, সন্দীপ। তুই? এই অসময়ে—

আমি বললাম, ট্রেন লেট ছিল বলে রাত হয়ে গেল। আমি তোমার কাছেই এসেছি দাদা।

দাদা বলল, কিন্তু আমার যে এখন কাজ রয়েছে সন্দীপ।

কাজ, এত রাতে?

হ্যাঁ, আমার ছেলেটা মানে তোর ভাইপোটা যে কোথায় গেল। পুকুরে চান করতে গিয়েছিল একা একা, এখনও ফিরল না।

তুমি কি বলছ দাদা? চান করতে এসেছিল কখন?

এই তো সন্ধ্যাবেলায়। তারপর থেকে তাকে খুঁজছি। তুই বরং রতনজ্যেঠুর বাড়ি আজ রাতটা থাক। কাল আমার বাড়ি আসিস। আমাকে বুড়োকে খুঁজে নিয়ে যেতেই হবে।

দাদার গলার আওয়াজ অসংলগ্ন লাগল। কী আবোল তাবোল বলছে দাদা!

কালিদাসকে বললাম, কি কালিদাস, দাদার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেছে?

কালিদাস বলল, না, দাদা যা বলছে ঠিকই বলছে। ওর একমাত্র ছেলে পুকুরঘাটে এসে আর ফেরেনি। তোর দাদার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছিস। এখন সারারাত ধরে ওকে খুঁজতে হবে। একবার কিছু হারিয়ে গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন। দাদা তাই রোজ রাতে পুকুরঘাটে এসে ছেলেকে খোঁজে।

তুই হেঁয়ালি করছিস কালিদাস। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। দাদা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। হঠাৎ শুনলাম কে যেন বলছে—

আরে সন্দীপ যে—দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা ভূগোলের মাস্টারমশাই রবীনবাবু।

রবীনবাবু পনরো বছর আগে যেমন ছিলেন এখনও তেমন। এত রাতে ফিনফিনে আর্দির পাঞ্জাবি আর ফাইন ধুতি পরে তিনি কোথায় যাচ্ছেন?

আমি বললাম, আরে মাস্টারমশাই। আপনি এত রাতে?

রাতে একটু ঘোরাঘুরি করা আমার স্বভাব বাবা। তুমি কবে এলে?

এইমাত্র এসে পৌঁছলাম।

কোন শহরে আছ? শিকাগো না?

আজ্ঞে না, এখন উচিটা বলে একটা শহরে আছি। কিন্তু রবীনজ্যেঠু, দাদার সঙ্গে একটু আগে দেখা হয়েছিল। দাদার খুব বিপদ।

কেন, তোমার দাদার কী হল?

দাদার মনে হল মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দাদার বাড়িতে কোনও বিপদ-টিপদ হয়েছিল নাকি স্যার? দাদা এত রাতে উদভ্রান্তের মত শশীকুণ্ডুর পুকুরের দিকে চলে গেলেন।

রবীনবাবু বললেন, তুমি ভয় টয় পেলে নাকি সন্দীপ? অনেকদিন পরে এসেছ তো। কালিদাস, সন্দীপকে কি ভয় দেখাচ্ছিস নাকি? আজকাল শুনি তুই রাত্তির হলেই অনেক প্যাসেঞ্জারকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস।

কালিদাস বলল, না, স্যার। সন্দীপ তো আমার বন্ধু। একসঙ্গে বিষ্টু মাস্টারের পাঠশালায় পড়তাম। ওকে ভয় পাইয়ে দেব কেন? তবে রতনজ্যেঠুর বাড়ি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে রতনজ্যেঠু বলে রেখেছেন। যদি সন্দীপ কখনও আসে আমার বাড়ি নিয়ে আসবি।

আমি বললাম, স্যার, আপনি এত রাতে ধুতি পাঞ্জাবি পরে কোথায় বেরিয়েছেন?

রবীনবাবু বললেন, আমি হাঁটতে বেরিয়েছি। এই সময়টা একটু হাঁটি। রাস্তায় লোকজন থাকে না। আরও মজা আমি হাঁটি জানাজানি হয়ে যাওয়ায় এই সময় বাড়ি থেকে কেউ বেরোয় না।

কেন? বেরোয় না কেন? আপনি থাকেন তো কি হয়েছে তাতে?

দ্যাখো বাপু, আমার হাঁটা-চলাই লোকের পছন্দ নয়। তারপর আমি যে ওই তেঁতুল গাছে গিয়ে একটু বসি, সেটাও লোকে পছন্দ করে না।

এবার আমার কেমন যেন গা শির-শির করতে লাগল। রবীনবাবুও কি পাগল হয়ে গেলেন নাকি? ভদ্রলোক কল্পনা নাট্যসমাজে নিয়মিত থিয়েটার টিয়েটার করতেন। তাই সবসময় নাটক করেন। পড়ানও নাটকের মত করে। কিন্তু নাটুকেপণা করা এক কথা আর আবোল তাবোল অসংলগ্ন কথা বলা আর এক কথা।

সেই মুহূর্তে ঘটল এক ঘটনা। কে যেন একটি লোক টর্চ হাতে করে দেওয়ানজি বাড়ির দিক থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ কালিদাস ও রবীনবাবুর দিকে তাকাতেই লোকটি 'ওরে বাবারে' বলে অজ্ঞান হয়ে গেল। একেবারে সটান রাস্তার ওপর পড়ে গেল। লোকটি

গোঁ গোঁ করতে লাগল।

কালিদাস বলল, ও হল চাটুজ্জে পাড়ার নীলু। ওর ফিটের ব্যামো আছে। হঠাৎ দেখি রবীনবাবু নেই। আমি বললাম, রবীনবাবু কোথায়?

কালিদাস আমার কথার উত্তর না দিয়ে রিক্সা চালিয়ে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে কালিদাস আমাকে অশোকদের বাড়িতে নিয়ে এল। পনরো বছরে বাড়ির বাইরেটায় অন্তত কোন পরিবর্তন হয়নি।

বাড়ির সামনে এসে মনে হল বাড়িতে কেউ থাকে না। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাড়ির সামনে উঠোনে ছোট ছোট জঙ্গল গজিয়ে গেছে।

কালিদাস আমাকে নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দরজা ধাক্কা দিল। বলল, রতনজ্যেঠু, ও রতনজ্যেঠু। অশোক, দ্যাখো কে এসেছে।

ভেতর থেকে কোনও উত্তর এল না। কিন্তু কালিদাস একটু ঠেলতেই বন্ধ দরজা খুলে গেল।

তারপর আমাকে নিয়ে কালিদাস ভেতরে ঢুকল। দরজা খুলে ভেতরে যেতেই দেখি সামনে রতনজ্যাঠা। পনরো বছরে একদম পালটাননি। পরনে ধুতি, গায়ে উত্তরীয় জড়ানো। আমাকে দেখেই বললেন, এই যে, তুমি এসে গেছ বাবা সন্দীপ। আমি তোমার জন্য খুব চিন্তায় ছিলাম। বিয়ের লগ্ন চলে যাচ্ছে। অশোক, অশোক, সুতপার বর এসে গেছে। দেখবি আয়।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। মেয়েকে নিয়ে বোধহয় খুব উদ্বিগ্ন ভদ্রলোক। সুতপার তাহলে এখনও বিয়ে হয়নি। এখন তাহলে তার বয়স ছত্রিশ হবে।

কিন্তু আমাকে বলতেই হবে আমি বিবাহিত। কিন্তু সুতপার সঙ্গে আমাকে যদি জোর করে বিয়ে দিয়ে দেন? আমাকে বলতে হবে আমি বিবাহিত। টাকার বাণ্ডিলটা ওঁর হাতে দিতে হবে।

আমি বললাম, জ্যেঠামশায়, একটু শুনুন আমার কথা। জেঠামশায়।

এমন সময় কোথা থেকে একগাদা লোক এসে আমায় ধরল। কেউ বলল, খুব যে পালিয়েছিলি এবার কি হয়। চলো চলো।

ওরা আমাকে সোজা বাড়ির ভেতর একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে দেখি অশোক। অশোক আমাকে বলল, আয় আয়, ভাল আছিস?

আমি বললাম, এসব কি হচ্ছে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

অশোক বলল, তোর বুঝতে হবে না। তুই বিয়েটা চটপট সেরে ফেল তো দেখি। সুতপা কত দিন ধরে অপেক্ষা করছে।

আমি বললাম, আমি অনেক দিন আগেই বিবাহিত।

অশোক বলল, তার মানে? তুই সুতপাকে বিয়ে করবি না?

না।

কেন?

কারণ আমি বিবাহিত।

কিন্তু সুতপাকে বিয়ে করবি এই শর্তে তুই বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলি।

সেই টাকা আমি সব ফেরত এনেছি।

এমন সময় রতনজ্যাঠা ঘরে ঢুকে বললেন এই যে সুতপাকে নিয়ে এসেছি। সুতপা মা, তুমি আর দেরি কোর না। কই, মালাটা সন্দীপের গলায় পরিয়ে দাও। কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে পিঁড়িসুদ্ধ সুতপাকে তুলে আমার কাছে নিয়ে এল।

তারপর সুতপাকে বলল, এইবার বরের গলায় মালা দাও।

একটি মালা এসে পড়ল আমার গলায়।

সবাই বলল, এবার শুভদৃষ্টি হবে। কারা যেন চাদর মেলে ধরল মাথার ওপর।

তারপর আমি তাকালাম সুতপার মুখের দিকে। তাকিয়ে দেখি একটি কঙ্কাল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে—

আমি চোখ বুজলাম। আর আমার কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমি মাটিতে শুয়ে আছি। চনচনে রোদ উঠেছে। আমাকে ঘিরে একদল কৌতূহলী জনতা।

চোখ মেলতে দেখে অনেকে বলে উঠল, বেঁচে আছে। বেঁচে আছে। ওরে, তাড়াতাড়ি গিয়ে ফণী ডাক্তারকে

ডেকে আন।

আমি বললাম, আমি কোথায়? একজন বলল, আপনি এখানে ভট্টাচার্য পাড়ায়। রতন ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে পড়ে ছিলেন। আমরা ভাবলাম মার্ডার। কারণ আমাদের গ্রামে প্রায়ই মার্ডার হচ্ছে। কিন্তু আপনি কে বলুন তো? চেনা চেনা মনে হচ্ছে। এমন সময় ফণী ডাক্তার এলেন। ডাক্তারজ্যেঠুকে দেখে চিনতে পারলাম। তিনিও আমায় দেখে বললেন, আরে সন্দীপ না? তুমি আমেরিকা থেকে কবে ফিরলে? এখানে কী করে এলে?

আমি বললাম, ডাক্তারজ্যেঠু, কাল রাতে আমায় রিক্সাওয়ালা কালিদাস এখানে নিয়ে এসেছিল। আমি রতনজ্যেঠুর কাছে এসেছিলাম। কিন্তু আমায় দেখে এরা এমন অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে দিলেন—

তুমি কাদের কথা বলছ সন্দীপ?

রতনজ্যেঠু, অশোক, সুতপা এদের কথা।

আমার মুখে ওদের নাম শুনে গুঞ্জন উঠল। ওরা আমায় পুরো ঘটনাটা বলতে বলল। আমি সব খুলে বললাম।

ডাক্তারবাবু সব শুনে বললেন, তুমি খুব বেঁচে গেছ সন্দীপ। তুমি যাদের দেখেছ তারা কেউই আর জীবিত নেই। এমনকি তোমার দাদাও আর বেঁচে নেই। ১৯৭৮ সালের বন্যায় যমুনা নদীর জল ছাপিয়ে এই সব পাড়া ডুবিয়ে দেয়। সে-সময় গ্রামের একশো লোক মারা যায়। রতন ভট্টাচার্যের এই বাড়ি জলের তলায় ছিল। আমরা অনেক আগে নিরাপদ জায়গায় চলে গিয়েছিলাম বলে বেঁচে যাই। তোমার ভাইপো প্রথম জলে ভেসে যায়। প্রচণ্ড বৃষ্টির মাঝে তোমার দাদা তার খোঁজ করতে গিয়ে তলিয়ে যান। ওরা আর কেউ নেই। রতন ভট্টাচার্যের বাড়ি সেই থেকে চাবি দেওয়া পড়ে আছে। ওদের বংশে থাকার মধ্যে আছে রতনের ভাইপো। তারা কলকাতায় থাকে। একবার মাত্র এসেছিল।

তারপর ডাক্তারজ্যেঠু বললেন, যাই বলো সন্দীপ, তোমার জন্য সুতপা সারাজীবন অপেক্ষা করে গেছে। অন্যদিকে ব্যবসা পড়ে যাওয়ায় মেয়ের অন্য কোথাও বড় ঘরে বিয়ে দেওয়ার সঙ্গতি ছিল না ওঁদের। রতন ভট্টাচার্য বিশ্বাস করত তুমি আসবে। ফিরে আসবে একদিন। তারপর থেকে রাত্তির বেলা ওদের অনেককে গ্রামের লোক দেখেছে। কালিদাসও বন্যার সময় মারা যায়। সেই থেকে কালিদাস স্টেশনে ওৎ পেতে থাকে রাত্রির যাত্রী আনার জন্য।

এমন অবস্থায় গ্রামের সকলেই তাকে দেখেছে। দেখে ভয় পেয়েছে। সেজন্য গ্রামের লোকেরা রাত দশটার পর আর এখন পারতপক্ষে বেরোয় না। এছাড়া খুন-জখমও হচ্ছে এই সুযোগ।

আমি উঠে বসে তাড়াতাড়ি আমার কোটের পকেটে মানি ব্যাগে হাত দিলাম। না, মানিব্যাগ অক্ষতই আছে। পকেটে চেক বুকও ঠিক আছে।

আমি ধীরে ধীরে উঠলাম।

পকেটে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি চেক তীক্ষ্ণ কাঁটার মত আমাকে বিঁধছে।

ফণী ডাক্তারজ্যেঠুর বাড়ি বিশ্রাম নিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে দুপুরের ট্রেনে কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। ভারতে আবার আসব কি না জানি না। যদি আসি তাহলে আমার গ্রামে আর কদাচ নয়।

দাদার ছেলের মৃত্যু হলেও বৌদি এখনও গ্রামে আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে এসেছি।

বৌদির মুখে শুনলাম, কীভাবে বন্যার জলে আমার ভাইপো ও দাদা দুজনে ভেসে গেলেন। বৌদিও ভেসে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত একটা গাছ ধরে বেঁচে যান।

৫০ হাজার টাকা মেয়েদের স্কুলে দান করে এসেছি। আমি এখন বিবেকমুক্ত।

জঙ্গল মহলের দুর্গ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

www.arisumu.com

এক

মাতলার মোহনা ছুঁয়ে ফেরার পথেই বেলা পড়ে এল।

তপন চৌধুরী সারেংকে বললেন—আবদুল, সামনের ওই চওড়া ফাঁড়িটার মধ্যে মোটর লঞ্চ ঢোকাও। আজকের রাতটা আমরা এখানেই কাটাব।

তিন বন্ধুর মধ্যে রাজেন নিয়োগী একটু ভীতু প্রকৃতির। তপন চৌধুরীর প্রস্তাব শুনে তিনি আঁতকে উঠে বললেন—সেটা কি ঠিক হবে তপন? সুন্দরবনের এদিকটা মোটেই নিরাপদ নয়। বলতে বলতে রাজেনবাবু আড়চোখে তাকালেন শ্রীনাথের দিকে।

শ্রীনাথ রায় তখন মোটর লঞ্চের রেলিং-এ ভর দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন দূর জঙ্গলপানে। বন্ধু রাজেনের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে গেল কিনা কে জানে, তবে আপনমনেই বলে উঠলেন—বিউটিফুল। এই ঘন অরণ্যের নাম সুন্দরবন কে দিয়েছে জানি না, কিন্তু সত্যিই ভারী সুন্দর এর অরণ্যপ্রকৃতি। শুধু আজকের রাত কেন, আমার তো ইচ্ছে করছে পরপর কয়েকটা দিন আর রাত এই অরণ্যরাজ্যে কাটিয়ে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন তপন চৌধুরী—শ্রীনাথ, তুই সত্যিকার প্রকৃতিপ্রেমিক। এমন জায়গায় তোর মতো সাহিত্যিকের আসাই সার্থক।

শ্রীনাথ, রাজেন আর তপন—ওঁরা কলেজ জীবনের তিন বন্ধু। এখন অবশ্য কর্মসূত্রে আলাদা। শ্রীনাথ লেখক, রাজেন নিয়োগী বিজনেসম্যান আর তপন চৌধুরী ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদস্থ অফিসার।

তপন চৌধুরীর উদ্যোগেই ওঁরা তিন বন্ধু সুন্দরবন বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে আছে শ্রীনাথ রায়ের স্ত্রী রেবাদেবী, কিশোরী মেয়ে ঝুমা আর মোটর লঞ্চের জনাকয়েক কর্মচারী ছাড়াও দুজন ফরেস্ট গার্ড।

মোটর লঞ্চ তখন ফাঁড়ির মধ্যে ঢুকতে শুরু করেছে।

দু'পাশের গভীর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রাজেন নিয়োগী বললেন—শ্রীনাথ, তুমি কি সত্যিই এই খাঁড়ির মধ্যে লঞ্চের ওপর আজকের রাতটা কাটাতে চাও?

—নিশ্চয়ই। গরান, হেঁতাল, সুন্দরী গাছের এই অরণ্যের আসল রূপ তো রাত্রেই বন্ধু। এর ওপর আজকের রাতটা পূর্ণিমা। জ্যোৎস্না রাতে গহন সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য উপভোগের এমন সুযোগ আর কি কোনোদিন পাওয়া যাবে?

—আমিও তাই বলি, একথা বলে তপন চৌধুরী তাকালেন শ্রীনাথবাবুর স্ত্রী রেবাদেবীর দিকে—বৌদি, আপনার আপত্তি নেই তো?

রেবাদেবী গত তের বছরে তাঁর স্বামীটিকে বিলক্ষণ চিনেছেন, তাই কোনো কথা না বলে শুধু মুচকি হাসলেন।

কিন্তু প্রসঙ্গ শেষ হবার আগেই হঠাৎ মোটর লঞ্চের একেবারে সামনের দিকের রেলিং-এর কাছ থেকে ঝুমার চিৎকার শোনা গেল—বাবা, তোমরা শীগগির এস—জঙ্গলের মধ্যে একটা দুর্গ দেখা যাচ্ছে. . . দুর্গ. . .

ওঁরা সবাই চমকে সেদিকে ছুটে গেলেন।

দুই

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লেও দিনের আলো তখনও নিভে আসেনি—সুতরাং সুন্দরবনের জট পাকানো গাছগাছালির ফাঁকে ওটা যে একটা ভাঙাচোরা দুর্গ তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

তপন চৌধুরী বললেন—শ্রীনাথ, তুই লেখক মানুষ, নিশ্চয়ই জানিস সুন্দরবন আজ ভয়াবহ অরণ্য হলেও মাত্র তিন-চারশো বছর আগেও এখানে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। এখনও জঙ্গলের কোথাও কোথাও ভাঙা দেউল, সৌধ, দীঘির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে।

শ্রীনাথ রায় বললেন—ইতিহাসে পড়েছি। বিশেষতঃ পর্তুগীজ হার্মাদ জলদস্যুদের অত্যাচারেই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক জনপদ সে সময় ধ্বংস হয়ে যায়।

ঝুমা একদৃষ্টে তাকিয়েছিল সেই ভাঙা দুর্গের দিকে। হঠাৎ বললো—চল না বাবা, দুর্গটা গিয়ে দেখে আসি।

আবার আঁতকে উঠলেন রাজেন নিয়োগী—বলছ কি ঝুমা! সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। এ সময় এই ফাঁড়ির মধ্যে লঞ্চে থাকাই নিরাপদ নয়। তার ওপর আবার. . . .

কিন্তু ঝুমা বায়না শুরু করলো। ওই পুরনো দুর্গটা না দেখা পর্যন্ত যেন তার স্বস্তি নেই।

কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না মেয়েটিকে। এমন কি ঝুমার মা রেবাদেবী পর্যন্ত হার মানলেন মেয়ের জেদের কাছে। ওই ভাঙা দুর্গের প্রতি ওর এত কিসের আকর্ষণ কে জানে!

অবশেষে তপন চৌধুরী বললেন—ঠিক আছে, আমরা বরং একবার ঘুরেই আসি। এখনও সূর্য ডুবতে কিছুটা সময় দেরি আছে। কতটুকু সময়ই বা লাগবে। সঙ্গে আমার বন্দুক তো রয়েইছে, ফরেস্ট গার্ড লতিফও যাবে।

কিন্তু রাজেন নিয়োগী কিছুতেই মোটর লঞ্চ থেকে নামতে রাজী হলেন না। অগত্যা ঠিক হলো, শ্রীনাথবাবু, ঝুমা, তপন চৌধুরী আর লতিফ দুর্গ দেখতে যাবে। অন্যরা মোটর লঞ্চেই থাকবে।

তিন

ফাঁড়ি থেকে দুর্গের দূরত্ব এমন কিছু নয়। ওরা পাঁচজন যখন দুর্গের সামনে এসে দাঁড়ালো, সারা আকাশে রক্ত লেপে সূর্যটা ডুবতে শুরু করেছে।

এইসঙ্গে আকাশে উঠেছে গোলাকার চাঁদ।

দুর্গ খুব বড় নয়। ভাঙাচোরা পোড়ো দুর্গটাকে সাপের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে বড় বড় গাছের শেকড়। ঝুরি নেমে এসেছে এখানে ওখানে।

দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে ঝুমা হঠাৎ আপনমনেই বলে উঠলো—এখানে কি আগে কখনও এসেছি? দুর্গটা কেমন যেন চেনা মনে হচ্ছে।

শ্রীনাথ রায় আর তপন চৌধুরী নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টিবিনিময় করলেন। তারপর তপন চৌধুরী ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বললেন—ঝুমার এখন কল্পনা করারই তো বয়স। চল্ শ্রীনাথ, আমরা বরং দুর্গের চারপাশটা দেখে নিই।

—না কাকু, চল, আগে আমরা দুর্গের ভেতরে যাই। ঢোকার রাস্তাটা এদিক দিয়ে। ঝুমা সহজ আত্মবিশ্বাসীর মতোই বললো।

হঠাৎ এই দুর্গকে ঘিরে কিশোরী মেয়েটির এমন অতি কৌতূহল অস্বাভাবিক বৈকি, কিন্তু শ্রীনাথবাবু কিছু বলার আগেই তপন চৌধুরী বললেন—বেশ তো, তোমার কথায় এতটাই যখন এলাম, ভেতরেও না হয় উঁকি মারা যাক।

ঝুমা সকলের আগে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে দুর্গের প্রধান তোরণদ্বারের দিকে এগিয়ে চললো।

তোরণের ঠিক দুপাশে দুটো কামান মাটির মধ্যে অর্ধেকটা পোতা অবস্থায় মুখ উঁচু করে রয়েছে। এককালে

এ দুটো যে দুর্গের প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহার হতো তা বোঝা যায়।

প্রধান তোরণ পার হয়ে ভেতরে পা দিতেই দিনের আলো আরও কমে এল। দুপাশে সারি সারি ঘর। সামনে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর তলার দিকে।

ওরা সিঁড়ির কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই কে যেন মাথার কাছে 'ফ্যাঁচ' করে উঠলো। এদিকটায় অন্ধকার আরও গাঢ়। শব্দ লক্ষ্য করে তপন চৌধুরী টর্চের আলো ফেলতেই ঝটপট ঝটপট শব্দে কয়েকটা বাদুড় ওপরের অন্ধকার থেকে নেমে এসে উড়তে উড়তে কোথায় চলে গেল।

আর ঠিক তখনই শ্রীনাথবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—ঝুমা, ঝুমা কোথায়!

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো চতুর্দিকে ঘোরালেন তপন চৌধুরী। তাই তো, ঝুমা কোথায় গেল! এই মাত্র সঙ্গে ছিল। এরই মধ্যে কোথায় গেল সে!

শ্রীনাথ রায় আর তপন চৌধুরী একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে ডেকে উঠলেন-ঝুমা. . ঝুমা. . .ঝুমা. . !

জনহীন ভাঙা দুর্গে তাঁদের সে কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল, কিন্তু কিশোরী ঝুমার সাড়া পাওয়া গেল না।

শ্রীনাথবাবু আবার পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন- ঝুমা. . .ঝুমা. . .সাড়া দে. . .!

এবারও সাড়া পাওয়া গেল না, তার বদলে ভাঙা দুর্গের কোনো ভগ্ন প্রাচীরের ওপর থেকে যেন অপার্থিব কণ্ঠে ডেকে উঠলো এক নিশাচর পাখি—ক্যা. . .ক্যা. . . ক্যা. . .ক্যা. . .

চার

রাতজাগা নিশাচরের ভয়ানক চিৎকারেই চমক ভাঙলো ঝুমার।

সে এখানে এল কি করে!

তার সঙ্গে যারা ছিল—তারা সব কোথায়? চিৎকার করে ডাকলো ঝুমা—বাবা, তপনকাকু, কোথায় তোমরা . . সাড়া দিচ্ছ না কেন?

কেউ সাড়া দিল না। অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে এল ঝুমার কণ্ঠস্বর।

তাহলে কি জঙ্গলের মধ্যে এই ভাঙা দুর্গের মধ্যে সে একা? ভাবতেই একটা ভীষণ ভয়ের কম্পন শিরশিরিয়ে উঠলো ঝুমার বুকের ভেতর।

আর তখনই শন্‌শন্ বাতাসের বেগ কোথা থেকে এসে বয়ে গেল দুর্গের ওপর দিয়ে। সে হাওয়ার ঘূর্ণি যেন ঝুমার মাথার মধ্যেটাও কেমন দুলিয়ে দিল। দুর্গ-প্রাচীরে হাত রেখে টাল সামলালো ঝুমা।

ছলাৎ. . .ছলাৎ শব্দে নিচের দিকে তাকালো।

এ কি! দুর্গের ঠিক পাশেই এমন একটা নদী বয়ে গেছে আগে চোখে পড়েনি তো।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। গোটা চাঁদ। নদীর জলে লুটিয়ে পড়েছে চাঁদের প্রতিবিম্বটা।

এখান থেকে বেরুতে হবে। এক্ষুণি। ফিরে যেতে হবে মোটর লঞ্চে মা-বাবার কাছে। তাকে হারিয়ে তাঁরাও এতক্ষণে নিশ্চয়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

ঝুমা ফিরে দাঁড়ালো। বেরুবার পথটা কোনদিকে?

একটা দিক অনুমান করে সেদিকে এগুতে চাইলো ঝুমা, কিন্তু সামনের বড় দরজাটার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হলো।

এ কি বিস্ময়!

দরজার পাশে ওই মশালটা কে জ্বাললো? দরজার সামনে খোলা তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছে এক ভীষণদর্শন কাফ্রি।

নিরালা জঙ্গলের দুর্গে কে ওই প্রহরী? মশাল জেলে রেখে পাহারাই বা দিচ্ছে কাকে?

পায়ে পায়ে পিছু হেঁটে এবার সে অন্যদিকে ফিরে চললো। পাশের ঘরের দরজাপথে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে।

কিন্তু সেদিকেও দরজা অবরুদ্ধ।

এ কোন অপ্রাকৃত গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে ঝুমা! এসব কি সত্যি, না স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সে!

এখান থেকে পালাতেই হবে। যত শীঘ্র সম্ভব।

ঝুমার মাথার মধ্যেটা টলছে। দুহাতে মাথা চেপে সে

www.arisumu.com

বসে পড়লো দুর্গের সেই শক্ত পাথুরে মেঝেতে।

কতক্ষণ এভাবে বসে ছিল তার খেয়াল নেই।

হঠাৎ কানে এল পায়ের শব্দ। কে যেন আসছে—খস্. . .খস্. . .খস্. . .খস্. . .যেন কত দূরত্ব, কত যুগ পার হয়ে।

ধীরে ধীরে মাথা তুললো ঝুমা।

এরই মধ্যে ঘরের মধ্যে মশাল জ্বলে উঠেছে। কই, দুর্গটা তো আর খুব বেশী পুরনো আর ভাঙাচোরা মনে হচ্ছে না।

কি যেন একটা ঘটে গেছে এরই মধ্যে। বদলে গেছে সময়ের হিসেব।

ঝুমা উঠে দাড়াতে চেষ্টা করলো। মাথার মধ্যে অসহ্য ভার। সারা শরীর আড়ষ্ট।

খস্. . .খস্. . .খস্. . .খস্. . . !

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। কাছে। আরও কাছে। সামনের দরজাটা দিয়ে কে ছায়ার মতো ঘরে ঢুকলো।

যন্ত্রণাকাতর শরীরটা সোজা করে মুখ তুলে তাকালো ঝুমা।

কে ও? ও কি মানুষ?

দোমড়ানো চেহারা। থুরথুরে এক বুড়ি। মাথায় উস্কোখুস্কো শণের মতো পাকা চুল। পরনে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো কাপড়। হাতে একটা শানকি, তাতে শুকনো কড়কড়ে ভাত, আর এক গ্লাস জল। বুড়ি এগিয়ে আসছে। ঝুমা লক্ষ্য করলো, বুড়ির দুপায়ের মধ্যে শক্ত দড়ির বাঁধন, তাই হাঁটছে পা ঘষে ঘষে। কে বেঁধেছে বুড়ির পা দুটো অমনভাবে? কোন সে নিষ্ঠুর?

বুড়ি আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। হেঁটে এসেও ওর দুচোখে যেন মরা মানুষের দৃষ্টি।

সামনে এসে দাঁড়িয়ে বুড়ি হাতের শানকিটা ঝুমার দিকে এগিয়ে বিড়বিড় স্বরে বললো—সৌদামিনী, বাছা,

খেয়ে নে। আজ সারাদিন তো অন্নজল জোটেনি।

সৌদামিনী! কাকে সম্বোধন করছে বুড়ি? ঝুমা এদিক ওদিক তাকায়। কই, আশপাশে অন্য কেউ তো নেই।

ঝুমা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আগন্তুক বুড়ির দিকে। এই অন্ধকার নিস্তব্ধ দুর্গের কক্ষে ওই থুরথুরে বুড়ির ফিসফিসে কথাগুলো তার চেতনার মধ্যে যেন কি এক কম্পনের সৃষ্টি করেছে!

—সদু. . . সৌদামিনী. . .!

—কে তুমি? আমি কোথায়? হঠাৎ ঝুমা সোজা হয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করে।

—এখনও বুঝতে পারিসনি হতভাগী। এটা শয়তান হার্মাদদের ঘাঁটি। আগে ছিল মুঘলদের দুর্গ। কিছুদিন হলো হার্মাদ পর্তুগীজ সর্দার গেব্রিয়েল পেড্রো এটা দখল করেছে। এরা সারা সুবে বাংলা উড়িষ্যা থেকে নারী পুরুষ-শিশুদের ধরে এনে এখান থেকে ক্রীতদাস হিসেবে চালান দেয় দেশ বিদেশে।

হার্মাদ পর্তুগীজ. . . .মুঘল. . .সুবে বাংলা. . . ক্রীতদাস. . .এসব কোন যুগের কথা বলছে বুড়ি!

—সৌদামিনী. . . .

—উঁ? অজান্তেই সাড়া দেয় ঝুমার কণ্ঠ।

—আজ ভোরে ওরা যখন তোর অচেতন দেহটা নৌকা করে নিয়ে এল, তোর মুখটা দেখেই চমকে উঠেছিলুম। ঠিক যেন আমার সেই নাতনীটা। শয়তানরা কোথায় যে ওকে বেচে দিয়েছে তার হদিস পাইনি, বুড়ি ফিসফিসে গলায় বলে চলে, তাই তো আজ তোকে দেখে ঠিক থাকতে পারিনি। সারাদিন প্রাণপণে আগলে রেখেছি তোকে। আজ তোর সঙ্গে আর যাদের ধরে এনেছিল, তাদের সবাইকেই ওরা নগদ দামে তুলে দিয়েছে দাস-ব্যবসায়ী আড়কাঠিদের হাতে। ছিপ ভর্তি করে সেই শয়তানরা অসহায় বন্দী মানুষগুলোকে এই জঙ্গল মহলের ঘাঁটি থেকে নিয়ে গেছে জন্তুর মতো বিক্রি করবে বলে।

যেন কোন এক আশ্চর্য অনুভূতির রাজ্যে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে ঝুমা। তার মধ্যে জেগে উঠছে এক অন্য সত্তা। দ্রুত উল্টে যাচ্ছে ইতিহাসের কয়েকটি পাতা।

হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সব মনে পড়ছে।

সৌ-সৌদামিনী। সপ্তগ্রামের বণিক সুধাকর দত্তের দ্বাদশী কন্যা। মা আর প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে অন্যদিনের মতোই নদীতে স্নান করতে নেমেছিল সে। সাঁতার কাটতে কাটতে পাড় ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ চারদিক থেকে একটা ভয়ার্ত চেঁচামেচি শোনা গেল—ওরে পালা. . . হার্মাদ. . .হার্মাদ. . . মুখ তুলে সৌদামিনী দেখলো দ্রুতগতিতে গোটা কয়েক ছিপ ভেসে আসছে দক্ষিণ থেকে। ছিপের ওপর অদ্ভুত পোশাক পরা কয়েকজন সাদা চামড়ার অস্ত্রধারী মানুষ। সবাই তখন পালাতে শুরু করেছে। সৌদামিনীও পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ একটা ছিপ এসে পড়লো একেবারে তার পাশে। মাথায় বৈঠার প্রচন্ড আঘাত। অজ্ঞান হবার আগের মুহূর্তে সে শুধু এটুকু টের পেয়েছে, একটা সাদা কুৎসিত মুখের মানুষ দুহাতে তার দেহটাকে টেনে তুললো ছিপের ওপর।

—কি ভাবছিস সৌদামিনী?

বুড়ির কথায় মুখ তুলে তাকায় সে।

—ভাবছিস তোর নামটা আমি কি করে জানলুম, তাই তো? আজ যে সারাটি দিন অর্ধচেতনার মধ্যে বারবার শুধু মাকে ডেকে কেঁদেছিস আর বিড়বিড় করেছিস—মা, তোমার সদুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও না, সদুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। শুনে আমিও চোখের জল রাখতে পারিনি বাছা।

—তুমি তো এই হার্মাদ পর্তুগীজদেরই নোকরানি?

শুনে একটু যেন থমকে গেল বুড়ি, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস মেয়ে। জঙ্গল মহলে হার্মাদদের এই ঘাঁটিতে ওরা আমাকে দিয়ে দাসীর কাজই করায়। আমার স্বামী, ছেলে, মেয়ে, নাতনী সবাইকে ওরা বেচে দিয়েছে দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে। শুধু আমাকে রেখে দিয়েছে দুর্গের নোকরানি করে। দেখছিস না, দেখছিস না আমার দুপায়ে শক্ত বাঁধন দিয়ে গেছে যাতে পালাতে না পারি. . .বলতে বলতে কান্নায় বুজে আসে বুড়ির কণ্ঠস্বর।

চাঁদটা উঠে পড়েছে দুর্গের মাথার ওপর।

হঠাৎ দুর্গের পাশে নদীটা থেকে ছপ ছপ দাঁড় টানার

শব্দ শোনা গেল। গবাক্ষপথে চোখে পড়লো, একটা বড় নৌকো ভেসে আসছে। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় বুঝতে অসুবিধে হলো না, নৌকোয় একদল নারী-পুরুষকে বন্দী করে নিয়ে আসছে একদল সশস্ত্র ভীমদর্শন পর্তুগীজ।

—ওই আর একদলকে ধরে নিয়ে এল শয়তান গেব্রিয়েল পেড্রোর দল। হায় ভগবান, আর কতকাল দেশের মানুষকে এমন নির্মম অত্যাচার সইতে হবে! শুকনো বাতাসের শব্দের মতো হা হা করে উঠলো বুড়ির কণ্ঠস্বর।

—সুবে বাংলার এই অংশ বর্তমানে দিল্লীর বাদশাহের অধীন। তিনিও কি পারেন না কিছু করতে? যেন বন্দী সৌদামিনীর কণ্ঠই কথা বললো।

—এই নৃশংস হার্মাদরা মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরকেও ভয় করে না। না হলে সাধ্যি হয় মুঘলদেরই দুর্গ দখল করে দাস-ব্যবসার ঘাঁটি বানানোর!

ততক্ষণে নৌকো এসে ভিড়েছে দুর্গের ঘাটে। হার্মাদরা নৌকো থেকে বন্দী মানুষগুলোকে টেনে হিঁচড়ে নামাতে শুরু করেছে। শুরু হয়ে গেছে অসহায় মানুষগুলোর কাকুতি-মিনতি, কান্নাকাটি। জনাকয়েক অবাধ্য বন্দীকে তক্ষুণি গুলি করে মেরে ফেললো হার্মাদরা।

—আমায়, আমায় তুমি বাঁচাও বুড়িমা, আমি বাঁচতে চাই।

হঠাৎ প্রাণের চরম আকুলতায় সেই বুড়ির পা দুটি জড়িয়ে ধরলো কিশোরী।

—কি করে তোকে বাঁচাই বাছা। মৃত্যু ছাড়া আর কারুর সাধ্যি নেই শয়তান পেড্রোর কবল থেকে উদ্ধার করে।

—তবে তাই দাও। বিষ দাও। সারাজীবন ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তাও ভাল।

—সৌদামিনী, সত্যিই তুই মুক্তি চাস, বুড়ির দুচোখের দৃষ্টি হঠাৎ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, মৃদু বাতাসের মতো ফিসফিস স্বরে বললো—আমি আমার স্বামী, ছেলেমেয়ে, নাতনী কাউকে বাঁচাতে পারিনি। আমার দেশের শত শত মানুষকে প্রতিদিন ওরা ক্রীতদাস বানাচ্ছে, বাধা দিতে পারিনি—আজ অন্ততঃ একবার চেষ্টা করবো।

বলতে বলতে সেই দ্বাদশী কিশোরীকে নিয়ে বুড়ি এগিয়ে যায় দুর্গপ্রাচীরের একধারে। প্রাচীরের নিচে লতাগুল্মের ঘন ঝোপ। সেদিকে আঙুল তুলে বুড়ি বলে—পারবি ওখানে লাফিয়ে পড়তে? ভয় নেই, এখান থেকে লাফালে মরবি না। তারপর সোজা উত্তরমুখো চলতে চলতে ভগবান সহায় হলে জঙ্গল ছেড়ে জনপদ পেয়ে যাবি। হয়তো একদিন সপ্তগ্রামেও পৌঁছতে পারিস, আর সে ভাগ্য না হলে. . .

—তাও ভাল বুড়িমা। এই হার্মাদদের হাতে না মরে বাঘের পেটে যাওয়াও ভাল।

দুর্গের মধ্যে এবার হৈ-হল্লা শোনা গেল। হার্মাদরা বোধহয় বুড়িকে খুঁজছে। কয়েক জোড়া ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে এদিকে।

—সদু, সদু, আর দেরি করিসনি। এখান থেকে লাফিয়ে পড়।

—কিন্তু তোমার কি হবে বুড়িমা? ওরা যখন জানবে তোমার হাত থেকে আমি পালিয়ে গেছি. . .

দুই পর্তুগীজ দস্যু এগিয়ে আসছে। একজনের হাতে বন্দুক। একটু আগেই সে নৌকোর কয়েকজন অবাধ্য বন্দীকে গুলি করে মেরেছে। সে-ই বোধহয় নৃশংস গেব্রিয়েল পেড্রো।

তারা দেখতে পেয়েছে ওদের। দুর্বোধ্য চিৎকারে বুড়িকে কি যেন হুকুম করলো। বুড়ি চেঁচিয়ে উঠে বললো—সৌদামিনী, পালিয়ে যা, আর সময় নেই।

—দুম. . . বন্দুকের একটা গুলি এসে সরাসরি বিদ্ধ হয় বুড়ির দেহে। লুটিয়ে পড়ে জীর্ণ দেহটা। আর একটা গুলি বেরিয়ে যায় ঝুমার কানের পাশ দিয়ে।

আর দেরি না করে ঝুমা লাফিয়ে পড়ে দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীটা যেন টলে উঠলো। ফুৎকারে কে যেন নিভিয়ে দিল আকাশের চাঁদটাকে!

পাঁচ

ঝুমাকে মাঝরাত্তির নাগাদ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল

দুর্গের একধারে লতাগুল্ম আর গাছগাছালির ওপর। তখন সে চেতনাহীন।

ওর দেহটা মোটর লঞ্চে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে জ্ঞান ফেরানো হলো।

সুস্থ হবার পরও অনেকটা সময় লেগেছিল ঝুমার স্বাভাবিক হতে। কিন্তু জঙ্গল মহলের ভাঙা দুর্গের মধ্যে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্পর্কে কেউই একমত হতে পারেনি।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ঝুমার একটা দুঃস্বপ্ন বলেই সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা হয়েছিল—কিন্তু সেখানেও একটা প্রশ্ন থেকে গেছে।

তপন চৌধুরীর কাছে জানা গেল—পর্তুগীজ জলদস্যু গেব্রিয়েল পেড্রোর নাম ইতিহাসে না থাকলেও স্থানীয় মহলে পরিচিত। আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে দক্ষিণ বঙ্গের অনেক অঞ্চল তার অত্যাচারে জনশূন্য হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, আরও অনুসন্ধান করে জানা গেল, যে পরিত্যক্ত ভাঙা দুর্গটা সেদিন ওরা খুঁজে পেয়েছিল, চারশো বছর পূর্বে সত্যিই সেটা ছিল পর্তুগীজ জলদস্যু পেড্রোর একটা ঘাঁটি। কিংবদন্তি বলে, দুর্গটা সে মুঘলদের হাত থেকেই কিছুদিনের জন্যে কেড়ে নিয়েছিল।

কিন্তু বারো বছরের মেয়ে ঝুমা—তার পক্ষে জানা কিভাবে সম্ভব হলো চারশো বছর পূর্বের এই স্থানীয় কিংবদন্তি? এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঝুমা আজও ঘুমের মধ্যে কোনো-কোনোদিন দেখতে পায় সপ্তগ্রামের সেই দ্বাদশী কিশোরীটিকে, হার্মাদদের হাতে বন্দী হবার সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর জঙ্গল মহলের দুর্গটাকে। আতঙ্কে ঘুম ভেঙে জড়িয়ে ধরে মাকে, বলে—মা, তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, কোথাও না. . . .।

কপালে চুমু দিয়ে মা ঝুমাকে তখন টেনে নেন বুকের মধ্যে আরও নিবিড় করে।

www.arisumu.com

চোর তাড়াতে ভূত

শেখর বসু

মধুসূদনবাবু চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে মনের মতো একটা বাড়ি বানালেন। দোতলা বাড়ি, ওপরে নীচে দুটো ফ্ল্যাট, সামনে এক চিলতে বাগান। কৃপণ হিসেবে মধুসূদনবাবুর দারুণ বদনাম ছিল, কিন্তু বাড়ি তৈরির ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য দেখাননি। সারা জীবনের জমানো টাকা দুহাতে খরচা করে ছবির মতো বাড়ি বানিয়েছেন। বাড়িটা যে দেখে সেই তারিফ করে, হ্যাঁ, রুচি আছে বটে গৃহস্বামীর।

মধুসূদনবাবুর ছেলে-মেয়ে নেই, কর্তা-গিন্নির সংসার। তবে খুবই সুখের সংসার। আগে কর্তা-গিন্নির মধ্যে সামান্য চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাঁটি হত, কিন্তু গিন্নি বদ্ধ কালা হয়ে যাওয়ার পরে সে অশান্তিটুকুও হয় না। একহাতে তালি বাজে না, এক গলায় ঝগড়া হয় না, সুতরাং ওঁদের সংসারে এখন কোনোরকম গোলমাল নেই।

বাড়ি তৈরির পেছনে মধুসূদনবাবুর একটা সোজা হিসেব ছিল। দোতলায় থাকবে কর্তা-গিন্নি, আর একতলাটা ভাড়া। ভাড়া আর ব্যাঙ্কের সুদের টাকায় দুজনের সংসার দিব্যি হেসে-খেলে চলে যাবে।

অঙ্কের নিয়মে সব কিছুই হল, কিন্তু কোনো ভাড়াটেই মধুসূদনবাবুর বাড়িতে একমাসের বেশী টিকতে পারল না। শেষে বাড়িটার দুর্নাম হয়ে গেল। অত সুন্দর বাড়িতে ভাড়াটে আর আসতে চায় না।

মধুসূদনবাবুর কয়েকজন হিতৈষী ছিলেন, তাঁরা ওঁকে নানাভাবে বোঝালেন। কিন্তু মধুসূদনবাবু ওঁর যুক্তি থেকে এক চুলও সরে এলেন না। সব পরামর্শের উত্তরেই এক কথা ঃ বাড়িটা মশাই আমার রক্তজল-করা পয়সায় তৈরি। এ-বাড়ির প্রতিটি জিনিস আমার খাটনির টাকায় কেনা। আমার সারা জীবনের সব সঞ্চয় বাড়ির পেছনে ঢেলেছি, আর সে বাড়ি আমি দেখাশোনা করব না।

হিতৈষীদের একজন তখন চটে উঠে বললেন ঃ আপনি তাহলে আপনার বাড়িটা চোরদের দিন। চোরেরা রাত্তিরে চুরি করার জন্যে বেরিয়ে যাবে, সকালে ফিরে এসে ঘুমোবে! ওদের কোনো অসুবিধে হবে না আপনার বাড়িতে থাকতে।

কথাটায় বেশ কষ্ট পেলেন মধুসূদনবাবু, কিন্তু উনি কোনো উত্তর দিলেন না। বাড়ি ফিরে এসে মনের দুঃখে গিন্নিকে বললেন, "আচ্ছা, তুমিই বলো, আমি কোনো অন্যায় করেছি? এদিকে যা চোরের উৎপাত, রাত্তিরবেলায় বাড়ি পাহারা না দিলে চলে? চোররা যদি দেখে গৃহস্থ জেগে আছে তারা চুরি করার জন্যে বাড়িতে ঢোকে না। কিন্তু আমি যে জেগে আছি, চোররা সেটা জানবে কী করে? আমি তাই জানাবার জন্যে এক ঘণ্টা অন্তর খড়ম পায়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করি; ইচ্ছে করে জোরে-জোরে কাশি, তারপর একটা লাঠি দিয়ে জানালার

ক্রি ক্রি-রিং ক্রি-রিং ক্রি-রিং করে শব্দ করি। এটা কি দোষের? চোরের হাত থেকে আমি বাড়ির সবাইকে বাঁচিয়েছি অথচ ভাড়াটেরা আমাকেই গালাগালি দিয়েছে। আমার জন্যই নাকি ওরা রাতের পর রাত ঘুমোতে পারেনি, আমার জন্যেই নাকি ওরা বাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। তুমিই বলো, আমার দোষটা কোথায়?''

সব কথা শেষ হলে গিন্নি বললেন, ''এর জন্যে তুমি মন খারাপ কোরো না। তিনটে পেয়ারাগাছ নষ্ট হয়েছে তো হয়েছে, তুমি এবার তিনটের বদলে ছটা পেয়ারাগাছ লাগাও।''

কী কথার কী উত্তর! মধুসূদনবাবু কপাল চাপড়ে বললেন, ''কালার মরণ! একটা কথা যদি কানে যায়।'' তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

এইভাবেই দিন গড়াতে লাগল। মাসের পর মাস কেটে গেল কিন্তু মধুসূদনবাবুর বাড়িতে আর কোনো ভাড়াটে এল না। তার বদলে যাঁরা এলেন তাঁরা সাধারণতঃ পোড়ো বাড়িতে থাকেন। মধুসূদনবাবুর একতলার ফ্লাটে বিনা ভাড়ার বাসিন্দা হলেন দুজন ভূত। এঁরা খুব পণ্ডিত, ভূতদের সমাজে সবাই এঁদের খুব মান্যিগণ্যি করে। পড়াশুনার সুবিধার জন্যে এঁরা একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিলেন, হঠাৎ এই ফ্লাটটা পেয়ে গিয়ে ওঁদের আনন্দ আর ধরে না।

সাজানোগোছানো ফ্লাট, সব ঘরে দেয়াল-আলমারি। পণ্ডিত ভূত দুজন সেইসব আলমারিতে নিজেদের বইপত্র গুছিয়ে ফেললেন চটপট। এঁরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। বিষয়টি হল 'মানুষদের ভৌতিক ব্যবহার'। অনেক মানুষের কাণ্ডকারখানা অবিকল চ্যাংড়া ভূতদের মতো। এটা কেন হয়? এর পেছনে কোন ধরনের মানসিকতা কাজ করে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রাত একটু গভীর হলে গবেষক ভূত দুজন পড়াশোনা করতে বসে গেলেন। চারদিক অসম্ভব নির্জন। লেখাপড়ার কাজ তরতর করে এগোতে লাগল। হঠাৎ দুজন ভূতই চমকে উঠলেন একসঙ্গে। মাথার ওপর খট-খট-খটাৎ। কী ব্যাপার? পাড়ার মস্তান ভূতেরা কি ওঁদের বিরক্ত করতে এসেছে! কিছুক্ষণ মন দিয়ে শব্দটা শোনার পর ওঁরা বুঝতে পারলেন, এ শব্দ ভূতের নয়। দোতলায় মানুষ শব্দ করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত তো!

কোনো শব্দ যদি একভাবে একটানা অনেকক্ষণ ধরে চলে, আস্তে আস্তে সেটা কানে সয়ে যায়। গবেষকরা আবার তাঁদের কাজে মন বসালেন কোনোমতে। কিন্তু কাজ এগোতে পারল না। হঠাৎ খক্-খক্ করে প্রচণ্ড জোরে কাশির শব্দ উঠল। কাশি আর থামতেই চায় না। নিশুতি রাতে বিকট কাশির দমকে সারা বাড়িটা প্রায় কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। শব্দটা ভেসে আসছে দোতলা থেকে!

এইরকম বিকট শব্দের মধ্যে কি কাজে মন বসানো যায়? কিন্তু বসাতেই হবে, গবেষণার মতো কাজে মন না বসিয়ে উপায় নেই। ভূত দুজন আবার নিজেদের কাগজপত্তরের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। কিছুক্ষণ বাদে ভয়ঙ্কর একটা শব্দে ওঁদের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। হাতের ধাক্কায় দরকারী কাগজপত্র ছড়িয়ে পড়লে মেঝেয়। এটা আবার কিসের শব্দ! ক্রি-রিং ক্রি-রিং ঘঙ, ক্রি-রিং, ক্রি-রিং ঘঙ। দোতলার ওই বিদঘুটে শব্দটা সারা পাড়া প্রায় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

এত গোলমালের মধ্যে কাজকর্ম করা তো দূরের কথা, ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকাও অসম্ভব। ব্যাপারটা কী দেখার জন্যে গবেষক ভূত দুজন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে শাঁ করে দোতলার ঘরে চলে এলেন। এখানে এসে তাঁদের চমকাতে হল আর একবার। মধুসূদনবাবুর পরনে ধুতি, গায়ে ফতুয়ার মতো একটা জামা, পায়ে খড়ম; তিনি একমনে লাঠির ছড় টেনে যাচ্ছিলেন জানলার গ্রিলে।

গবেষক ভূত দুজনের মধ্যে একজন মাস্টারমশাই আর একজন ছাত্র। মাস্টারমশাই ফিসফিস করে ছাত্রকে বললেন, ''আরে! এ লোকটা তো আমাদের গবেষণার কাজে লেগে যাবে। একেই বলে মানুষদের ভৌতিক আচরণ। কিন্তু লোকটা এরকম করছে কেন?''

কারণটা জানার জন্য ভূত দুজন মানুষের চেহারা ধরে মধুসূদনবাবুর সামনে গিয়ে হাজির হলেন। মাঝরাত্তিরে হঠাৎ ঘরের মধ্যে লোক দেখে মধুসূদনবাবু 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই মাস্টারমশাই ভূত বলে উঠলেন, ''আমরা চোর নই, ভূত, আপনি শুধু শুধু ভয় পাবেন না।''

মধুসূদনবাবু ভূতের চাইতে চোরকে অনেক বেশি ভয়

পান। ভূতের কথায় সামান্য আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু মন থেকে সন্দেহ পুরোপুরি দূর হল না। চোখ ছোট করে বললেন, "আপনারা যে ভূত তার প্রমাণ কী? আপনারা কি নিজেদের মাথা নিজেরাই চিবিয়ে খেতে পারেন?"

এই ধরনের বিশ্রী একটা প্রমাণ চাওয়ার জন্যে গবেষক ভূত দুজন আহত হলেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর মাস্টারমশাই ভূত বললেন, "আমরা লেখাপড়া নিয়ে থাকি, চ্যাংড়া ভূতদের মতো ওসব কাণ্ডকারখানা দেখানো সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। তবে আপনি যখন প্রমাণ চাইছেন, আমরা একটু ভূতের নাচ দেখাচ্ছি। " এই না বলে ভূত দুজন নাচ জুড়ে দিল। বিশুদ্ধ ভৌতিক নাচ। মাথা নীচে, পা ওপরে। ভূতরা কখনো এপাশে কখনো ওপাশে, কখনো জানলায় কখনো সিলিংয়ে।

মধুসূদনবাবু ইদানীং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছেন। কালা গিন্নির সঙ্গে কথা বলে সুখ নেই। এই অবস্থায় ভূতের নাচ দেখে অনেকদিন পরে বেশ মজা পেলেন তিনি।

নাচার ফলে দুজনেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার পরে মাস্টারমশাই ভূত বললেন, "আমরা ভূত, এবার বিশ্বাস হয়েছে তো?"

মধুসূদনবাবু অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এবার দয়া করে বলুন আপনাদের কী কাজে লাগতে পারি আমি।"

গবেষক দুজন ঘোরপ্যাঁচের ভূত নন। সাদা, সরল ভূত। এখানে আসার উদ্দেশ্য অকপটে বলার পরে মাস্টারমশাই ভূত বললেন, "আপনার আচরণ ভূতের মতো। আপনি আমাদের গবেষণার কাজে একটু সাহায্য করুন। এর বিনিময়ে আপনি যা চান আমরা তাই দেব।"

মধুসূদনবাবু বিষয়ী মানুষ। ভূতের কথায় ওঁর গোঁফের ফাঁকে একটা ধূর্ত হাসি খেলে গেল। হাসতে হাসতে বললেন, "এ আর কী এমন বড় কথা। তবে কাজ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা যদি আমার ছোট্ট একটা উপকার করেন—।"

"কী উপকার?"

"রাত্তিরবেলায় চোরের ভয়ে ঘুমোতে পারি না, আপনারা তখন যদি একটু পাহারা দেন—।"

এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন গবেষক ভূত দুজন।

মাসখানেক বাদে বিস্তর চেষ্টা করে বাড়িতে আবার ভাড়াটে বসালেন মধুসূদনবাবু। একতলার একটি ঘর বাদে বাকি ঘরগুলোয় ভাড়াটে বসে গেল। ওই ঘরটা তালা দেওয়া থাকে সব সময়। মাঝে মাঝে রাত্তিরবেলায় ওই ঘরে ঢুকে একা-একা কথা বলেন মধুসূদনবাবু।

ভাড়াটেরা ভাবে, ভীমরতি ধরেছে বুড়োর। তা ধরুক, আগের মতো আর সারা রাত্তির ধরে বিদঘুটে সব শব্দ করে না তো। নিরুপদ্রবে এখন রাত কেটে যায় এ-বাড়িতে।

আসল কথাটা কিন্তু মধুসূদনবাবু কারও কাছে ফাঁস করেননি। বদ্ধ ঘরে ভূত দুজন গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন পুরোদমে। বিরাট কাজ, এ-কাজটা শেষ হতে নাকি আরো দশ বছর লাগবে। মধুসূদনবাবু নিশ্চিন্ত। এক ঘুমে লম্বা-লম্বা রাত কাবার করে দিচ্ছেন। কারণ, তিনি খুব ভালভাবেই জানেন, আগামী দশ বছরের মধ্যে কোনো চোর যদি ভুল করেও এ-বাড়িতে ঢুকে পড়ে, আস্ত ঘাড় নিয়ে তাকে আর ফিরে যেতে হবে না।

হাইকোর্টের ভূত

ছন্দা বাগচি

আমার দাদু খুব ব্যস্ত মানুষ। অনেক দিন পরে উনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন। তখন খুব মজা হত। মা অনেক রকম রান্না-বান্না করেন। বাবা তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। কোনো অন্যায় করলে বকুনি খাওয়ার ভয় নেই। সবচেয়ে মজা হল, সারাদিন দাদু আমাদের সাথে লুডো দাবা খেলেন, জোকস্ বলেন, আর দেশবিদেশের রকম রকম গল্প বলেন। দাদুর স্পেশাল গল্প বলতে ছিল হাইকোর্টের গল্প। আমার দাদু হচ্ছেন হাইকোর্টের নামডাকওলা উকিল। ওঁর জীবনের পাশে প্রতিদিন ঘটে চলেছে অসংখ্য ঘটনা। তারই কিছু কিছু আমাদের বলেন।

দাদুকে আমরা একদিন ধরে বসলাম, হাইকোর্ট দেখব। আমরা মানে—আমি, টিঙ্কু, আমার ছোট বোন আর মামাতো ভাই তোতোন। একদিন চললাম দাদুর সঙ্গে হাইকোর্ট দেখতে। বাইরে থেকে আকাশচুম্বী তীক্ষ্ণ বর্শাফলকের চূড়াটা কতবার দেখেছি। এবার দেখব ওর ভেতরের অলিগলি। দাদু বললেন—'এই ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের লাল প্রাসাদটিতে সেই কবে থেকে কত বিচিত্র কাহিনী ঘটে চলেছে। অথচ কতটুকু স্মৃতিই ধরে রাখতে পেরেছি। চলো, আগে সব দেখাই। তারপর বাড়ি ফিরে একটা চমক লাগানো গল্প বলব।'

এই বাড়িটার নাম টেম্পল চেম্বার। সেই কতকাল আগে সাহেবদের আমলে তৈরি। এর উল্টো দিকের বাড়িটা হাইকোর্ট। তোতোন বলে—'এর নাম টেম্পল চেম্বার হল কেন?' দাদু হেসে বলেন—'বলছি। এই যে মস্ত বড় হলদে বাড়িটা, কেমন খোপ খোপ বোলতার চাকের মত দেখছ, এর এক একটি খোপ এক একটি এ্যাটর্নির বাসা। এখানে দিনদুপুরেও আলো ঢোকে না। এক একটা ঘরে বড় বড় পার্টিশন। মস্ত বড় বড় টেবিল ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। এছাড়াও ঘরে ঘরে ছোট বড় আরও কত যে টেবিল-চেয়ার, আলমারি, কাগজপত্র, টাইপ মেসিন। আর আছে দেয়াল ঘিরে ওপর থেকে নিচে র‍্যাকে ঢাকা অসংখ্য মোটা মোটা বই। এমনই একটা ঘরের সুইংডোর ঠেলে দাদু বললেন—'এরই নাম চেম্বার। এক একটা চেম্বার হল এক একটা ফার্ম। এখানে বসেই সেই মান্ধাতার আমল থেকে জীবন নাটকের অসংখ্য কাহিনীর হিসাব-নিকাশের খসড়া তৈরি হচ্ছে।' এরই উল্টো দিকে হাইকোর্ট। কালো কোট পরা আর কালো গাউন গায়ে অসংখ্য উকিল, ব্যারিস্টার, এ্যাটর্নি যাতায়াত করছে। হাইকোর্টের বিশালত্ব বলে বোঝান যায় না। অসংখ্য অলি-গলি খাঁচ থেকে ওপরে পেঁচিয়ে উঠে গেছে উঁচু উঁচু সিঁড়ি। একতলা, দোতলা, তিনতলা জুড়ে বড় বড় কোর্টরুম। আর দোতলা, তেতলা সিঁড়ির বাঁকে বড় বড় মস্ত মূর্তি আর ছবি। এমন নিথর তাকিয়ে থাকে,

গা ছমছম করে। সব জায়গায় নানা জাতির স্ত্রী-পুরুষ গিস্‌গিস করছে। সেদিন দাদুর সাথে হাইকোর্ট দেখে যতখানি চমক খেয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশী চম্‌কেছিলাম দাদুর সেই গা-ছমছম গল্প শুনে।

দাদু বললেন—'এই যে জনারণ্য দেখলি, কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানিস? লাখ টাকা ঘুষ দিলেও একজন দারোয়ান পর্য্যন্ত হাইকোর্টে সন্ধের পর যাবে না। কেন জানিস?' আমরা বোকার মত তাকিয়ে আছি। দাদু বললেন—'ভূতের ভয়ে। হ্যাঁরে, সন্ধে হলেই হাইকোর্টে ভূত ঘুরে বেড়ায়। আর জীবন্ত কাউকে পেলেই ঘাড় মট্‌কে দেয়।' আমরা একসঙ্গে আঁতকে উঠি। দাদু বলেন—'লোকের ধারণা, অনেক সময় অন্যায় বিচারেও প্রাণদণ্ড হয়। আবার দুষ্টু ভয়ঙ্কর লোকেদের ফাঁসির সাজা হয়। সেইসব অতৃপ্ত আত্মারা নাকি প্রতিশোধের আশায় ঘুরে বেড়ায়। এমনি একটা আমার জানা ঘটনা বলছি।' দাদু বললেন—

'আমার তখন যুবক বয়স। হাইকোর্টে সবে জয়েন করেছি। এসেই শুনলাম এবং প্রত্যক্ষও করলাম সন্ধে হবার পর কেউ থাকতে রাজি নয়। তখন ইংরেজ আমল। এক ইংরেজ মহিলা টাইপিস্ট আমাদের ফার্মে কাজ করতেন। প্রতিদিন কাজের শেষে ওঁর স্বামী গাড়ি করে নিয়ে যেতেন। একদিন ব্যতিক্রম হল। কোনো কারণে ভদ্রমহিলা আগেই চলে গেলেন। আমি সন্ধের আগেই বাড়ি চলে আসি। পরদিন কোর্টে গিয়েই শুনি মেমসাহেবের স্বামীকে মৃত অবস্থায় ভেতরের করিডরে পাওয়া গেছে। জানা গেল, উনি জানতেন না মেমসাহেব চলে গেছেন। সবার বারণ সত্ত্বেও স্ত্রীর খোঁজে রোজকার মত ভেতরে ঢোকেন। দারোয়ান চলে যায়। তারপর কি হয় কেউ জানে না। মৃত্যুর কারণও জানা যায়নি তদন্তে। শুধু চোখ দুটো স্থির তাকিয়ে ছিল।

এরপর একদিন আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। সারাদিন চেম্বারে বসে প্রচুর কাজ করেছি। কখন সন্ধে হয়েছে ঘড়ি দেখিনি। প্রায় সবাই চলে গেছে। দু'একজন যারা ছিল, আমাকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে বলে চলে গেল। আমিও নেমে এসেছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল অত্যন্ত জরুরী একটি ফাইল বার লাইব্রেরিতে ফেলে এসেছি। পরদিন কেস আছে। আমাকে ফিরতেই হল। ভেতরে অদ্ভুত নিঃশব্দ। জলদি পায়ে ছুটতে ছুটতে প্রায় অর্ধেক দোতলা সিঁড়ি পেরিয়েছি, ঠিক সেই সময়েই মনে হল আর কেউ ঠিক ওভাবেই সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। কিছুদূর উঠে আমি থামলাম, শব্দও থামল। হাঁটছি, পেছনে স্পষ্ট শব্দ শুনতে পাচ্ছি, খট্ খট্ জুতোর শব্দ। ভয়ে পেছনে তাকাবার মত ক্ষমতা লোপ পেয়ে যাচ্ছে। তবুও যুবক বয়স, বুকে বল হারাতে দিলাম না। অত্যন্ত দ্রুত ঢুকে ফাইল নিয়ে তিনতলা থেকে প্রায় লাফিয়ে নামতে লাগলাম। পেছনে জুতোর শব্দও তাড়া করে নামছে। করিডর পেরিয়ে আসছি, শব্দও ছুটছে। থামছি, শব্দ থামছে। হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। দাঁড়িয়ে একটানে জুতো খুলে মোজা পায়ে হাঁটতে লাগলাম। পেছনে দৌড়ে আসা কেউ থেমে গেল। আমি তখন দর দর করে ঘামছি। তবুও জুতো আবার পরে শান্ত মনে হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে এলাম।'

দাদুর বলা শেষ হয়েছে কি হয়নি, টিঙ্কু চেঁচিয়ে উঠল—'ভূত তোমার পিছু নিল না! বেরিয়ে আসতে দিল জ্যান্ত?' দাদু অল্প হেসে বললেন—'ভূত থাকলে দিত কিনা জানি না।' আমরা এবার একসঙ্গে বলে উঠি—'তবে যে তোমার পিছু নিল!' দাদু বললেন—'কেউ আমার পিছু নেয়নি। আসলে তোমরা দেখেছ তো, ভেতরের ছাদগুলো কেমন ফাঁপা হয়ে মাটি থেকে কত উঁচুতে! হলগুলোও বিশাল বিশাল। সবই ফাঁকা পড়ে থাকে। তাই চলার সময় শব্দের প্রতিধ্বনি জাগায়। মনে হয় কেউ পেছনে চলছে। তারপর অত জন কোলাহল থেকে অমন নিস্তব্ধতা, বড় বড় মূর্তি, অল্প ফিকে আলো, সব মিলিয়ে ভৌতিক পরিবেশে মন দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই তো জুতো খুলতেই ভূত হাওয়া হয়ে গেল। ভাগ্যিস মাথা ঘুরে সিঁড়ি থেকে পড়ে যাইনি। তাহলেই সবাই বলত, ভূতের কাণ্ড। আমিও হয়ত তাই ভাবতাম।

—'কিন্তু সাহেব যে মারা গেলেন?'

দাদু বললেন—'ঠিক আগে যা বললাম ওই অবস্থা। ভূতের মাথায় এই অবস্থায় আলো-ছায়াতে ভূত দেখে। তিনি নির্ঘাৎ সেই অবস্থায় হার্টফেল করেছিলেন। তাইতো বলি, বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখবে। তবেই বিপদ কেটে যাবে।'

সেই লোকটা

শিশিরকুমার মজুমদার

বৃষ্টি মাথায় করে বেগমপুর স্টেশনে পৌঁছে শুনলাম ট্রেনের অনেক দেরি। নতুন টাইম টেবল মতে সময় প্রায় ঘন্টা দুইয়ের মত পিছিয়ে গিয়েছে। অগত্যা টিকিট নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং-রুমে হাজির হলাম।

বাইরে তখন ঝোড়ো হাওয়ায় গাছপালার মাথাগুলো আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। পথে লোকচলাচল নেই। স্টেশনের সামনের স্ট্যান্ডে কোন রিক্সা বা গাড়িও নেই।

নোংরা টানা লম্বা ওয়েটিং-রুমের এখানে ওখানে অল্প কজন মানুষ জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে। এক নজরে দেখেই বুঝলাম, তারা সবাই হা-ঘরের দল। যাত্রী বলতে আমি একাই।

একটা বেঞ্চ হাতের কাগজটা দিয়ে ঝেড়ে বসলাম। কোন কাজ না থাকায়, কাগজটাই মেলে ধরে অন্ধকারের মাঝে পড়তে চেষ্টা করতে লাগলাম। সারাদিন কাজের ঝঞ্ঝাটে ওটা পড়ার সময় পাইনি।

দু'একটা বড় হেডিং-এ চোখ বোলাতেই আলস্যে শরীর ভেঙ্গে এল। বার দুই হাই উঠল। ভীষণ ঘুম পেতে লাগল। নড়ে চড়ে বসে আবার কাগজটা ভাল করে মেলে যেই ধরতে যাব, প্ল্যাটফর্মের দিক থেকে পিঠ কুঁজো একজন বুড়ো ঢুকল ভিতরে। সেও যে ওই হা-ঘরের দলেরই একজন তাতে সন্দেহ ছিল না।

লোকটা সোজা এসে বসে পড়ল আমার পাশে। ওর পরনের কাপড় ছেঁড়া ময়লা। পায়ের প্লাস্টিকের চপ্পলও তেমনি তাপ্পিমারা। আধ পেটা খাওয়া দেহ, চোখ কোটরে বসা।

বসেই লোকটা কিন্তু আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। যেন কিছু বলতে চায়।

ওর সাথে কথা বলার ইচ্ছা আমার ছিল না। তাই কাগজে মুখ ঢাকলাম। আড়াল পড়াতে আর কিছু বুঝতে পারলাম না ও কি করছে। মনে কিন্তু কেমন অস্বস্তি ভাব এল। ও আপদ চারদিকে এত জায়গা থাকতে এখানেই এসে বসল কেন? কি ওর উদ্দেশ্য? কি ও আমাকে বলতে চায়? আমাকে বলার মত কি কথা ওর থাকতে পারে? নিশ্চয়ই ওর কোন বদ মতলব আছে। মতলব ছাড়া কি কেউ এত রাতে এমনভাবে পাশে এসে বসে?

খবরের কাগজের লেখাগুলো অন্ধকারে আরও এলোমেলো হয়ে গেল। একটা চিন্তা হল, লোকটা কি এখনও ওর কোটরে বসা জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দিয়ে তেমনিভাবেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে?

মনে এসব চিন্তা এলেও হাসি পেল আমার। এসব কি আবোল তাবোল ভাবছি আমি। এই ওয়েটিং-রুম আমার কেনা জায়গা নয়। এখানে যে কেউ বসতে পারে, যেখানে খুশি। তা নিয়ে আমার ভাববার কি আছে? তাছাড়া কারও কোটরে বসা চোখ হলেই তো আর সে

বদলোক হয় না। আর এ তো আধপেটা খাওয়া কম জোর মানুষ। আমার সাথে গায়ের জোরে পারবেই না। তবে কেন এত ভাবছি আমি?

কাগজ নামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম, কি সর্বনাশ! লোকটা তার সেই আতঙ্ক-ভরা ভীষণ দৃষ্টি মেলে তেমনিভাবেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধ হয় ওর চোখের পলকও পড়েনি তখন থেকে। চোখে চোখ পড়তেও কোন ভাবান্তর হল না।

আমার মনের মধ্যে কেমন যেন ঝড় উঠল। তাড়াতাড়ি আবার কাগজের আড়াল টানলাম দুজনের মাঝে।

লোকটা কি পাগল? নইলে ওর চোখে অমন ভয়ঙ্কর দৃষ্টি কেন?

একটা পাগলের সাথে এমন করে পাশাপাশি তো বসে থাকা যাবে না। আর উচিতও নয়। কে বলতে পারে কখন কি করে বসবে।

উঠে চলে যাব অন্য বেঞ্চে?

নাকি লোকটা বদ। ধমকে দিলেই টিট হয়ে যাবে।

যা ওর চেহারা আর বয়স, তাতে তো ওকে ভয় করার কোন কারণ নেই।

পরক্ষণেই মনে হল কি হবে ধমক দিয়ে। ঝামেলা বাড়বে বই তাতে হয়তো কমবে না। তার থেকে অন্য কোন বেঞ্চে গিয়ে বসাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কাগজ মুড়ে নীচু হয়ে পায়ের কাছে রাখা এ্যাটাচিটা ধরলাম। সোজা হয়ে শেষ বারের মত ওর দিকে তাকিয়ে সত্যিই আতঙ্কে আমি কেঁপে উঠলাম। লোকটা তেমন-ভাবেই তাকিয়ে আছে। ওর দৃষ্টিতে প্রচণ্ড জিঘাংসা মেশানো। আমি মনে মনে ওকে অপছন্দ করছি তা যেন ও বুঝতে পেরেছে। তাই ওর রাগ।

বড় বড় পা ফেলে আমি অন্য প্রান্তের একটা বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়লাম।

বাইরে তখনো দুর্যোগ সমানে চলেছে। ওয়েটিং-রুমে তখনও আমি একাই যাত্রী।

ভয়ঙ্কর লোকটা যাত্রী নয়। অন্য আর নতুন কোন যাত্রীও যে এই দুর্যোগে আসবে তাও মনে হয় না। এখন যদি ও আবার উঠে এসে আমার পাশে বসে, তবে?

বেশ অস্বস্তি নিয়ে বার বার আমি ওর দিকে তাকাতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম ও আর আমার কথা মনে রাখেনি। বেঞ্চে দু'পা তুলে দিয়ে ও দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছে। বোধ হয় অমন করেই ও একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়।

কি জানি, হয়ত ওই বেঞ্চটাকেই ও বরাবর ওর রাতের আস্তানা বানিয়েছে। আজ আমাকে তা দখল করতে দেখেই রাগে অমন করছিল। এখন নিজের অধিকার ফিরে পেয়ে খুশি। আর নড়াচড়া করতে দেখলাম না ওকে। একটু সাহস ফিরে এল আমার। কি ভয়ই না পেয়েছি মিছিমিছি!

আবার কাগজটা খুলে ধরে ওয়েটিং-রুমের টিমটিমে আলোর অন্ধকারে পড়তে চেষ্টা করলাম।

এক জায়গায় দেখলাম, লেখা আছে, দিল্লীতে সংসদে রেল যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা নিয়ে ঘোর তর্কযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বিরোধীরা অনেক নজির তুলে রেল ভ্রমণ যে আজকাল কত বিপজ্জনক তা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সরকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

খবর পড়ে আমার হাসি পেল। সবই হয়ত হবে, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, ভীষণ ঝড়-জলের মাঝে, রাতের নির্জনতার সুযোগ নিয়ে যদি ওই পাগলটা আমাকে আক্রমণ করে, তবে কে আমাকে সাহায্য করবে? ওই ঘুমন্ত হা ঘরের দল? কখনও না। পরের ঝামেলায় মাথা ঘামাবার মত মানসিকতা নিয়ে ওরা জন্মায়নি। ভাগ্যে যা আছে আমার তাই হবে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম চিন্তায়। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, কি আশ্চর্য, লোকটা ওখানে নেই। নেই ঘরের অন্য কোন খানেও! গেল কোথায় ও? তবে কি ও আবার প্ল্যাটফর্মের দিকেই চলে গিয়েছে? বাইরে দুর্যোগ। তা হোক, এ তবুও ভাল হল, নইলে মনে ভয় আর সন্দেহ নিয়ে বাকী সময়টুকু আমাকে কি অস্বস্তির মাঝেই না কাটাতে হত!

খুশি মনে কাগজটা তুলে সামনে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠলাম। আমার আর সামনের দেওয়ালের মাঝখানে বসে আছে লোকটা। উঃ, সে কি চোখের দৃষ্টি!

আতঙ্কে আমার মুখ দিয়ে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বার হয়ে এল।

কে ও? কি চায় ও? অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেন ও? আমি তো ওর কোন ক্ষতি করিনি। আমি তো ওকে চিনিই না। তবে?

হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম আমি। দরজা দিয়ে বাইরে বার হবার সময় স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কে যেন বীভৎস এক অশরীরী গলায় বলল, যাও। আমিও আসছি। পিছনে।

অমন ভয়ঙ্কর কর্কশ গলা কি কখন কোন মানুষের হতে পারে? এ যেন ওর দেহের ভিতর থেকে আর একজন কেউ জোর করে কথা বলছে। কে ও, কে ও!

আমি ভয়ে ছুটতে আরম্ভ করলাম। বাইরে ওদিকের ঘরে স্টেশনের লোকজনরা আছেন। সে ঘরের পাশে গিয়ে থামলাম। এখন আমাকে লোকজনের মাঝেই থাকতে হবে। এক মুহূর্তও আর ওই লোকটার সাথে থাকা উচিত হবে না। ভিজে সারা গা দিয়ে আমার জল ঝরছিল। রুমাল বার করে হাত মাথা মুছতে লাগলাম। কিন্তু কে ওই লোকটা?

হঠাৎ মনে হল সর্বনাশ করে বসে আছি আমি। আতঙ্কে ভয়ে পালিয়ে আসার সময় সঙ্গের এ্যাটাচিটা আনাই হয়নি। ওতেই আছে আমার যথাসর্বস্ব, আজ বিকালে পাওয়া কন্ট্র্যাকটারি কাজের টাকা। অনেক টাকা, ওই টাকার জন্যই তো এখানে এসেছি আমি। এ্যাটাচিটা এখনও পড়ে আছে বেঞ্চের পাশে, ওই লোকটার সেই ভয়ঙ্কর দুটো চোখের সামনে!

তবে কি লোকটা বদ! ও অনেকক্ষণ থেকেই আমার পিছু নিয়েছে সব কিছু জেনে। ফন্দি এঁটে ভয় দেখানর ফাঁদ পেতেছে, আর বোকার মত আমি তাতে জড়িয়ে পড়েছি। টাকা নিয়ে এখন ও পালাবে।

এ কি বোকামি আমি করলাম! ওয়েটিং-রুমে তো আরও অনেক হা-ঘরে মানুষজন ছিল। তাদের সামনে ও আমার কি করতে পারত? কেন এই সহজ কথাটা মনে হল না আমার? চোখ পাকিয়ে অমন করে রাতের অন্ধকারে তো অনেকেই ভয় দেখাতে পারে। ভেন্টিলোকুইজম জানলে অমন গলার স্বরও বদলান যায়। এত কথা জেনেও কেন আমি এমন বোকামি করলাম?

ফিরে গিয়ে আর কি ওর দেখা পাব? এমন করে ভয় দেখাতে পারে যে, সে তো চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। ওই এ্যাটাচি কি আর আমি ফিরে পাব? রাগে দুঃখে নিজের গালেই চড় মারতে ইচ্ছা হল।

বৃষ্টিতে ভিজে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম আবার ওয়েটিং-রুমের দরজার সামনে। এক নজরে ঘরের ভিতর দেখেই বুঝলাম, আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। কোথাও লোকটা নেই, নেই আমার এ্যাটাচিটাও।

আমার চিৎকার চেঁচামেচিতে, হা ঘরের দল উঠে বসল। তারা তো আমার কথা শুনে অবাক! এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। হয় ওরা সত্যিই ঘুমাচ্ছিল, না হয় তো ওরাও এই ষড়যন্ত্রের শরিক।

একজন তো বলেই বসল, বাবু, আমি তো অনেকক্ষণ জেগে আছি। কই, আপনাকে তো এখানে আসতে দেখিনি। আপনি অন্য কোথাও বসে ছিলেন। সেখানে দেখুন গিয়ে।

বলে কি লোকটা! বেশ বুঝতে পারলাম আমি এদের শিকার হয়েছি। দল বেঁধে এরা আমার সর্বনাশ করেছে। রাগে দুঃখে আমি তখন পুলিশ পুলিশ বলে চিৎকার শুরু করে দিয়েছি। তা শুনে হা-ঘরেদের কজন তো দাঁত বার করে হাসতেই লাগল। ওরা জানে, এই দুর্যোগে, এত রাতে ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর রেল স্টেশনে আর যারাই থাক না কেন, পুলিশরা পাহারায় নেই।

চিৎকার শুনে স্টেশনমাস্টার আর পয়েন্টস্‌ম্যান ছুটে এলেন। আমার সব কথা শুনে স্টেশনমাস্টার আলো তুলে ধরে হা-ঘরেদের প্রত্যেককে দেখে বললেন, এদের কাউকে তো কখনও চুরিটুরি করতে দেখিনি। এরা মশাই সত্যিই হা-ঘরে। তবে আজ হাঁদুকে এখানে দেখছি না, সে মশাই সত্যিই পাকা চোর। তার পক্ষে সবই সম্ভব।

আমি বললাম, তবে সেই পাগলের ভান করা লোকটা কে? সে এল কোথা থেকে?

উনি বললেন, এদিকে তো আছে এক যুগী পাগল, তা সে তো স্টেশনে কালেভদ্রে আসে। না মশাই, এ কাজ কোনও সাজা পাগলেরই। সে এদিকের লোক নয়।

আপনি থানায় যান। তারা যদি এর কোনও হদিস করতে পারে।

পয়েন্টসম্যান বলল, বড় রাস্তা ধরে সোজা উত্তরমুখো চলে যান বাবু। বড় ঝাঁকড়া বটগাছ পার হলেই থানা। খুব কাছে, তিন কিলোমিটার পথ হবে। থানার দারোগা বাবু খুব হুঁশিয়ার। তিনি ঠিক মামলা ফয়সালা করবেন।

বাইরের ঝোড়ো হাওয়া, আর ঘোর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আমার অত দুঃখেও হাসি পেল। বুঝলুম, আর মিথ্যে টাকার শোক করে লাভ নেই। হাতঘড়িতে দেখলাম, ট্রেন আসার সময় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে ট্রেনও এল বেশ দেরি করে।

ট্রেনে ভিড় ছিল না। প্রায় খালি একটা কামরাতে উঠে শুয়ে পড়লাম। মনের অবস্থা এমন ছিল যে ঘুম আর এল না। কত সব বোকামির কথা কাগজে পড়েছি আর হেসেছি। আর আজ আমি নিজেই তার শিকার হলাম।

প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা ধিকোতে ধিকোতে চলছিল। প্রত্যেক স্টেশনে থামছিল। কিছুক্ষণ পরে তেমনি একটা স্টেশনে এসে থামল। ততক্ষণে ঝড়-বৃষ্টি থেমেছে। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটও কম। কে যেন উঠল কামরায়। বসল এসে পিছনে। সে সবে আমার তত খেয়াল ছিল না। নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় বিভোর ছিলাম।

হঠাৎ কার নিশ্বাস পড়তে চমকে ফিরে তাকালাম। তাকিয়েই আমি পাথর হয়ে গেলাম। সেই লোকটা আমার পাশে বসে! চোখে ওর সেই বীভৎস দৃষ্টি! আমি তাকাতেই ও তেমনি ভয়ঙ্কর গলায় বলল, পিছন পিছন আসব বলেছিলাম, এসেছি। বসার বেঞ্চ কারও কেনা নয়। ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে থাকলেই সবাই চোর নয়। আর তাকালেই কেউ বদলোকও হয় না! ছিঃ! ছিঃ!

ভীষণভাবে শেষ বারের মত তাকিয়ে ও উঠে দরজা দিয়ে নীচে নেমে গেল। ট্রেনটাও সঙ্গে সঙ্গে আবার চলতে আরম্ভ করল।

হুঁস ফিরতেই আমার মনে পড়ে গেল, এ লোকটাই তো আমার এ্যাটাচি চুরি করেছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, আমার এ্যাটাচি, আমার এ্যাটাচি, ওই লোকটা আমার এ্যাটাচি নিয়ে গেছে। উঠে এলার্ম চেনটা ধরতে যাচ্ছিলাম। পাশের একজন ভদ্রলোক ধমকে বললেন, আরে, মশাই কি পাগল হলেন নাকি? এ্যাটাচিটা তো পায়ের কাছে গড়াগড়ি যাচ্ছে দেখছি। বসুন বসুন। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি? ঘুমিয়ে চোরের স্বপ্ন দেখছিলেন? তাইতো! কিন্তু এ্যাটাচিটা এলো কি করে? ঐ পাগলাই দিয়ে গেল!

বোকার মত এ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে ধপ করে বসে পড়লাম আমি। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি কাতা বাঁধা নোটের বাণ্ডিলগুলো সবই ঠিক আছে।

ভদ্রলোক বললেন, ঘুমান আর যাই করুন, এ্যাটাচিটা সামলে রাখুন। বেগমপুরে নাকি এক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। শুনলাম ওখানে স্টেশনের এক ভদ্রলোকের এক সুটকেশ চুরি করে এদিকের নামী চোর হাঁদু নাকি পালাচ্ছিল, তাকে নাকি দেখে ফেলে যুগী পাগল। সে হাঁদুকে তাড়া করে। সারা রাস্তা চেঁচাতে চেঁচাতে আসে। আশপাশের সবাই ভাবে, ও পাগলের কাণ্ড। কেউই গা করে না। বটতলার থানার কাছে ধরা পড়ার ভয়ে হাঁদু নাকি ওকে ছুরি মারে। যুগী খতম। হাঁদুও পগার পার বামাল সমেত। থানার সেপাইদের হাঁদুর নামই বলে গেছে যুগী। তারা এ স্টেশন ও স্টেশন খোঁজাখুঁজি করাতেই আমরা জানতে পারি ব্যাপারটা। আহা, যুগী পাগল বড় ভাল মানুষ ছিল।

আমি বোকার মত ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোক বললেন, দিনকাল ভাল নয়। এ্যাটাচি সামলে তবে ঘুমান মশাই।

ফিরে পাওয়া

পরেশ দত্ত

বোম্বে পৌঁছনোর দু'দিন পরেই সেই ঘটনাটা ঘটে গেল। ট্রম্বে যাবার পথে ভি. টি. থেকে সাবারবান্ ট্রেনে মানকুরড্ চলেছি। দুপুরের ট্রেন, মাঝ পথেই প্রায় ফাঁকা। কামরায় আমি ছাড়া আর জনা চার পাঁচ যাত্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বসে রয়েছে। মার্চ মাস। জানলা দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছে। গাড়ির দুলুনিতে জানলার ধারে বসে ঢুল এসে গিয়েছিল। তারপর কি করে যে এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম তাও জানি না। চোখ খুলে দেখি ট্রেন মানকুরড-এ পৌঁছে ফের ভি. টি.'র দিকে ছুটে চলেছে। ট্রেনের কামরার সীটের ওপর শুয়ে রয়েছি। আমার মুখের ওপর অনেকগুলো মুখের জটলা। নানারকম মন্তব্য, "বেহোঁশ হো গয়ে," কোনো একজন বলল, "কুছ গিয়াতো নহী।" উঠে বসলুম। দেখলুম, হাতের ইলেকট্রনিক ঘড়ি, পকেটের শ'দেড়েক টাকার নোট কিছুই নেই। সহযাত্রীদের চোখেমুখে সহানুভূতি।

ভি টি'তে ট্রেন পৌঁছালো, মাথাটা তখনও টলমল করছে। ট্যাক্সিতে হোটেলে পৌঁছলুম। ক্যালকাটা লজের ম্যানেজার জ্ঞানেশ বরাট বললেন, "সাবধানে ট্রেনে চড়বেন মশাই। বোম্বের লোকাল ট্রেনে ক্লোরোফরম করে ছিনতাইয়ের ঘটনা নতুন নয়।" মনটা খচখচ করতে লাগল। রাত্রে ভাল ঘুম হলো না। তবু রক্ষা, বেশী টাকা সঙ্গে ছিল না। ট্রাভেলারস চেক হোটেলেই রেখে গেছিলুম। আর একটা দামী জিনিস তখন সঙ্গে ছিল না। মাথার দিকে ইলেকট্রনিক ঘড়িওয়ালা একটা পেন। জাপান থেকে ফিরে আমার এক বন্ধু প্রেজেন্ট করেছিল। দামী জিনিস সঙ্গে নিয়ে বেরুই না। কিন্তু ঘড়ির অভাবে এখন ওটাই ভরসা।

বোম্বের একটা মেডিক্যাল ফার্মের সঙ্গে জরুরী দরকারে বোম্বে এসেছি। মোট এক হপ্তার প্রোগ্রাম। দু'দিন আগেই নির্দিষ্ট কাজ শেষ। সেদিন বুধবার। ভাবলুম, সময় পেয়েছি যখন এলিফেন্টা কেভ ঘুরে আসি। হোটেলে দুপুরের খাওয়া সেরে বাসে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া পৌঁছলুম। কাছেই আরব সাগরের দিকে মুখ করে আকাশে মাথা তুলেছে হোটেল তাজ। রিটার্ন টিকিট কিনে জেটি দিয়ে নেমে লঞ্চে বসলুম। আমার ঠিক পরেই সুট টাই পরা আমার বয়সী একটি তরুণ আমার ঠিক উল্টো দিকের বেঞ্চে ইলাসট্রেটেড উইকলি খুলে বসল। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, দু পাশের ঠোঁটের ডগা পর্যন্ত বাহারী গোঁফ। মনে হলো কোথায় যেন দেখেছি ছেলেটাকে। কিন্তু কিছুতেই ঠিক মনে করতে পারলুম না। যাত্রী বোঝাই হতেই আমাদের লঞ্চ 'বিজয়লক্ষ্মী' ছেড়ে দিল।

আরব সাগর এখানে নদীর জলের মতো ঘোলাটে,

ঢেউও নদীরই মতো। ভট্ ভট্ শব্দে ডিজেল লঞ্চ গভীর সমুদ্রের দিকে ছুটে গেল। সমুদ্র তীরের হাইরাইজ বিল্ডিং-এর প্রথম গোড়া তারপর মাথাগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। সামনে এখন সীমাহীন বারি। সমুদ্রের এখানে ওখানে বার্থিং এর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বিদেশের বড় বড় জাহাজ। কয়েকটা লাইট হাউসও চোখে পড়ল। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই দিগন্ত রেখায় অস্পষ্ট দেখা গেল এলিফেন্টা আইল্যান্ডের পাহাড়চূড়া।

লঞ্চ যখন ১০ কিলোমিটার দূরের দ্বীপে পৌঁছালো সমুদ্রে জোয়ার এসেছে। পাহাড়ের গোড়ার দিকের বড় বড় গাছের মাঝামাঝি পর্যন্ত জলে ডুবে গেছে। কংক্রিটের জেটিও এক হাঁটু জলের তলায়। যাত্রীরা লঞ্চ থেকে সাবধানে নামছে। নামতে গিয়ে আর একটু হলে জলের ভেতরই পড়ে যাচ্ছিলুম। লঞ্চে ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন কে একজন। মুখ তুলে দেখি সেই সোনালী ফ্রেমের চশমা পরা তরুণ।

পাথরের স্ল্যাব দিয়ে গাঁথা দীর্ঘ সিঁড়ি উঠে গেছে কেভের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ছেলেটি হাসল, "এলিফেন্টায় এই প্রথম আসছেন?"

"হ্যাঁ, আপনি?"

"দু'বছর আগে আর একবার এসেছি। চলুন আপনাকে সব দেখিয়ে দেব।"

বিদেশে সঙ্গী পেয়ে ভালো লাগল। বললুম, "সো কাইন্ড অফ ইউ।" টিকিট নিয়ে কেভের দিকে পা বাড়ালুম আমরা। ইতিমধ্যে জেনেছি মহারাষ্ট্রের ছেলেটির নাম রঞ্জন প্যাটেল। পুনে থেকে এসেছে। মানুষের হাতে গড়া বিশাল গুহায় আমরা দেখলুম অষ্টম শতকের প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের আশ্চর্য নিদর্শন। রঞ্জনের কাছে শুনলুম দ্বীপের আসল নাম অগ্রহারপুরী। ছ'টি গুহা নিয়ে তৈরি। সব কটি মূর্তিই দেবাদিদেব মহাদেবের নামে উৎসর্গীকৃত। গুহামন্দিরের প্রধান আঠারো ফুট উঁচু ত্রিমুখ মহেশ মূর্তি। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় তিন মুখে তিন অভিব্যক্তি। আশেপাশে আরও অনেক বিগ্রহ। কিন্তু কোনোটিই অক্ষত নয়। অতি নিষ্ঠুর আঘাতে কম বেশি ক্ষতবিক্ষত। পর্তুগীজ দস্যু ও কালাপাহাড়ের কুকীর্তি গুহার ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে।

ফেরার পথে পাহাড়ের মাথায় আমরা দেখলুম জোড়া কামান। ফেরার লঞ্চে ওঠার আগে রঞ্জন বলল, "অনেকক্ষণ ঘোরা হলো। সমুদ্রের হাওয়ায় ক্ষিদে পেয়ে গেছে। আসুন কিছু খেয়ে নেয়া যাক।"

পাহাড়ের গায়ে ফুটন্ত পলাশ গাছের নিচে রেস্তোরাঁ। সামনে মুক্তাঙ্গনে রঙীন পলিথিন সীটের তলায় স্টিলের চেয়ার টেবিল। এখান থেকে আরব সাগরের জল বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। পালতোলা নৌকা, লঞ্চ, জলের ওপর সাদা ডানা মেলে উড়ছে সমুদ্রচিল।

চায়ের সঙ্গে মসলা ধোসা দিতে বলল রঞ্জন প্যাটেল।

চামচেতে এক টুকরো ধোসা কেটে রঞ্জন বলল, "বোম্বে কবে এসেছেন?"

"দিন পাঁচেক আগে।"

"থাকবেন এখন!"

"না, পরশুই চলে যাব। আপনি?"

"আমি তো আজই পুনে এক্সপ্রেসে পুনে ফিরব।"

ধোসা শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রঞ্জন বলল, "আঃ, পাহাড়ে কি প্লেজেন্ট হাওয়া দেখেছেন। ঘুম এসে যায়।" আরামে চোখ বুজলো রঞ্জন। প্রায় ঠিক তখনই মনে পড়ল একেই দেখেছি মানকুরডের আপ ট্রেনে। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগেই! বেশ মনে পড়ছে কোণার দিকে একটা জানলার বাইরে মুখ করে বসেছিল ছেলেটি। সেই রকম সোনালী ফ্রেমের চশমা। বাহারী গোঁফ।

রঞ্জন বলল, "কি ভাবছেন, আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম, "আচ্ছা প্যাটেলজী, দু'তিন দিন আগে লোকাল ট্রেনে আপনি কী মানকুরডের দিকে গেছিলেন?"

"মানকুরড, সেটা কোন দিকে?" আমার দিকে অবাক চোখে তাকাল রঞ্জন।

বললুম, "জানেন না, ট্রম্বের দিকে? না এমনি, ক' দিন আগে আমি মানকুরডের ট্রেনে আপনার মতো একজনকে দেখেছি।"

হো হো করে হেসে উঠল, "আমারও অনেক সময় অমন ভুল হয়েছে। চেনা লোক মনে করে ডাকতে গিয়ে বুদ্ধু বনে গেছি। নিজের ভুলের জন্য তখন আমি লজ্জিত!"

রেস্তোরাঁর বয় বিল নিয়ে এলো। বিলের অঙ্ক দেখে দুজনেই অবাক। এখানে সব জিনিসের দাম দ্বিগুণেরও

বেশী। বুক পকেট থেকে পার্স বার করতে গেলুম, রঞ্জন আমার হাত চেপে ধরল, "নো নো মাই ফ্রেন্ড, পেমেন্ট আমি করব।"

হঠাৎ আমার বুক পকেটের দিকে ঝুঁকে পড়ল রঞ্জন, "আরে আপনার পেনের মাথায় একটা ইলেকট্রনিক ওয়াচ মনে হচ্ছে।"

পকেট থেকে পেনটা বের করে রঞ্জনের হাতে দিলুম, "হ্যাঁ, পেনের সঙ্গে ডেট এণ্ড টাইম ইলেকট্রনিক ওয়াচ।"

পেন ওয়াচটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল রঞ্জন, "ভেরি নাইস। ফরেন জিনিস মনে হচ্ছে। কোথায় পেলেন?"

হেসে বললুম, "জাপান থেকে ফিরে আমার এক বন্ধু প্রেজেন্ট করেছে।"

"খুব কস্টলি মনে হচ্ছে। কত দাম হবে?"

হাসলুম, "আমার বন্ধু জানে।"

পেনটা ফেরৎ দিয়ে রঞ্জন বলল, "আমার একটা কেনার ইচ্ছে আছে।"

কিছুক্ষণ পরেই ফেরার লঞ্চ পেয়ে গেলুম আমরা। একই কোম্পানীর অনেক লঞ্চ থাকে, তাদের যে কোনো একটাতে উঠলেই হলো।

বিকেল চারটের পরেই গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ায় পৌঁছে গেলুম আমরা। বাসে ভি. টি. পৌঁছে বললুম, "চলুন আমার হোটেল থেকে বেড়িয়ে আসবেন।"

"কোথায় উঠেছেন?"

"ক্যালকাটা লজে, খুব কাছে।"

আমার কাঁধে হাত রেখে রঞ্জন বলল, "আমাকে পুনের ট্রেনে সি অফ করে দিতে হবে কিন্তু।"

হোটেলে পৌঁছে ম্যানেজারকে বললুম, "জ্ঞানেশবাবু, দু কাপ নেসকাফে আর স্ন্যাকস পাঠিয়ে দেবেন।"

কফির কাপে চুমুক দিয়ে হাসল রঞ্জন, "ক্যালকাটা লজে নিশ্চয় বেঙ্গলী ডিস।"

"হ্যাঁ, সেই লোভেই তো এখানে উঠেছি।"

আমরা স্টেশনে পৌঁছনোর আগেই প্লাটফরমে পুনের ট্রেন এসে গেছে। প্লাটফরমে অনেক লোকের ছুটোছুটি। ট্রেন ছাড়তেও দেরি নেই। ইঞ্জিনের পেছনের দু নম্বর কোচে উঠে রঞ্জন আমার হাত জড়িয়ে ধরল, "তোমার কম্পেনী আমার খুব ভাল লাগল ব্রাদার। ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।"

ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে নিজের কার্ড দিয়ে রঞ্জন বলল, "কই, তোমার ঠিকানা দিলে না।" নোট বই বার করে বললে, "তোমার পেনটা দাও। লিখে নি।"

ট্রেন ছেড়ে দিল। রঞ্জনকে সী অফ করে মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল।

প্লাটফরমের বাইরে এসেই থমকে দাঁড়ালুম। প্রথমে বুক পকেট তারপর ট্রাউজারের পকেট চাপড়ে দেখলুম, না, নেই! কোথাও নেই! আমার সেই জাপানী পেন ওয়াচটা নেই! ভিড়ের মধ্যে পিক পকেট হয়ে গেল কী? তখনই মনে পড়ল আমার ঠিকানা লেখার জন্য প্যাটেল কলমটা নিয়ে আর ফেরৎ দেয়নি।

স্টেশনের বাইরে এসে কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে

রইলুম। মনে পড়ে গেল ক'দিন আগে মানকুরডের ট্রেনে ঘড়ি টাকা চুরি হওয়ার কথা। রঞ্জনের মতো সোনালী চশমা পরা সেই ছেলেটির কথা। এলিফেন্টায় পেন ওয়াচটা রঞ্জনকে প্রথম দেখানোর কথা। চট করে আমার মনটা দুটো ভাগ হয়ে গেল। একটা মন বলল, মানুষকে চিনতে সময় লাগে। রঞ্জনের সঙ্গে কতক্ষণেরই বা পরিচয়। মানকুরডের ট্রেনে হয়ত ওকেই দেখেছিলুম। কৌশলে কথাটা গোপন করেছে। বলা যায় না ছিনতাই দলের সঙ্গে ওর যোগসাজস আছে। একবার দামী জিনিস চুরি করার পর ওদের দল থেকে রঞ্জনকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। দামী পেন ওয়াচটা হয়ত বাসে ওঠার পরই দেখেছে ওরা। তারপর রঞ্জন ওটা হস্তগত করার জন্য ফাঁদ পেতেছে। আর একটা মন বলল, না, রঞ্জন তেমন ছেলেই নয়। রেস্তোরাঁয় খাওয়ালো। সঙ্গে ঘুরলো। ট্রেন ছাড়ার সময় ওর চোখের কোণ চিক্ চিক্ করে উঠেছিল, তা কি মিথ্যে?

তখনই হোটেলে ফিরতে ইচ্ছে হলো না। এখানে ওখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়ে রাত দশটা নাগাদ হোটেলে ফিরলুম। ম্যানেজার জ্ঞানেশবাবু বললেন, "খবরটা শুনেছেন মশাই?" নিস্পৃহভাবে বললুম, "কি খবর বলুন তো?"

"ট্রেন অ্যাকসিডেন্টের খবর।"

"কোন ট্রেন?"

"পুনে এক্সপ্রেস। স্টেশনে একটা মালগাড়ির সঙ্গে হেড অন কলিসনে ইঞ্জিনের পেছনের বগিগুলোর একটা লোকও বেঁচে নেই।"

ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতরটা। নিমেষে ভুলে গেলুম আমার পেন ওয়াচটার কথা। চোখের সামনে ভেসে উঠল বিধ্বস্ত ট্রেনের বগির মধ্যে শত শত মানুষের বিকৃত মৃতদেহের মধ্যে রঞ্জনের মুখ। একটা তরতাজা যুবকের নিথর দেহ। আজ সারা দিন যার সঙ্গে ঘুরেছি। সকালে খবরের কাগজে বিধ্বস্ত ট্রেনের ছবি দেখলুম। ইঞ্জিনের পেছনে গোটা চারেক বগি, একটার পেছনে আর একটা ঢুকে গেছে।

পরের দিন ভোরে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে আমার কলকাতা ফেরার কথা। কিছু কেনা-কাটা বাকি ছিল। সন্ধ্যার দিকে মার্কেটে গেলুম। ঘুরে বেড়িয়ে হোটেলে ফিরলুম নটায়। আমাকে দেখে জ্ঞানেশবাবু বললেন, "আরে কোথায় গেছিলেন মশাই? এক ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজতে এসেছিলেন।"

"কি নাম বলুন তো।"

"নাম তো কিছু বলেননি, আপনার চেনা লোক।"

অবাক হলুম, "ঠিক বুঝতে পরছি না তো।"

"আরে ওই যে মশাই, গতকাল যাকে আপনি হোটেলে সঙ্গে করে এনেছিলেন, সোনালী ফ্রেমের চশমা, বাহারী গোঁফ। ওই সোফায় বসে অনেকক্ষণ আপনার জন্য অপেক্ষা করলেন। ওই জানলার ধারে পায়চারি করলেন। তারপর আপনার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে এই জিনিসটা আপনাকে দিতে বলে চলে গেলেন। এটা নাকি আপনাকে ফেরৎ দিতে ভুলে গেছিলেন।" আমার দিকে খবরের কাগজের একটা মোড়ক এগিয়ে দিলেন ম্যানেজারবাবু।

নিজের রুমে এসে খবরের কাগজের মোড়কটা খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। ভেতরের জিনিসটা আর কিছুই নয়, আমার সেই ইলেকট্রনিক পেন ওয়াচ। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলুম না। এ কেমন করে সম্ভব? রঞ্জনকে এখন জীবনের এ পারেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে কে ফেরৎ দিয়ে গেল ঘড়িটা?

হঠাৎ মনে হলো, এমনও তো হতে পারে, অ্যাকসিডেন্টের আগে কোনো বিশেষ কারণে রঞ্জন কোনো স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিল। পেন ওয়াচটা ফেরৎ পাওয়ার চাইতে আমি বেশী খুশী রঞ্জন বেঁচে আছে জেনে।

কলকাতায় ফিরে কার্ড দেখে পেন ওয়াচটা ফেরৎ দেবার জন্য, ধন্যবাদ জানিয়ে পুনের ঠিকানায় একটা পোস্টকার্ড পাঠালুম।

উত্তর এলো এক বিমল প্যাটেলের কাছ থেকে। লিখেছেন, "রঞ্জন প্যাটেল আমার ছোট ভাই। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বোম্বের এক ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে দশ দিন আগে। আমি নিজে তার অন্ত্যেষ্টি করে এসেছি।"

আজও আমি ভেবে পাইনি পেন ওয়াচটা হোটেলে ফেরৎ দিয়ে গেছিল কে?

হোটেলের ম্যানেজার জ্ঞানেশবাবুও কি ভুল দেখেছিলেন?

ভূতের চিরুনি

আবুল বাশার

জ্বর হলে ভূত দেখতে পেতেন দিনুখুড়ো। আবিরমামা গত্তিলালকে বলেছিলেন, জ্বর গায়ে দিনু দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে গান গাইতেন। সবাই বলত, খুড়ো অমন করেই ভূত নামায়।

নীলকুঠির পুরনো দারোয়ান ছিলেন দিনু সিকদার। সাদা চামড়ার সাহেবদের নীলের ব্যবসা কবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারাও স্বাধীনতার কত আগে কুঠি ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু কুঠিবাড়ির দারোয়ানি বজায় ছিল স্বাধীনতার পরেও। শেঠের দীঘির চৌধুরীরা কুঠি-এলাকার মালিকানা পেয়েছিলেন সাহেবদের কাছ থেকে। তাঁরাই দিনুখুড়োকে কুঠির দারোয়ানির চাকরিতে বহাল রেখেছিলেন সাহেবদের মতোই। খুড়োর ছিল সাড়ে সাত টাকা মাইনে। দিন বদলেছে, কিন্তু মাস-মাইনে তাঁর বাড়েনি।

কিছুকাল আগের কথা। কুঠির প্রকাণ্ড লোহার গেটের মুখে খুড়ো একটি পানবিড়ির দোকান খুলেছিলেন। দোকান চালাত ভাইপো সিধুচরণ। সন্ধ্যার মুখে ওই দোকান খুলত ভাইপোটা, দিনমান মাঠে খাটত।

শোনা যায়, দিনুখুড়ো সোয়াশো বছর বেঁচে ছিলেন। দিনের বেলা কুঠির গেট খোলা, কিন্তু সূর্য অস্ত যেতে-না-যেতেই সেই গেট বন্ধ করে দিতেন সিকদার। লোক ঢুকতে পারত না। ভাইপোর পানবিড়ির দোকানে সারারাত টিমটিম করে কুপির আলো জ্বলত। গোরুর ব্যাপারিরা রাতে পাকা সড়ক দিয়ে গোরুর দল হাঁকিয়ে নিয়ে যেত সীমান্তের দিকে। বাংলাদেশে ওই গোরু চালান যেত। তখনকার কালে বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব-পাকিস্তান। সেই ব্যাপারিরা ওই দোকান থেকে পানবিড়ি কিনত।

মামা বলেছিলেন, কুঠি জায়গাটাই ছিল ভূতগ্রস্ত। ভূত এবং জিন কুঠিকে ঘিরে থাকত। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে-সঙ্গে গেটের কাছে ফিটনের ঝুমঝুম শব্দ ভেসে উঠত। ব্যাপারিদের মুখে শুনেছিলেন আবিরমামা। অশ্বের তীব্র হ্রেষাও নাকি শোনা যেত। মাঝে-মাঝে দারোয়ানের তকমা আঁটা দিনুর অস্বাভাবিক দুর্বোধ্য কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হত। বাতাসে ভাসত বর্মা চুরুটের গন্ধ। ফরাসি আতরের উগ্র ঝাঁঝ, গোলাপজলের ঠাণ্ডা হাওয়া গেটের সড়কে গোঁত্তা খেয়ে খেলে উঠত। মদির একটা গন্ধও মিশে থাকত সেই বাতাসে। বাতাসে কান পাতলে শোনা যেত নারী-পুরুষের চাপা গলার আলাপ। ভাঙা বাংলা আর চড়া হিন্দির মেশানো অদ্ভুত সাহেবি ভাষা ব্যাপারিরা শুনেছে।

জ্বরের গায়ে দিনুখুড়ো সাহেব-মেমদের স্যালুট করছেন, ফিটন এসে ভিড়েছে গেটের মুখে, সে ভারি চমৎকার দৃশ্য। আপনা থেকে কড় কড় করে লোহার

গেট খুলে যাচ্ছে, কুঠির ভেতর দালানের নাচঘরে ঝাড়বাতি জ্বলে উঠেছে।

জ্বলন্ত বরফের মতো সাদা ঘোড়াগুলি ঝড়ের বেগে গাড়ি টেনে এসে পাথরের বড় গামলায় মুখ ডুবিয়ে জাবনা আর জল খাচ্ছে। এক মেম ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে ধরা, ঘোড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

গায়ে জ্বর না এলে খুড়ো এইসব দৃশ্য দেখতে পান না। তিনি বলেছিলেন, "বুঝলে আবিরলাল, কুঠির বাগানে বাঁশবনের ওইদিকে একটা বুড়ো গো-জিন চরে বেড়ায়। গো-জিন কি না বুঝবে কী করে? তাহলে তোমাকে ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাতে এখানে আসতে হবে। গো-ভূত হোক আর গো-জিন হোক, ওরা হাড় খায়।"

আবিরমামা এ-কথা শোনামাত্র আঁতকে উঠলেন ভয়ে। "হাড় খায়?"

খুড়ো তাজ্জব গলায় হেসে ফেলে বললেন, "হ্যাঁ বাপু। হাড়। মানুষের হাড়। কঙ্কাল খায়।"

"কিন্তু এখানে কঙ্কাল কোথায় খুড়ো?"

"আছে বইকি আবিরলাল! কুঠি আছে আর মানুষের হাড় থাকবে না! কাউকে যদি না বলে ফ্যালো, তোমাকে দেখাতে পারি। খুব সাবধান! কথা যেন দু'কান না হয় আবির! আগে দ্যাখো, তারপর চেপে যাও। ফাল্গুনের পূর্ণিমায় এসো।'

আবিরমামার কাছে আমরা নানাখানা ভূতের গল্প শুনে আসছি বরাবর। গত্তি আমার জ্যাঠতুতো দাদা, আমার নাম কিরণ। আমার দু'-চারটি ডাকনাম আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বোধ হয় চুনো।

মামা একদিন আমাকে শুনিয়ে বললেন, "শোন চুনো, কুঠি হলেই জানবি, জায়গাটার নিশ্চয়ই বদনাম আছে। এককালে নীলকর সাহেবরা জোর করে চাষিদের দিয়ে নীলের চাষ করাত, ধান বুনতে দিত না। না খেয়ে মরতে হত চাষিকে। কোনও চাষি অবাধ্য হলে তার হালের বলদ, জোত-জোয়াল সব ছিনিয়ে নিত নীলের সাহেব, পেয়াদা দিয়ে ধরে এনে এই কুঠিতে ভয়ানক মারধর করত। মারতে-মারতে মেরে ফেলত পর্যন্ত। তারপর সেই মৃতদেহকে কোথায় যে ফেলে দিত!"

গত্তিদাদা বলল, "নীলের ব্যবসায় সাহেবদের খুব লাভ হত, তাই না মামা?"

মামা বললেন, "সাহেবরা ওই নীল চালান দিত বাইরে। মোটা টাকা লাভ করত। এদিকে চাষি সংবৎসরের জন্য মুখের খাবার জোগাড় করতে পারত না। ধানের জমিতে নীল ফলাতে হলে ভাতের জোগাড় হয় কী করে! দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে সাহেবদের সেই অত্যাচারের ঘটনা পাওয়া যায়। কী নিষ্ঠুর আর মর্মান্তিক!"

আমি প্রশ্ন করলাম, "ওই কুঠিতে কখনও ঢুকেছিলে তুমি?"

মামার মুখের রং কেমন একটুখানি বদলে গেল, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় মামা বললেন, "হ্যাঁ চুনো, মাত্র একবার। সেই ফাল্গুনের পূর্ণিমা রাতে। যাকে বলে ফিনফোটা জ্যোৎস্না চারদিক টইটই করছে। আর বাজিতপুরের দিগন্তজোড়া মাঠ পেরিয়ে ছুটে আসছে মন-কেমন-করা আশ্চর্য জোরদার হাওয়া। দিনুখুড়ো মাঠের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "মাঠে ভুলো নেমেছে।"

মাঠের ভেতর সত্যিই জ্যোৎস্নার ম-ম করা ধাঁধোশের সমুদ্রে দপ করে আলো জ্বলে উঠছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, বিলের পাড়ে কয়েকটি আলো ছোটাছুটি করছে, শুনেছি স্যাঁতসেঁতে ভেজা মাটিতে এক ধরনের গ্যাস তোয়ের হয়, তাইতে আগুন জ্বলে ওঠে। ভুলোটুলো বাজে কথা। দু'দিন আগে ভাল জলঝড় হয়েছে, সে কারণে ভুলোর আমদানি হয়েছে।

এইসব যুক্তি পেশ করার পর আবিরমামা বললেন, "সবই বুঝতাম চুনো। কিন্তু দিনুখুড়োর গলার মধ্যে কী ছিল কে জানে, ভুলোর আলো দেখে গা ছমছম করে উঠল। খুড়ো বললেন, এই ধরনের রাতে গো-জিনদের মচ্ছব হয় আবির! এসো তোমাকে কঙ্কাল সরোবরে নিয়ে যাই।"

কঙ্কাল সরোবর কথাটাই কেমন ভয় ধরানোর মতো। হঠাৎ কুঠির দালানের পুরনো কাঠামো হাওয়ার আঘাতে মটমট করে উঠল বুঝি। লোহার গেট কড়কড় শব্দে খুলে যেতে লাগল।

"আপনিই খোলে নাকি খুড়ো?"

"তা খোলে বইকি! ঘোড়াগাড়ি ঢুকবে কি না! চোখে দেখবে না ঠিক, তবে কানে শুনবে। আগে এই শরবতটুকু খেয়ে নাও।"

"কেন?"

"বলছি খাও, প্রশ্ন কোরো না।" বলে দিনুখুড়ো মস্ত গোল কাঠের টিপয়ে রাখা ঢাকনা-ঢাকা গেলাসের শরবত হাতে করে তুলে ঢাকনা সরিয়ে আমার সামনে এগিয়ে ধরলেন। বললেন, "তুমি খাবে, আমি মন্ত্র পড়ব। ভয় পেয়ো না, এই রাতে যেসব ভূত আসে তারা কতক মিস্ত্রি, কতক হলগে বাড়ি তৈরি করা এঞ্জিনিয়ার। এরা কেউ ফোরাত নদীর ধারে নগর গড়েছিল, কেউ পারস্যের মহল গড়েছিল। প্যালেস্টাইনে এরাই বানিয়েছিল ঐরাবত দুর্গের ধাঁচা। বাদশা সুলেমানের আমলে এদের বংশধরেরাই ময়ূর মহল নির্মাণ করেছিল। মনে রাখবে খাটিয়ে লোকরা চিরকাল বোকা হয়। সেইজন্যে ভূত বলতে জনগণকেও বোঝায়।"

"আপনি খুড়ো খুব শিক্ষিত লোকের মতো কথা বলছেন!"

"তা বলছি, কেননা সমস্ত কথা আমার মুখস্থ আছে। হাজারদুয়ারির গাইডরা যেরকম শিক্ষিত ভাষায় কথা বলে, আমিও সেইরকম বলি। কুঠির গাইড আমি। তা ছাড়া কালির অক্ষর আমার পেটেও কিছু আছে। শেঠের দিঘির চৌধুরীরা আমাকে যে বহাল রেখেছেন, তার প্রধান কারণ এই পালিশ করা ভাষা। আমি তাঁদের বাড়ির বউদের পর্যন্ত গো-ভূত দেখিয়েছি। মাইনে সাড়ে সাত টাকা। কিন্তু বছরান্তে চৌধুরীরা আমাকে ধানগম সাহায্য করেন, কুঠির সবজির একটা ভাগ পাই।"

এক মিনিট চুপ করে থেকে খুড়ো বললেন, "এখানে কোনও চাষি চাষবাস করতে আসবে না। গো-জিন যেখানে থাকে, গোরু ডরায় বাবা! শুধু ট্রাকটার দিয়ে চাষ করানো যায় বটে, কিন্তু চৌধুরীর ড্রাইভার সাহস করেনি। অগত্যা এই দিনুই ভাগজোত টেনে এই কুঠি আগলাচ্ছে। ভাইপোটাকে বলি, ওরে সিধে, এখানের মন্ত্রপাঠ শিখে হাল ধর বাবা, তা সে ভয়েই আসে না।"

দম ফেলে খুড়ো মন্ত্র আওড়ে উঠলেন, "ই আর কি, মুই আর কি ফট! সামনে ভূতের পট। তুমি দেখবা আবিরলাল?"

"আজ্ঞে!" ভয়ে মামার গলা শুখু-শুখু।

ঢোক গিলে মামা শুধালেন, "কী দেখব খুড়ো?'

"আগে গলা ভিজিয়ে নাও, তারপর সব হচ্ছে! ভূতের পট নিশ্চয় তোমাকে দেখাব। ওরা পট টাঙিয়ে দিয়ে গান গেয়ে ইমারত বানাত। নগর তৈরি করত। ইকড়ি মিকড়ি চিক। তিনি আছেন পচ্ছিম দিক।"

"তিনি কে?"

"আর কে! যে ভূতটা পট লেখে!"

"কোথা?"

"আর কোথা! ওই হোথা। চল দেখাচ্ছি। আগে শরবত শেষ কর।"

ভয়ে মামা ঢকঢক করে গেলাসের শরবত খেয়ে ফেললেন। যদিও আবিরমামা ভূত ঠিক বিশ্বাস করেন না, তাঁর ধারণা মনের কোনও ধরনের বিকার হলে ওই পদার্থ দেখা গেলেও যেতে পারে, সুস্থ মানুষ ভূত দেখে না। তবু তাঁর ভয়ই করছিল। কুঠির দালানগুলো এমনিতেই পোড়ো, পলেস্তরা খসা, লাল ছোট-ছোট ইঁটের দাঁত বের করা থামগুলো নোনায় খাওয়া, একেবারেই দড় মনে হয় না। সিলিং অনেক উঁচু, পুরনো শালকাঠের তীরবরগা অনেক স্থানে ক্ষয়ে হড়কে খসে যেতে বসেছে, কিছু স্থলে ছাদ পড়ে গিয়েছে। বুনো পায়রা, প্যাঁচা, বাদুড় নানা জায়গায় বাসা গেড়েছে, মাঝে-মাঝেই বিদঘুটে চিৎকার করে উঠছে। এখানে দাঁড়াশ সাপ ঘুরে বেড়ায়।

শরবত খাওয়া শেষ হলে খালি গেলাস টিপয়ে রেখে দিয়ে খুড়ো বললেন, "এটা খেলে তো! এবার তোমার গায়ে সামান্য তাপ বাড়বে। মাথাটা ঝিকোবে। আমি মন্ত্র পড়ে দিয়েছি, কালী কটকা, হাওয়াই সটকা, মন্তর। হিক্রু ডিক্রু গুরুং খাঞ্জি পটিতং ঘ্রাউ, মিস্ত্রির গন্ধ পাও?"

"আজ্ঞে কিছুকিঞ্চিৎ পাই।"

"পট পটিতং পড়চা, পাচকিসিতন খরচা, রং আর তুলি। এসো।"

"আজ্ঞে কোথা?"

"টের সামনে।"

আবিরমামাকে হাত ধরে একটি ভাঙা গুহার মতো জায়গায় টেনে আনলেন দিনু সিকদার। গুহার মুখে, আসলে ঘরের দেওয়াল খসে গিয়ে গুহাবৎ দেখায়, তার মুখে কালো পরদা ঝুলছে, তারই গায়ে আঁকা সাদা রঙের নরকঙ্কালের ভয়ঙ্কর ছবি, দেখেই রক্ত বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

"এর নাম দুম্বা পীর। ভূতের এরকম লেজ দেখে কখনও? উল্কা আকাশে ছিটিয়ে গেলে যেরকম ঝরা আগুনের স্রোত হয়, ঝাঁটার মতো, দুম্বার সেইরকম লেজ ছিল। ওইটে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে উনি জিন তাড়াতেন, ভূতের চালচলন সিধে করতেন। মিশরের লাল দরিয়ার তীরে তাঁর ছিল বাবার নৌকো গড়ার ব্যবসা। ব্যবসায় তাঁর মন ছিল না।"

"তো, কীসব বলছেন আপনি খুড়ো? এখানে সেই পীর থাকতেন?"

"হ্যাঁ। এ ছিল সাহেবের হাওয়াখানা। ওই পীরকে উনি আশ্রয় দেন। এখন আমিই এখানে পীরের খিদমত করি, মানে সেবা করি। এই পটের নকশা তাঁরই শিক্ষা। তাঁর হাতে ছিল একটা লাঠি। জাদুলাঠি বলা যায়। এই গোটা চাকলা ছিল আমার ঠাকুরদার বাবার তিনপুরুষ আগের জমিজিরাত। সাহেবরা কেড়ে নিয়ে কুঠি বসায়। ঠাকুরদার পূর্বপুরুষরা এখনও আছেন। কঙ্কাল সরোবরের ধারে একটা মহল আছে, সেখানে।"

"কীভাবে আছেন তাঁরা?"

"কঙ্কাল হয়ে ঝুলছেন।"

"পীরের লাঠিটা?"

"তাও আছে। সুলেমানি আষা। ময়ূর মহল যখন তৈরি হচ্ছে, বাদশা একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে লাঠিটা পিছনে প্যালা দিয়ে মানে ঠেকনো করে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। রাতদিন যতক্ষণ কাজ চলত, উনি দাঁড়িয়ে থাকতেন। দুম্বা পীরের পূর্বপুরষরা মিস্ত্রি ছিল। তারা কাজ করতে করতে মুখ তুলে বাদশাকে যে একবার চেয়ে দেখবে, তাতেও ভয়। এতই কড়া বাদশা ছিলেন সুলেমান।"

"তারপর?"

"একদিন বাদশা কাজের তদারকি করতে করতে

লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই মারা গেলেন, কেউ জানতেও পারল না। তখন বাদশার পোষা জিনেরা বাদশাকে ওইভাবেই খাড়া করে রেখে দিল। লোকের বাদশা রয়েছেন দেখে হাত চালিয়ে রাতদিন কাজ করে মহল বানিয়ে ফেলল। দুম্বার বাবা হেড মিস্ত্রি। কাজ শেষে বাদশার সামনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম দিলে। মিস্ত্রির হাতের সামান্য ধাক্কা লেগে গেল বাদশার পায়ে। বাদশা উলটে পড়ে গেলেন। তখন দুম্বার বাবা বুঝলেন, তারাও কেউ বেঁচে নেই, তারা সব ভূত হয়ে গেছে।"

আবিরমামা বললেন, "আমার নেশা হয়েছে খুড়ো। জ্বর-জ্বর লাগছে। ফিটনের শব্দ পাচ্ছি। বাদশার লাঠিটা কোথায় দুম্বার বাপ. . ."

"হ্যাঁ গো! ওই লাঠি হাতে করে দুম্বা তখন মরুভূমির বুকে বিবাগী হয়ে পীরত্বের জন্য বের হয়ে চলে আসেন। জিনসিদ্ধ লাঠি। নীল সাহেব ভেবেছিল তারাও ওইভাবে চাবিদের ওপর তদারকি করবে। মরে গিয়েও পাহারা দেবে। সেইজন্য কঙ্কাল লটকে রেখে গেছে।"

ধীরে-ধীরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো হয়ে পড়েন মামা আবিরলাল। কঙ্কাল সরোবরের পাড়ে এসে দাঁড়ালেন মামা আর দিনুখুড়ো। এক আশ্চর্য দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাইতে লাগলেন দিনু সিকদার। সরোবরে অনেক রকমের ফুল ফুটেছে। নানা তার রং। সাদা ফুলগুলো হিরের মতো জ্বলছে।

হঠাৎ জল তোলপাড় করে ভেসে উঠল কয়েকটি কঙ্কাল। তারপর তারা জলের ওপর অনেকখানি খাড়া হয়ে উঠে নাচতে শুরু করল। এরা কি সব মিস্ত্রি?

"নাচে কারা খুড়ো?"

"কই, কারা নাচে বাবা?"

"আমি যে দেখছি।"

"নেশা হয়েছে আবির। খুয়াব-এ-দুম্বা পাচক খেয়েছ, হাতেনাতে ফল পাচ্ছ। ভূত তো কেউ বিশ্বাস করে না, প্যাঁচে পড়লে করে। আর কী দ্যাখো হে?"

কত কী যে দেখতে পাচ্ছিলেন মামা। ভূতের পট বারবার চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছিল। একটা রাজ-ভূতের নাম ভারত-ভূশণ্ডী জননাথন, আর একটা উপজাতি ধরনের ভূতের নাম কিমাশ্চর্য পারস্যের চাকমা, ছোট রাজ্যের নাম কিমাগড়। সেই কিমাগড়ের ভূতের জমিদার গরুড়ানন্দ পটপটেশ্বর, তাঁর বংশলতিকায় নিম্নস্থানে রয়েছে মির্জা আয়কমবায়কম ক্ষতিবুদ্দিন গাড়োয়াল। সত্যি সেলুকাস! কী বিচিত্র এই কুঠিয়ালি ভূতের দেশ!

একটা দেওয়ার গাছের দিকে মামার চোখ চলে যায় সহসা। সরোবরের নাচ থেমেছে, আশ্চর্য পূর্ণিমায় মৃতেরা কি এইভাবে জেগে ওঠে? দেওদারের মাথার ওপর গোল চাঁদ ফটফট করে হেসেই আকুল। গাছের নীচে ঘাসের জমিতে অত্যন্ত ফরসা একটি মেয়ে বসে দাঁত দিয়ে ঘাস কাটছে। অপূর্ব তার রূপ। ও কারও দিকে চাইছে না, আকাশ পারে চেয়ে আছে। ওর চোখ দিয়ে গলে পড়ছে নিঃশব্দ কান্নার জল। কেন কাঁদছে ওই সুন্দরী? ওখানেই বা ওইভাবে বসে আছে কেন? ও কি পরী? ও কি মানুষ নয়? ওর ডানা কোথায়? ও কি কারও জন্য প্রতীক্ষা করছে? তবে কি সে কোনও রাজকন্যা?

খুড়ো আবিরমামার একটা হাত চেপে ধরে ছড়া কাটলেন ঃ

দোল দোল দুলুনি
ভূতের মাথায় চিরুনি।

অবাক হয়ে দেখলাম, মেয়েটির মাথার চুলে একখানা চিরুনি গোঁজা। মামা এইভাবে বলেছিলেন আমাদের। ওঁর মনে হয়েছিল, এমন সুন্দর মেয়ে কি কখনও ভূত হয়?

খুব সাহস করে দেওদার তলায় এগিয়ে গিয়ে মামা দেখলেন কোনও মেয়ে নয়, ছায়ামেশানো খানিকটা জ্যোৎস্না, আর কিছু নেই। মামা এবার যথেষ্ট ভয় পেয়ে গেলেন। জ্যোৎস্না তাহলে নিজেই কখনও কখনও সুন্দরী মেয়ে সেজে বসে থাকে। পরী হয়। যদিও মাথায় গোঁজা থাকে ভূতের চিরুনি।

দিনুখুড়ো অতঃপর মামাকে একটি অন্ধকার মহলে ঢুকিয়ে দিলেন। ঘরে ঢুকেই অদ্ভুত দীর্ঘশ্বাস শুনতে পান মামা। হাড়ে হাড়ে ঘা লেগে কেমন শব্দ হচ্ছে। কারা যেন কথা বলতে চাইছে। অথচ শব্দ ফুটে বের হচ্ছে না, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। মামার হাতে লাগল হাড়ের মতো শক্ত বাঁচা একটি। বুঝতে পারলেন, শূন্যে ভাসছে মানুষের কঙ্কাল কয়েকটি। কী দিয়ে টাঙানো আছে অন্ধকারে বোঝা

যায় না। ওই ওপরে ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য জ্যোৎস্নার আভা আসে, তাতে কঙ্কালগুলোকে আরও ভয়াবহ মনে হয়।

ফিসফিস করে উঠল কারা? কানের ওপর শ্বাস ফেলল কে? হি হি করে হাসছে একজন। কোনও একটা অদৃশ্য ফোকর বা গবাক্ষ দিয়ে খুব হাওয়া আসছে মনে হয়। কে যেন বলল, "আমরা সব খেটে খাওয়া মানুষ বাবা! আমার নাম তোরাপ। নাটকের লোক। দীনবন্ধুবাবুর নাটক। মনে নেই? এখানে চাষিবউ খুব নাদান হয়, কাঁদে গো!"

আবিরলাল কঙ্কাল ঠেলে-ঠেলে ঘরের মধ্যে পাগলের মতো ঘুরতে লাগলেন। বাইরে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করছেন দিনুখুড়ো। কাকে যেন আয় আয় করে ডাকছেন। মনে পড়ে গেল গো-জিনের কঙ্কাল ভক্ষণ করতে আসার কথা।

কঙ্কাল ঠেলতে-ঠেলতে ঘেমে উঠেছিলেন মামা। গায়ে এসে আছড়ে পড়ছিল তারা, কপালে লেগে ঝনঝন করে উঠছিল। হঠাৎ চড়া গম্ভীর গলায় কে যেন বলল, "স্কাউন্ড্রেল! পুওর কালটিভেটার। হামি টুমার কালিজা খাবে। হামার দণ্ড ডিয়া প্রহার করবে, কিল করবে।"

অনেক কষ্টে কঙ্কাল মহল থেকে বের হয়ে আসেন মামা। বাঁশবাগানে ছায়া আর জ্যোৎস্নার মাখামাখি, কী একটা জীব ওখানে ঘুরছে। কালো তার রং। তাকেই বোধহয় ডেকে চলেছেন দিনু সিকদার। মামা বাইরে এসে সিঁড়ির ওপর বসে পড়লেন। ক্লান্তিতে আর ভয়ে হাঁফ নিতে-নিতে হঠাৎ মহলটার বাইরের একটা থামে পেতলের চাকতির ওপর চোখ পড়ে তাঁর। থামের গায়ে সাঁটা। উঠে গিয়ে মামা দেখলেন চাঁদের স্পষ্ট আলোয় লেখা রয়েছে, ইংরেজিতে, 'সায়েন্স ল্যাব'। তারপর সাহেবের নাম লেখা। এ তাহলে ল্যাবরেটরি, কঙ্কাল থাকবে না কেন!

এতক্ষণ তাহলে কী সব কথা শুনলেন আবিরলাল? তাঁর আশ্চর্য লাগছিল ই আর কি অর্থাৎ ইয়ার্কি, মুই আর কি—ফট, ফটকা, হাওয়াই সটকা দিনু সিকদারের কাণ্ড দেখে! দিনু পট লেখে। ভূতের ছবি আঁকে। নানা কথায় বানিয়ে-বানিয়ে অবাক ভয়ঙ্কর কুঠিয়ালির প্রেতরাজ্য গড়েছেন।

বাঁশবনে হাড় খাচ্ছে পশুটা। ভয়ই করছিল মামার। এখানে ভাগজোত করতে সত্যিই কোনও চাষি সাহস করে আসবে না। এ শুধুই দিনুখুড়োর ভাগজোতের জায়গা, তিনি ভূতের ভয় দেখিয়ে অন্য চাষিদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন, একা ভোগ করছেন শেঠের চৌধুরীদের কুঠির সম্পত্তি। দিনুর অবস্থা কিন্তু সম্পন্ন।

বাঁশবনের দিকে সাহস করে এগিয়ে চললেন মামা আবিরলাল। ছায়া আর জ্যোৎস্নায় সে এক বিচিত্র সমাবেশ। মটমট করে শব্দ করছে বাঁশের গ্রন্থি, মনে হচ্ছে তারা বাতাসের মুখ-গহ্বরে হাড় চিবিয়ে চলেছে।

বাঁশের ঠোঙা আর মরা পাতায় পা পড়ে পিছলে যেতে চায়। এক-একটা মানুষ থাকে, হাঁটাচলার সময়ও যাদের হাড় মটমট করে, দিনু সেইরকম মানুষ।

মামার পেছনে মটমট করে ছুটে আসেন খুড়ো। তাঁর দেহের গ্রন্থি কি আলগা? এই বয়েসেও খুব খাটিয়ে লোক, লাঙল চালাতে পারেন, মই চড়ে কোমর সিধে করে দাঁড়াতে চান জমির ওপর।

খুড়ো বললেন, "মানুষের হাড়ের চিরুনি কখনও দেখেছ আবিরলাল? দেওদার গাছের ওখানে পড়ে ছিল। নাও, হাতে নিয়ে দ্যাখো।"

কী আশ্চর্য! সব বুঝেও মামা হাত বাড়াতে গিয়ে কেমন সাহস হারিয়ে ফেললেন। তখন দিনু পাহারাদার উঁচু স্বরে হো হো করে হেসে ফেললেন। তাঁর দাঁতগুলো কি নকল? এত বয়সে দাঁত থাকার কথা নয়। মনে হল, তিনি একটা ভূতের মতো হেসে চলেছেন।

কালো জীবটা মাটি শুঁকে শুঁকে কী যেন খুঁজছে, আরে এ তো ভাগাড়। হাড় খুঁজছে নির্ঘাত। ওটা তাহলে কী ধরনের প্রাণী?

খুড়ো বললেন, "লোম আছে। কাছে এলে মানুষের হাড়ের চিরুনি দিয়ে ওর গা আঁচড়ে দিই বাবা। পশুটা আনন্দ পায়।"

আর সাহস হল না মামার। এখানে সব কেমন উলটোপালটা হয়ে গেছে। গো-জিনের গায়ের লোম আঁচড়ে দেওয়া হয় মানুষের হাড়ের চিরুনি দিয়ে, ভাবলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

পাওটা নিশ্চয়ই খুব ভীরু। কাছে আসতে চাইছে না। মামা একটা দুর্বোধ্য ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। সেই শব্দে গো-জিন পালাতে পালাতে ভেউ করে কেঁদে উঠল। মামা ওকে তাড়া করে ছুটতে লাগলেন।

মামা বসেছিলেন, দক্ষিণ কলকাতার এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে। বন্ধুর পত্নী একজন বড় আমলা। তাঁর গাড়ির গ্যারাজের পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে দেওয়ালে প্লেটে সুন্দর করে ইংরেজিতে লেখা, 'কুকুর হইতে সাবধান'।

কুঠির কুকুরটা ছিল পথের কুকুর। খিদের জ্বালায় ওই ভাগাড়ে পুরনো হাড় খুঁজে খেতে এসেছিল। তেড়ে ধরতে না পারলেও মামা ছুটতে-ছুটতে এক সময় বুঝতে পেরেছিলেন ওটা নিতান্তই ক্ষুধার্ত শীর্ণ কুকুর, রোগা, অসহায়। পথে পথে তার জীবন কেটে যায়।

কলকাতার বন্ধু থাকেন প্রকাণ্ড উচ্চ সৌধে। এত বড় ফ্ল্যাট, আর চারদিক শোভাময়, দেওয়ালে লক্ষ টাকার চিত্র টাঙানো। একটি ভয়ঙ্কর হিংস্র কুকুরকে সঙ্গে করে এসে দেখা দিলেন মিসেস ঝা। তাঁর বাংলা উচ্চারণে কেমন ইংরেজির মতো গন্ধমাখানো, শ্বাসাঘাতে ইংরেজির মতো জড়িমা। কুকুরটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে একটি স্পটিকশুভ্র পাথরের দামি প্লেটে ভর্তি করা সাদা শাঁক আলুর খাবার এগিয়ে দিলেন। তাঁর স্বামী বড় ব্যবসায়ী। কলকাতার বুকে তিনি বস্তি উঠিয়ে দিয়ে ইমারত তৈরির ব্যবসা করেন। প্রমোটার।

মামার বন্ধু হওয়ার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েছেন। সামান্য একটা কথা জেনে নেওয়ার জন্য এসেছেন মামা। কিন্তু লোকটা যে এত ধনী তা তিনি জানতেন না। স্ত্রী বাঁ হাতে চিরুনি ধরে মাথার চুল আঁচড়ে নিতে নিতে অকারণ হেসে মামাকে দৃষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। নিজের চুল আঁচড়ে নিয়ে কুকুরকে খাওয়াতে-খাওয়াতে হঠাৎ সেই চিরুনি কুকুরের বলিষ্ঠ গায়ে লোমের ভিতর চালাতে-চালাতে কথা বললেন, "আপনার নাম?"

কুকুরটার দেহ কেমন পুলকিত হয়ে উঠল। চোখ তুলে মামার চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টিক্ষেপ করল কুকুরটা। প্রাণীটার লেজ আগুনের ঝাঁটার মতো লেলিহান। মামা আশ্চর্য ভয় পেয়ে লক্ষ্য করলেন, এ নির্ঘাত গো-ভূত। হাড় খায়।

মরুগ্রাস

সঙ্কর্ষণ রায়

মিনতি মাখানো স্বরে উটওয়ালা দিলদার খাঁ তার উটের উদ্দেশে বললে, 'উঠ্ মেরা উটরানী।' কিন্তু উট নির্বিকার। তার হাবভাবে মনে হলো উটওয়ালার কথা যে তার কানেও যাচ্ছে না।

রাজস্থানে থর মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তে বারমেরের কাছে উত্তরলাই গ্রামে ক্যাম্প করে আমি এ অঞ্চলের মাটির তলায় চাপা পড়া জলের স্তরের খোঁজ নিচ্ছি। স্থানীয় কুয়োগুলোর মধ্যে তার হদিস মেলে না, কারণ এই সব কুয়ো অগভীর। তারা অস্থায়ী জলের স্তরকে ছুঁয়েছে। পুব দিকে উত্তরলাই থেকে দশ কিলোমিটার দূরে একটি বিশুদ্ধ জলের বড় আকারের হ্রদ আছে। ওখানে স্থায়ী জলের স্তরের নাগাল পাওয়া যেতে পারে। এ কথা আমার গাইড মকবুলকে বলতেই সে ডেকে নিয়ে এসেছে উটওয়ালা দিলদার খাঁকে। আমাকে তার উটের পিঠে চাপিয়ে ঐ হ্রদের ধারে নিয়ে যেতে বলেছে। দিলদার নিয়ে এসেছে তার উট। তার পিঠে চেপে বসেছি। কিন্তু সে উঠছে না।

'উট যে উঠছে না!' কাতর স্বরে বললে দিলদার খাঁ। 'কি করি বল তো মকবুল?'

'চালক হয়েও তুমি ওকে ওঠাতে পারছ না!' মকবুল শ্লেষমাখানো স্বরে বললে, 'দাঁড়াও ওকে আমি মোক্ষম দাওয়াই দিচ্ছি. . . '

বলে মকবুল ঝুঁকে পড়ে উটের গোটানো সামনের পা যেখানে শরীরে মিশেছে, সেখানে কাতুকুতু দিতে থাকে। কাতুকুতু দিতেই উট উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করে।

'ওকে থামাও দিলদার।' আমি বললাম, 'মকবুলকে তুলে নিতে হবে।'

'না হুজুর।' গম্ভীর মুখে দিলদার খাঁ বললে, 'মকবুলকে আমার উট কখনোই পিঠে তুলবে না। মকবুলের ওপরে ও রেগে গিয়েছে।'

'রেগে গিয়েছে কেন?' আমি প্রশ্ন করি।

'এমনি কাতুকুতু দিলে কার না রাগ হয় বলুন।'

'কাতুকুতু দিলে তো মানুষ হাসে। সে হাসি কি রাগের হাসি?'

'হ্যাঁ হুজুর, কাতুকুতুর হাসি রাগের হাসি।'

'কিন্তু মকবুল ছাড়া আমি যে অচল। ও আমার সঙ্গে না থাকলে কে আমাকে পথ দেখাবে?'

'আমি দেখাব। যেদিকে এখন আমরা যাচ্ছি, সেদিককার পথ মকবুলের চেয়ে আমি ভাল চিনি। আমার চেয়ে ভাল চেনে আমার উটরানী। চোরাবালি বাঁচিয়ে পথ চলতে সে-ই পারে. . . '

একটানা বালির বিস্তারের মধ্যে কোথায় আছে চোরাবালি তা চোখে দেখে বোঝা যায় না। কিন্তু

দিলদারের উটরানী চলতে চলতে বুঝে নেয়। চোরাবালির পাশ কাটিয়ে যেতে থাকে সে।

উটওয়ালা দিলদার উটের চালক। কিন্তু চালক হিসেবে তার ভূমিকা কি তা বুঝতে পারি না। কারণ উটের পিঠে সে আমারই মতো জড়ভরত হয়ে বসে আছে। উটের মুখের লাগাম তার হাতে থাকলেও তাতে সে বিন্দুমাত্রও টান দিচ্ছে না।

'ব্যাপার কি দিলদার!' আমি বললাম, 'তোমার উটরানী তো নিজের মনেই চলেছে। তোমার হাতে লাগাম, তবু চালাচ্ছ না!'

'চালাব কি হুজুর!' দিলদার বললে, 'কোথায় চোরাবালি বুঝতে পারি না, আমি চালাতে গেলে তো উটরানীকে চোরাবালির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলবো।'

'তার মানে, তোমার উটরানী যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যাচ্ছে!'

'না হুজুর। কোথায় যেতে হবে তা আমি আগেভাগেই বুঝিয়ে দিয়েছি উটরানীকে। ঠিক পুব দিকেই আছে ঐ নিপট। ঐ দিকেই সে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের. . . '

'কি করে বোঝালে?'

'ইশারা করে, গায়ে হাত বুলিয়ে। চলতে শুরু করার আগেই বুঝিয়ে দিয়েছি।'

'সে বুঝেছে কি না তা বুঝলে কি করে?'

'ওদিকে যেতেই চাইছিল না সে। উঠতেই চাইছিল না উটরানী। এর আগেও যত বার ওদিকে যেতে চেয়েছি, তত বারই সে এমনি উবু হয়ে বসে থেকেছে।'

'কেন বল তো?' আমি প্রশ্ন করি।

'দেখছেন না পথ কি রকম ভয়ঙ্কর।' দিলদার জবাব দিল, 'পদে পদে চোরাবালি. . .'

'চোরাবালি তো চেনে তোমার উট। তবু ভয়?'

'চেনে বলেই ভয়।'

'পথের কথা বলছ, কিন্তু পথ কই?'

'রেগী-স্থানে (বালির স্থান—মরুভূমি) পথ দেখা যায় না, পায়ে পায়ে চিনে নিতে হয়। তা-ই করছে আমার উটরানী।'

বালির মধ্যে এঁকে-বেঁকে চলে দিলদারের উট। দিলদার চুপ। তার মুখে-চোখে উৎকণ্ঠা। আমি কথা বলার চেষ্টা করতেই সে ইশারা করে থামিয়ে দিচ্ছে আমাকে।

কেন কথা কইব না, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে দিলদার বললে, 'দেখছেন না, আমাদের কথা কওয়া উটরানী পছন্দ করছে না। কোনো চিন্তা নেই, ও আমাদের ঠিক জায়গাতেই নিয়ে যাচ্ছে। এই দেখুন না, সোজা পুব দিকেই যাচ্ছে. . . '

আমার কোমরের বেল্টের সঙ্গে একটা চামড়ার কেসে কম্পাস বাঁধা ছিল। কম্পাসটা বের করে দেখি, চোরাবালি বাঁচিয়ে, ঠিক পুব দিকেই যাচ্ছে দিলদারের উট।

দিলদার খাঁ মরুভূমির মানুষ হলেও মরুভূমির বালির মধ্যে চোরাবালি চেনে না। মরুভূমি আমার গবেষণা ও সন্ধানের ক্ষেত্র হলেও আমি চোরাবালি চিনি না। অতএব আমাদের একমাত্র ভরসা দিলদারের উটরানী। সে যদি হঠাৎ বিগড়ে গিয়ে থেমে যায়, কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ে, চোরাবালি গ্রাস করবে আমাদের।

'তোমার উটরানীকে খুশি রাখ দিলদার।' ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠি, 'দেখো, সে যেন বিগড়ে না যায়।'

'খুশি আর রাখতে পারছি কই?' দিলদার খাঁ কাতর স্বরে বললে, 'যেতে চাইছে না, তবু নিয়ে যাচ্ছি। জানি না, আমাদের তগদিরে আজ কি আছে! মনে মনে আল্লার কাছে দোয়া মাঙ্গুন হুজুর। আর দোহাই আপনাকে, চুপ করে থাকুন। উটরানীর হাবভাবে বুঝতে পারছি আমাদের কথাবার্তা সে সইতে পারছে না. . . '

নিঃশব্দে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে উটরানী। বালির ওপরে লম্বা লম্বা পা ফেলছে কিন্তু কোনো শব্দ হচ্ছে না। কেমন ভয় হতে থাকে আমার। মনে হয় এই নীরবতার মধ্যে মরুভূমির আক্রোশ যেন পুঞ্জীভূত।

চারপাশে বালি রোদে ঝলমল করছে। বেলা বেড়ে যেতে রোদের প্রখরতা বাড়ে, বালির কণাগুলো আগুনের কণায় পরিণত হয়। তাদের মধ্য দিয়েও সোচ্চার হয়ে ওঠে মরুভূমির আক্রোশ। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের দুটো কলি হঠাৎ মনে পড়ে গেল ঃ

'নিঠুর তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মত
তোমার রক্তনয়ন মেলে।'

বালির রক্তনয়নে মৃত্যুক্ষুধাই ফুটে উঠছে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধার্ত পাষাণ' গল্পের রাজপ্রাসাদের ক্ষুধিত পাথরের মতো ক্ষুধিত বালি যেন ওৎ পেতে আছে। উটরানী একটু অসতর্ক হলেই সে আমাদের গ্রাস করে ফেলবে।

বালির সমুদ্রের মধ্যে প্রায় দিশেহারা বোধ করতে

শুরু করেছি, ভেবে পাচ্ছি না এর শেষ কোথায়। এমন সময় রিক্ততার বুকে হঠাৎ একটা অপরূপ ছবি ফুটে ওঠে। দেখে মনে হলো যেন কেউ ধূসর রঙের ক্যানভাসে নিবিড় সবুজ রঙের ছবি এঁকে আমাদের চোখের সামনে বসিয়ে দিয়েছে।

ছবি নয়, গাছপালা ও ঘাস দিয়ে ঘেরা একটি হ্রদ। স্থানীয় ভাষায় হ্রদকে বলে 'নিপট'। দিলদার খাঁ বললে, 'পৌঁছে গিয়েছি হুজুর। এই নিপটই তো দেখতে চেয়েছিলেন. . . '

নিপটের নিকটে এসে নিজের থেকেই দাঁড়িয়ে পড়ল উটরানী। উত্তরলাই থেকে যাত্রা শুরু করার পর এই প্রথম দিলদার খাঁ উটরানীর মুখে লাগানো লাগাম ধরে টান মারার সুযোগ পেল। লাগাম ধরে মৃদুমন্দ টান দিতেই উটরানী বসে পড়ে।

উটের পিঠ থেকে নেমে পড়ে আমি বললাম, 'এখন আমি এই হ্রদটাকে পরীক্ষা করব। তোমার উটরানীকে নিয়ে তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম কর।'

'কতক্ষণ হুজুর?' দিলদার খাঁ প্রশ্ন করে।

'এই ধরো ঘণ্টা দুয়েক।' আমি জবাব দিলাম।

'কাছেই আমার ফুফুর (পিসির) বাড়ি। এই দুই ঘণ্টার মধ্যে আমি ফুফুর সঙ্গে মোলাকাত করে আসব।'

'কাছাকাছি কোনো লোকালয় তো চোখে পড়ছে না। এই জনমানবশূন্য জায়গায় কোথায় তোমার ফুফুর বাড়ি?'

'নিপটের ওপারে ছোট একটি গ্রাম আছে, এখান থেকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। আমার উটরানীর পিঠে চেপে ওখানে আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। চিন্তা করবেন না, দু'ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।'

উটরানীর পিঠে চেপে চলে গেল দিলদার খাঁ। হ্রদের তীর বরাবর এগিয়ে গেলেও বালিয়াড়ি ডিঙিয়ে যেতে হয় তাদের। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

হ্রদের জল পরীক্ষা করতে এসেছি, কাজেই পুরোপুরি হ্রদের জলের দিকে মনোনিবেশ করি। মরুভূমির মাঝখানে এই বিপুল জলের বিস্তার বিস্ময়কর। কোথা থেকে এল এত জল?

বৃষ্টিপাত এখানে খুবই কম। এই হ্রদ সৃষ্টিতে জলের ভূমিকা খুবই নগণ্য। নিঃসন্দেহে এর উৎস ভূগর্ভের জল। অর্থাৎ মাটির নিচে জলবাহী পাথরের স্তর আছে, সেই স্তর থেকে জল বেরিয়ে এসে হ্রদকে পুষ্ট করেছে। আকারে হ্রদটি বেশ বড়। ভূগর্ভের জলের স্তর থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বেরিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। বেরিয়ে এসেছে শুধু নয়, বেরিয়ে আসছে সর্বদা। নইলে এই হ্রদের জল শুকিয়ে যেত।

হ্রদের বিপুল জলের বিস্তারের মধ্যে ভূগর্ভের স্থায়ী জলের স্তরকে যেন দেখতে পাই। ভূগর্ভের জলের স্তর এখানে ভূপৃষ্ঠে উঠে এসেছে। ভূগর্ভে মরুভূমির তলা দিয়ে তা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে বালি পরীক্ষা করে বলা কি সম্ভব?

বোধহয় না। মরুভূমির বালির দিকে তাকিয়ে কখনো অন্তঃসলিলা নদীর অস্তিত্বের আভাস মেলে না। বালি পরীক্ষার চেয়ে ভাল এরকম আরও কয়েকটি হ্রদ খুঁজে বের করা। আরও হ্রদ খুঁজে পেলে হ্রদগুলির মাঝখানকার অঞ্চলে নিশ্চিন্ত মনে ড্রিলিং করে জলের স্তরের নাগাল পাওয়া যেতে পারে। অতএব দিলদার খাঁয়ের উটরানীর পিঠে চেপে আরও অভিযানে বেরোতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে আরও হ্রদ, দিলদার খাঁ যাকে বলছে নিপট।

'বাবুসাব!' আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল একটি বাজখাঁই গলার আওয়াজে। চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি একজন লম্বা-চওড়া সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো এসে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে। সে আমার কাঁধে হাত রেখে বললে, 'এখান থেকে চল। এখনই. . . '

'কেন?' আমার প্রশ্নের জবাবে মুখে কিছু না বলে সে আমার হাত ধরে হ্রদের ধারে একটি পাথরের ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

'এখানে নিয়ে এলে কেন আমাকে?' আমি রাগত স্বরে বললাম, 'কোথাকার কে তুমি, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়।'

'আমি যেই হই না কেন, তোমাকে বাঁচাবার জন্য নিয়ে এসেছি এখানে।' বুড়ো শান্ত গম্ভীর গলায় বললে, 'আঁধি আসছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এসে যাবে. . . '

'আঁধি! কই তার কোনো লক্ষণ তো. . . . '

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে এল বালির ঝড়। এল না বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বলা উচিত। পাথরের ঘরে আত্মরক্ষা করে বাইরে তার তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করি।

আকাশ ও মাটির মাঝখানের শূন্যস্থান পূর্ণ হয়েছে

বালি দিয়ে। বালির মধ্যে আবর্তের পর আবর্ত ওঠে। এক একটি আবর্ত যেন আকাশ-মাটি-জোড়া স্তম্ভের আকার নেয়।

'দেখছ তো!' বুড়ো বললে, 'বালির ঐ ঘূর্ণির মধ্যে পড়লে খড়কুটোর মতো উড়ে যেতে।'

'দিলদার খাঁয়ের কি হলো কে জানে!' আমি বললাম, 'সে তার উটের পিঠে চেপে নিপটের ওপারের গাঁয়ের দিকে গেল।'

'দিলদার খাঁ মরুভূমির মানুষ, উট মরুভূমির জানোয়ার। আঁধির মধ্যে আত্মরক্ষার কৌশল ওদের জানা আছে।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে ঝড় থেমে গেল। ঝড় থামলেও বাতাসে বালি ভেসে বেড়ায়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বালি সিল্কের পর্দার মতো মাটি থেকে উঠে আকাশকে ছুঁয়ে থাকে।

পাথরের ঘর থেকে বেরিয়ে বালির কুয়াশার মধ্যে হ্রদের ধার দিয়ে হাঁটি। পাথরের ঘরটি পাথরের স্তরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। খুব মন দিয়ে এই পাথর পরীক্ষা করি। আমার আশা পাথরের মধ্যে ফাটল দেখতে পাব, যার ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে এসে এই হ্রদকে পুষ্ট করে যাচ্ছে। বুড়ো আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, 'কি খুঁজছ অত মন দিয়ে?'

'পাথরের মধ্যে ফাটল খুঁজছি।' আমি জবাব দিলাম, 'যার ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে।'

'ফাটল আছে জলের তলায়। তাকে চোখে দেখা যায় না। চোখে দেখা না গেলেও তার অস্তিত্ব আমি টের পাই।'

'কি করে?'

'আওয়াজ শুনে। সর্বদাই শুনতে পাই ফাটলের ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে আসার আওয়াজ।'

'কই, আমি তো শুনতে পাচ্ছি না।'

'কান পেতে থাক, শুনতে পাবে।'

বুড়োকে প্রশ্ন করে তার পরিচয় জেনে নিই। তার নাম মইনুদ্দিন। যে পাথরের ঘরে সে থাকে তার পাশেই আছে জনৈক পীরবাবার সমাধি। আর আছে একটি শিবমন্দির। দুয়েরই দেখাশুনা করে সে।

'দরগা ও মন্দির দুয়েরই দেখাশুনা কর তুমি!' আমি অবাক হয়ে তাকালাম বুড়োর মুখের দিকে।

'হ্যাঁ।' বুড়ো মৃদু হেসে বললে, 'একই সঙ্গে দরগা ও মন্দিরের দিকে মন দিতে কোনো অসুবিধে নেই আমার। কারণ দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাই না।'

www.arisumu.com

'শিবমন্দিরের পুজো-আচ্চা, নিত্যকর্ম এসবও কি তুমিই কর নাকি?'

'এসবের আমি কি জানি! তবে মনে মনে সর্বদাই পুজো করি. . . '

মইনুদ্দিনের অনুরোধে আবার তার পাথরের ঘরের মধ্যে ঢুকি। জোয়ারি রুটি সেঁকে খেতে দেয় সে আমাকে। রুটির সঙ্গে দেয় আলুর তরকারি।

খাওয়া সেরে দিলদার খাঁ ও তার উটের জন্য অপেক্ষা করি। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে আসে, সূর্য অস্ত যায়, সন্ধ্যা ঘনায়। কিন্তু দিলদার আসে না তার উট নিয়ে।

'ব্যাপার কি ভাইসাব?' মইনুদ্দিন তার দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, 'উটওয়ালা তোমাকে না নিয়েই চলে গেল নাকি?'

'না না, এ হতেই পারে না।' আমি বললাম, 'আমাকে নিয়ে এসেছে,, আমাকে বাদ দিয়ে নিশ্চয়ই যাবে না।'

'যেতেও পারে। উটের মেজাজ-মর্জি যদি ঠিক না থাকে তোমাকে বাদ দিয়েই চলে যেতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে উট হয়তো দিলদারের ফুফুর বাড়ি থেকে আসতেই চাইছে না। হয়তো উঠছেই না. . .'

'ঠিক বলেছ। উত্তরলাইতে দিলদারের উট উঠতেই চাইছিল না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দিলদার যদি তার উট নিয়ে না আসে আমি কি করে এখান থেকে বারমের যাব?'

'অন্য কোনো উটের পিঠে চেপে যাবে। কাল সকালে আমার উট রসদ নিয়ে গাঁ থেকে আসবে। সেই উটের পিঠে চাপিয়ে আমি নিজে তোমাকে উত্তরলাই নিয়ে যাবো। আজ রাতের মতো তুমি আমার গরিবখানায় থাকো।'

ক্রমশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। সম্ভবত সেদিন অমাবস্যা। রাতে কখনোই চাঁদ দেখা দেবে না। আকাশে চাঁদ না থাকলেও একটা অস্ফুট আলো বালির স্তর এবং নিপটের জল থেকে বেরিয়ে আসছে। এটা হয়তো আকাশের তারার আলোর প্রতিফলন কিংবা বালি বা জলের সঙ্গে মিশে থাকা স্বয়ংপ্রভ কোনো পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসা আলো। মইনুদ্দিনকে ডেকে বললাম, 'দেখেছ কি রকম অদ্ভুত আলো।'

'ভুতুড়ে আলো এটা।' মইনুদ্দিন গম্ভীর মুখে জবাব দিল, 'এই আলোর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে নেই, চল ভেতরে যাই।'

ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে জোয়ারি রুটি সেঁকে মইনুদ্দিন। ওবেলার তরকারি ছিল, তাই দিয়ে রুটি খেয়ে নিয়ে আমরা শুয়ে পড়ি ঘরের মেঝেতে বিছানো খড়ের গাদার ওপরে। সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কাজেই শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ি।

গভীর রাত্রে হঠাৎ দিলদারের ডাকে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে থেকে দিলদার ডাকছে, 'বাবুসাব, বাবুসাব. . . '

ধড়ফড় করে উঠে বসি আমি খড়ের গাদার ওপরে।

'বাবুসাব, বাবুসাব!' ডেকেই চলে দিলদার, 'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসুন, উটরানীকে নিয়ে এসে গিয়েছি আমি।'

দিলদারের ডাক শুনে আমার ঘুম ভাঙলেও মইনুদ্দিনের ঘুম ভাঙে না। এমনি গভীর ঘুমে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে দিলদারের ডাক তাকে স্পর্শও করে না।

আবার ডাকে দিলদার। আর দেরি না করে কোমরের বেল্টে কম্পাস গুঁজে কাঁধে হাতুড়ি, বালি ও পাথরের নমুনা দিয়ে ভরা ঝোলা ঝুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

বাইরে এসেই দেখি উটের পিঠে বসে থাকা দিলদারকে। সন্ধ্যার পর অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে যে অস্ফুট আলো বালি ও জলের ওপরে ফুটে উঠেছিল তা এখন গুটিয়ে এসে দিলদার ও তার উটকে ঘিরে ফেলেছে। যেন থিয়েটারের স্টেজের ওপরে ফেলা স্পট-লাইটের মতো আলোর বৃত্তের মাঝখানে এসে পড়েছে তারা।

দিলদারের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে উটের পিঠে পেছন ফিরে বসেছিল, উটও দাঁড়িয়েছিল পেছন ফিরে।

'উঠে পড়ুন হুজুর।' দিলদার ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে, 'আর একটুও দেরি করবেন না। ভোর হতে আর দেরি নেই।'

'ভোর হলে পর রওনা হলে হতো না!' আমি বললাম, 'চোরাবালি বাঁচিয়ে যেতে হবে, দিনের আলোতেই তো যাওয়া উচিত।'

'না না, দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই উত্তরলাইতে পৌঁছাতে হবে আমাদের। নিন, আর দেরি না করে উঠে পড়ুন উটের পিঠে।'

'উঠব কি করে? তোমার উটরানী তো দাঁড়িয়ে

আছে।'

'উটরানী নয়, অন্য উটের পিঠে উঠুন। ভাল করে তাকিয়ে দেখুন উটরানীর পিছনে অন্য উটটা আপনাকে পিঠে তুলে নেবার জন্য উবু হয়ে বসে আছে।'

আলোর বৃত্তের বাইরে অন্ধকারের মধ্যে মাটির ওপরে অন্য উটটা বসেছিল বলে তাকে এতক্ষণ দেখতে পাইনি। কাঁধের ঝোলা থেকে টর্চ বের করে তার বোতাম টিপে আলো জ্বালতেই তাকে দেখতে পেলাম।

'টর্চ নেভান।' ধমকের সুরে বলে ওঠে দিলদার, 'উঠে বসুন উটের পিঠে।'

অন্য উটটার পিঠে আমি উঠে বসতেই সে উঠে পড়ল। বললাম, 'কি দরকার ছিল আর একটা উটের?'

'উটরানী আর আপনাকে পিঠে নেবে না।' দিলদার বললে, 'তাই আমার ফুফুর উটটাকে নিয়ে এসেছি। ভয় নেই, তার জন্য আপনাকে বেশি টাকা দিতে হবে না।'

'তোমার ফুফুর উট এই মরুভূমির চোরাবালির পাশ কাটিয়ে চলতে পারবে কি?'

'ফুফুর উট আমার উটরানীর পেছনে পেছনে চলবে, কোনো চিন্তা নেই। আপনি ঠিক পৌঁছে যাবেন ক্যাম্পে।'

নিশ্চিন্ত হতে পারি বা না পারি উট চলেছে মুখটি তুলে। আমি তার পিঠে বসে থাকলেও তার ওপরে আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। দিলদারের উটরানীকে অনুসরণ করে চলে সে।

দিলদারের উটরানীকে ঘিরে যে আলোর বৃত্ত দেখেছিলাম উটরানীর সঙ্গে সঙ্গে তা চলতে থাকে। রাতের অন্ধকারে বালি ও হ্রদের জলের ওপরে যে অস্ফুট আলো ফুটে উঠেছিল তা লাটাইয়ের সুতোর মতো উটরানীকে জড়িয়ে ধরেছে। কেন এমন হয়েছে জানি না, আমার বুদ্ধিতে এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না।

খানিকক্ষণ বাদে আমি উটরানী ও তার পিঠে দিলদারকে আর দেখতেই পাই না। শুধু আলোর বৃত্তটি এগিয়ে যাচ্ছে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'দিলদার!'

'বলুন হুজুর।' দিলদার জবাব দিল।

'কোথায় তোমরা?'

'এই তো আপনার সামনেই আছি। চেঁচাবেন না, উটরানী বিগড়ে যাবে।'

'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তোমার উটরানী এই অন্ধকারের মধ্যে চোরাবালি বাঁচিয়ে যাচ্ছে কি করে?'

'এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। শুধু জেনে রাখুন আমার উটরানী ঠিকই যাচ্ছে. . .'

দিলদারের উটরানী যে সঠিক পথে চলেছিল তা বুঝতে পারলাম উত্তরলাইতে আমার ক্যাম্পে পৌঁছে। কিন্তু আশ্চর্য! ক্যাম্পে পৌঁছে উটের পিঠ থেকে নেমে দিলদার ও তার উটরানীকে আর দেখতে পাই না। ভাবলাম, হয়তো দিলদারের উটরানী এখানে থামেনি। এগিয়ে গিয়েছে, তার বাড়ির দিকে।

পরদিন বিকেলে এল মইনুদ্দিন ও দিলদারের ফুফুর ছেলে। তারা এসেছে দিলদারের ফুফুর হারানো উটের খোঁজে। গতকালের আঁধির পর থেকে নাকি উটটা নিখোঁজ।

'এই তো আমাদের উট।' আমার তাঁবুর সামনে চরতে থাকা উটটার দিকে তাকিয়ে সোচ্ছ্বাসে বলে ওঠে ফুফুর ছেলে মোরাদ, 'এটা এখানে এল কি করে?'

'এর পিঠে চেপেই তো ক্যাম্পে ফিরেছি।' আমি বললাম, 'শেষ রাত্রের দিকে দিলদার একে নিয়ে এসেছিল মইনুদ্দিনের ঘরে। মইনুদ্দিন শুনতে না পেলেও তার ডাক শুনে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম।'

'এ কি বলছেন আপনি!' মোরাদের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

'ঠিকই বলছি আমি। দিলদার তার উটরানীর পিঠে চেপে একে নিয়ে এসেছিল। তারপর এই উটের পিঠে চেপে দিলদারের উটরানীকে অনুসরণ করে আমি পৌঁছে গিয়েছি ক্যাম্পে।'

'এ কী করে সম্ভব! আঁধির মধ্যে দিশেহারা হয়ে দিলদার ও তার উট চোরাবালির ফাঁদে পড়েছিল। চোরাবালির মধ্যে ডুবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে!'

'ও কি বলছ মোরাদ!' মইনুদ্দিন বললে, 'নিশ্চিহ্ন তো হয়নি। চোরাবালি ওদের গ্রাস করলেও ওরা আছে! এই দেখছ না, পাথরসাহেবকে তাঁর ডেরায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে ওরা ওদের কর্তব্য সম্পূর্ণ করেছে!'

মোরাদ হতবুদ্ধির মতো তাকায় আমার মুখের পানে। তার মতো আমার মুখেও কোনো কথা সরে না। এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি, আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করতে পারি না।

নোটন

ভবানীপ্রসাদ দে

বুকিং কাউন্টারের ভিতর টাকা সমেত হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অতনু বলল, 'হাওড়ার টিকিট দিন একটা।'

কাউন্টারের ভিতর একজন বুড়ো মানুষ রেল কম্পানির ঢাউশ খাতায় পেন্সিল দিয়ে একমনে হিসেব লিখছিলেন। ভদ্রলোক তাঁর চশমার ফাঁক দিয়ে অতনুর দিকে একনজর তাকিয়ে বললেন, 'হাওড়া যাবার গাড়ি চার ঘন্টা লেট।'

স্টেশনের নাম রতনডিহি। নামেই মাত্র স্টেশন। তার না আছে বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম, না আছে যাত্রীদের জন্য মাথার উপর ছাউনি। পোড়া কয়লা পুরু করে বিছিয়ে স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। তারই একধারে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া একখানা ঘর। সেটাই স্টেশন মাস্টারের অফিস, সেটাই বুকিং কাউন্টার।

স্টেশন থেকে মাইল চারেক দূরে ফুলডুংরি গাঁয়ে বড়মাসির কাছে বেড়াতে এসেছিল অতনু। গ্রামসেবিকার চাকরি করেন বড়মাসি, ফুলডুংরিতে আছেন গত পাঁচ বছর। তিনি অতনুদের বাড়ির সবাইকে সেখানে বেড়াতে আসতে বলেন প্রত্যেক চিঠিতে। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর অতনু একাই এসেছিল সেখানে, এখন আবার কলকাতা ফিরে যাচ্ছে।

ট্রেন চার ঘন্টা লেট শুনে ধীরে ধীরে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল সে। সামান্য দূরে মাঝমাঠে পেল্লায় একটা ডো গাছ। তার তলায় রুমাল বিছিয়ে অতনু বসে পড়ল। হেমন্তকাল। রোদ্দুরে মিঠেকড়া আমেজ, বাতাসে হিমেল মেজাজ। চারিদিকে মাইলের পর মাইল সবুজ ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে সোনালি ছোপ ধরেছে। ধান পাকতে শুরু করেছে।

ডো গাছটার নিচে নাম-না-জানা একসারি ছোট গাছ খইয়ের মতো সাদা ফুল ফুটেছে রাশি রাশি। কোথা থেকে বেশ বড়সড় একটা ফড়িং উড়ে এসে তাদেরই একটার উপর বসল। ফড়িংটার গায়ের রং চকোলেটের মতো, সোনালি ডানাজোড়ার উপর কালো রঙের সরু জালতিকাটা আর তার চোখদুটো সবুজ। ফড়িংটাকে ধরবার জন্য অতনু অতি সন্তর্পণে হাত বাড়িয়েছে, ঠিক তখনই তার পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'ফড়িং ধরছ, দুধ খাওয়াবে কোথা থেকে?'

অমন নির্জন জায়গায় মানুষের গলা শুনে রীতিমতো চমকে উঠল অতনু, ফড়িংটাও উড়ে পালাল। অতনু পিছন ফিরে দেখল তেরো-চোদ্দ বছরের একটা রাখাল ছেলে। মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা। ছেলেটা তার হাতের বড় লাঠিগাছা মাটির উপর দাঁড় করিয়ে ধরে মিটিমিটি হাসছে। অতনু বিরক্ত হয়ে বলল, 'ফড়িং আবার দুধ খায় নাকি? কে তুমি?'

ছেলেটা বিজ্ঞের মত বলল, 'ফড়িং ধরলে বনতুলসী

গাছের কচি ডাল ছিঁড়ে সাদা সাদা দুধ বের করে খাওয়াতে হয়। এখানে তো বনতুলসীর ঝাড় নেই। ফড়িং ধরলে তাকে কী খাওয়াবে শুনি?'

'বাঃ, তুমি বেশ মজার কথা বল তো! তোমার নাম কী?'

'নোটন গো, নোটন! তা, তোমাকে তো চিনতে পারলাম না দাদা?'

অতনু বলল, 'ফুলডুংরির গ্রামসেবিকা শ্যামলী সমাদ্দারকে চেন তুমি? তিনি আমার বড়মাসি। আমাদের বাড়ি কলকাতায়।'

নোটন বলল, 'এবার বুঝেছি তুমি কে! তুমি হলে পিয়ে কলকাতার দাদা। তোমার কোঁকড়ানো চুল আর ফরসা রং দেখেই বুঝতে পেরেছি। তুমিই তো ভালো দিদিমণির হাত দিয়ে আমার জন্যে সোন্দর সোন্দর জামা পেন্টুল পাঠিয়ে দাও।'

ফুলডুংরি অঞ্চলের লোকজন বড় গরিব। বড়মাসি বছরে দু'একবার কলকাতা যান। সেখানকার আত্মীয় আর বন্ধুদের কাছ থেকে পুরনো আর ছোট হয়ে যাওয়া শাড়ি ধুতি জামা প্যান্ট চেয়ে আনেন তিনি এখানকার গরিব মানুষদের জন্য। তারাই তাঁকে ভালো দিদিমণি বলে ডাকে। তাঁরই মুখে অতনু শুনেছে বটে এখানকার একটা ছেলে তার জামা প্যান্ট পেলে আর কিছু চায় না। তাহলে নোটনই সেই ছেলে। অতনুর ফরসা রং আর কোঁকড়ানো চুলের কথা বড়মাসির মুখেই শুনে থাকবে নোটন।

অতনু বলল, 'তোমরা থাক কোথায়?'

নোটন দূরে একটা গ্রামের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, 'হুই হোথায়।'

'এখানকার কাছেপিঠে দেখার কিছু নেই?'

নোটন একটু ভেবে বলল, 'আছে বইকি। চলো তোমাকে দেখিয়ে আনি।'

রাঙামাটির এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে চলতে লাগল তারা। আগে আগে নোটন, তার পিছনে পিছনে অতনু। বর্ষাকালে ভিজে পথে গরুর গাড়ি চলে। চাকার চাপে সারা পথ বরাবর লম্বা একজোড়া গর্ত হয়ে গিয়েছে। সেই গর্তে পা পড়লে নির্ঘাৎ মুচকে যাবে। নোটন কিন্তু কেমন সহজে তরতর করে এগিয়ে যেতে লাগল।

অবশেষে তারা যেখানে গিয়ে পৌঁছাল, সেখানে একটা বুড়ো তেঁতুলগাছের তলায় মন্দিরের মতো একটা ইমারত। সেটা বহু পুরনো আর ভাঙাচোরা। ভিতরে কোনও মূর্তি নেই। কেবল বেদির মতো বাঁধানো কিছুটা জায়গা।

অতনু জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কোন ঠাকুরের মন্দির?'

নোটন বলল, 'এটা মন্দির নয়, পিরবাবার দরগা। সবাই দরগায় শিন্নি দেয়, পোড়ামাটির ঘোড়া দেয়।'

'ঘোড়া দেয়? কেন?'

'বাঃ, পিরবাবা তো ঘোড়ায় চড়েই ঘুরে ঘুরে লোকের ভালো করে বেড়ান। কত মাটির ঘোড়া জমেছে দেখছ না?'

অতনু দেখল সত্যিই দরগার পিছনে সেই বড় তেঁতুলগাছটার তলায় অগুনতি ছোট ছোট পোড়ামাটির ঘোড়া গাদা দেওয়া। ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বের করে দরগার একটা ছবি তুলল সে।

নোটন বলল, 'ওটা কী, কলকাতার দাদা? ওটা দিয়ে কি ফটো তোলে?'

অতনু বলল, 'হ্যাঁ। তোমারও একটা ছবি তুলব।'

নোটন মহা খুশি। বলল, 'সত্যিই আমার ফটো তুলবে তুমি? তাহলে দাও একখানা তুলে। সেবার গাজনের মেলায় একটা লোক ফটো তুলে দিচ্ছিল। আমার কাছে পয়সা কম ছিল। কত করে বললাম, যা আছে তা-ই নিয়ে একখানা ফটো তুলে দাও বাপু। তা লোকটা সে কথা কানেই নিল না।'

নোটন হাসি-হাসি মুখ করে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াল। কিন্তু ছবি তুলতে গিয়ে অতনু দেখল শাটারটা নামছে না। সে বলল, 'নোটন, ক্যামেরা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওতে আর ফটো উঠবে না। আমি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারি। বরং চটপট তোমার একটা ছবি এঁকে দিই।'

নোটনের মুখের হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল। সে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল। অতনু ক্যামেরাটা ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে রেখে হবি-বই আর স্কেচ পেন্সিলটা বের করল। সেগুলো সব সময় তার ব্যাগেই থাকে। নোটনের মুখের একটা ছবি আঁকতে আঁকতে সে বলল, 'ভাগ্যিস ট্রেনটা লেট করল আর তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

নোটন বলল, 'আমারও তোমাকে দেখার খুব ইচ্ছা হত।' একটু থেমে সঙ্কোচের সঙ্গে সে বলল, 'শীতকালে বড় কষ্ট পাই। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বয়। তুমি আমার জন্যে একটা ছেঁড়া কোট পাঠিয়ে দিও ভালো দিদিমণির হাত দিয়ে।'

ছবিটা আঁকা শেষ হলে অতনু নোটনকে দেখাল সেটা। নোটন বলল, 'ওটা তুমিই নিয়ে যাও। আঁকা ছবি ভালো লাগে না আমার।'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অতনু দেখল চার ঘণ্টা সময়ের অনেকটা পার হয়ে গিয়েছে। সে বলল, 'নোটন, আর তো সময় নেই। চলো, স্টেশনের দিকে যাই।'

কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন এল। গাড়ি ছেড়ে দেবার পর অতনু জানলা দিয়ে দেখল স্টেশনের বাইরে একটা ন্যাড়া শিমুলগাছের তলায় নোটন দাঁড়িয়ে আছে। অতনু হাত নাড়ল, নোটন দেখতে পেল না।

ট্রেনের গতি বেড়ে চলল।

অতনু ফুলডুংরি থেকে কলকাতা ফিরে আসবার মাসখানেক বাদেই বড়মাসি হঠাৎ কলকাতায় এলেন। বেশিক্ষণ পড়াশুনো করলে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে, ডাক্তার দেখিয়ে চশমা নিলেন।

পড়ার ঘরে বসে অতনু একটা অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়ছিল আর বড়মাসি নতুন চশমা চোখে দিয়ে তার হবি-বইখানার পাতা উল্টে উল্টে তার টুকিটাকি লেখা আর আঁকা দেখছিলেন। একটা পাতায় পৌঁছে তাঁর চোখ থেমে গেল। তিনি বললেন, 'আরে! এটা ঠিক যেন আমাদের নোটনের ছবি।'

অতনু বলল, 'ওটা তো নোটনেরই ছবি। গত মাসে ফুলডুংরি থেকে ফেরার পথে হঠাৎই আলাপ হয়ে গেল। ছেলেটা কিন্তু বেশ।'

বড়মাসি অবাক হয়ে বললেন, 'তুই নোটনকে দেখবি কোত্থেকে? গত বছর শীতের সময় ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়ে মারা গেল বেচারা। তোর খুব নাম করত ছেলেটা। বলত, কলকাতার দাদা যদি জানতে পারে ঠাণ্ডা লেগে আমার অসুখ করেছে, তাহলে সে ঠিক আমার জন্যে একটা ছেঁড়া কোট পাঠিয়ে দেবে। তোকে বলিনি বুঝি সে কথা?'

www.arisumu.com

একদিন রাত্রে

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বি-এস-সি পরীক্ষা সামনে এসে গেছে, পড়াশুনো কিছুই করিনি, মেজদার নতুন মোটরটায় সত্তর মাইল স্পীড দিয়ে ডায়মণ্ডহারবার কিম্বা চন্দননগর, বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ-হল্লা, এ-সবেই দিন কেটেছে। কিন্তু আর নয়, বই খুলে এবার ঘরে বসেছি।

রাত বোধহয় অনেক হলো।

বৈঠকখানা থেকে বড়দার ব্রীজের আসরের তর্কাতর্কি আর কানে আসছে না। মেজাদা ডাক্তার, অনেকক্ষণ রোগী দেখে ফিরে এসে তাঁর ঘরে শুয়ে পড়েছেন।

কেটে গেল আরও কিছুক্ষণ।

এবার ঘুম পাচ্ছে। রীতিমতো ঢুলে পড়ছি। কিন্তু না, ঢুললে চলবে না। ঘুমোলে চলবে না, খাতা নিয়ে অঙ্ক কষতে শুরু করলাম। অঙ্ক কষছি তো কষছিই। এমন সময় দরজা খুলে হঠাৎ-ই মেজদার আবির্ভাব।

বললেন, ওরে একটু চল তো আমার সঙ্গে। ড্রাইভার বাড়ি চলে গেছে, এদিকে কলও এসেছে জরুরি, না গেলেই নয়। যত জ্বালাতন এই এতো রাত্রে! ডাক্তারী করা যে কী ঝকমারি!

বড়ো ভারিক্কি মানুষ এই মেজদা, এখনো বেশ সমীহ করে চলতে হয়। বড়দা হলে না হয় একটু আপত্তির গুনগুনানি তুলতাম, কিন্তু মেজদা? ওরে বাবা, তবেই সর্বনাশ।

নিরুত্তরে চললাম মেজদার সঙ্গে।

গাড়ি বার করলাম গ্যারেজ থেকে। মেজদা এসে পাশে বসলেন। আর ভেতরে বসলো একটি মধ্যবয়স্ক গেঁয়ো লোক। এই লোকটিই বুঝি ডাকতে এসেছিল মেজদাকে।

ঐ বোকা-বোকা ভালোমানুষ গোছের লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে যা চটলাম ওর ওপরে, তা বলার নয়। ব্যাটা এতো রাত্তির করে এসেছে ডাক্তার ডাকতে! তা ডাকবি তো, অন্য ডাক্তারকে ডাক! তা নয়, মেজদাকেই চাই! কেন, সারা শহর জুড়ে আর কোনো ডাক্তার ছিল না?

নির্জন রাস্তা। রেগেমেগে স্পীড বাড়িয়ে দিলাম, যতটা পারি।

এ-রাস্তা সে-রাস্তা করতে করতে শহরের প্রায় বাইরে অন্ধকার এক কানা গলির সামনে লোকটা দাঁড় করালো আমাদের। তারপরে নেমে বললো, একটু বসুন ডাক্তারবাবু, আমি লণ্ঠনটা নিয়ে আসি, বড্ড অন্ধকার! (ওদিকে তখন লোডশেডিং চলছিল বোধহয়)।

লোকটা দেখতে দেখতে গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর কয়েক মুহূর্ত পরে গলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো আর একটি লোক। (ঐ অন্ধকারের মধ্যে থেকেই

হাতে কোনো টর্চ বা লণ্ঠন ছিল না)।

মোটরের কাছে এসে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালো, বললে, ডাক্তারবাবু বুঝি? মেজদা মাথা নেড়েছিলেন। অর্থাৎ, হ্যাঁ, আমিই ডাক্তার।

রোগী দেখতে এসেছিলেন?

এবারেও মেজদা মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ, হ্যাঁ, রোগী দেখতেই এসেছিলাম।

লোকটি বললো, আর দেখে কী করবেন বাবু, রোগীর ওদিকে হয়ে গেছে। বলেই আর দাঁড়ালো না, গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল হন হন করে যেন কোন্ দিকে।

তার একটু পরেই এলো সেই আগের লোকটি। লণ্ঠন হাতে। বললো, আসুন ডাক্তারবাবু।

মেজদা গাড়ি থেকে নেমে যথারীতি গেলেন তার পিছনে পিছনে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ফিরে এলেন একটু পরেই। একেবারে একা একা। যেন পলক ফেলতে না ফেলতেই। একটা সিগারেট ধরাবার ইচ্ছা ছিল, তারও ফুরসৎ পেলাম না।

মেজদা হাতের ব্যাগটা পিছনে রেখে দিয়ে বসলেন এসে আমার পাশে। বললেন, দেরি করিসনি, শীগ্‌গির স্টার্ট দে।

গলাটা এঁর যেন একটু ধরা-ধরা, স্বরটা কাঁপা-কাঁপা! দিলাম গাড়ি চালিয়ে।

একটুক্ষণ চলবার পর মেজদা বললেন, হ্যাঁরে, যে-লোকটা আমাদের কাছে এসে বললে, 'রোগী মরে গেছে,'—তার মুখখানা লক্ষ্য করেছিলি? বললাম, হ্যাঁ। ন্যাড়া মাথা—কালোপনা মুখ—চোখ দুটো—

বাধা দিয়ে মেজদা বলে উঠলেন, থাক আর বলতে হবে না। আসলে সেই লোকটাই রোগী। গিয়ে দেখি, বিছানায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে।

কথাটা বলেই মেজদা আমার দিকে আরও একটু ঘন হয়ে সরে বসলেন।

www.arisumu.com

চোখের আলোয়

সুনীল দাশ

অমৃৎ দরজি আপত্তি জানিয়েছিল। এই জায়গায় তাঁবু খাটাতে সে চাইছিল না। পাহাড়ের মাথার কাছে এই জায়গাটা দেখতে যতই ভালো লাগুক না কেন, রাত কাটানোর পক্ষে ভালো নয়।

ভালো নয় কেন? কিসের ভয়?—বাপ্পা প্রশ্ন করেছিল। অমৃৎ দরজি জানিয়েছিল—কয়েক সাল ধরে এখানে অপদেবতার উপদ্রব শুরু হয়েছে।

অপদেবতা? ভূত? ভূতেরা এই অলটিচুডে উঠতে পারে? হাসতে হাসতে বলেছিল মানিক।

শেরপাদের সর্দার অমৃৎ দরজি দুই তরুণ পর্বতারোহীর হাসি দেখে চুপ করে গেছিল। আর কোনো কথা বলেনি। গুম হয়ে থেকে সকলের সঙ্গে হাত লাগিয়ে তাঁবু খাটাতে শুরু করে দিয়েছিল।

তাঁবু খাটাতে খাটাতেই মানিক বলল বাপ্পাকে কেন শেরপা সর্দার পছন্দ করছে না এই জায়গাটা। "তিন বছর আগে সুরঞ্জনাদের মহিলা অভিযাত্রী দলটি এইখানেই আমাদের মত তাদের শেষ শিবির খাড়া করেছিল। তারপর মধ্যরাত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয়েছিল। আচমকা ধ্বস নেমেছিল। তবু দলের বাকি সকলের প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি সুরঞ্জনার।"

শেরপা কি বলতে চায়, সুরঞ্জনার আত্মা এখানে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে?

ওরা তো প্রতিবছরই আসে কোনো না কোনো টিমের সঙ্গে। তার ফলে ওরা নানা রকমের শোনে, দ্যাখে। পোর্টারদের মুখে মুখেও তো অনেক কথা ছড়ায়।

বাপ্পা তাকিয়ে দেখল ওপরের দিকে। দিনান্তের আলো এবার ধীরে ধীরে নিভে যাবে। বরফ ঢাকা পর্বতচূড়াটা যেন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে নিঃশব্দে। বাপ্পা মানিকের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'সময় থাকলে আজই চলে যেতাম ওর মাথায়। আলো কমে এলো তাই আরো একটা বাড়তি দিন। রাতটা তাঁবুতে কাটিয়ে, কাল সকাল থেকে শেষ চড়াইটুকু ডিঙোনো।'

মানিক নিজের হাতের দস্তানা আরো আঁটো করে নিতে নিতে অনেকটা যেন আপন মনে বলার মত করে বলল, 'আরো একটা বাড়তি রাত মানে—আরো অনেকটা বাড়তি ঝুঁকি। আগের বছরই তো আমরা ঠিক এই জায়গাটা থেকেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

গত বছর অন্য একটা গ্রুপের সঙ্গে মানিক আর একবার এসেছিল এই একই পথে। এইখানে ওরা আটকে গেছিল তুষার ঝড়ে। সারাদিন অপেক্ষা করার পর আবহাওয়া আরো খারাপ হতে থাকলে ওরা আর রাতে এখানে থাকেনি। নেমে গেছিল সবাই। গতবারের তুলনায় এবারের আবহাওয়া অনেক ভাল। হঠাৎ খারাপ

হয়ে যাওয়ার কোনো রকমের লক্ষণ নেই। তবে জায়গাটা অনেকটা উঁচুতে বলে, ঠাণ্ডার কামড় এই পড়ন্ত আলোতেই মারাত্মক হয়ে উঠেছে। তাহলেও মাথার ওপরের আকাশটা কি চমৎকার নীল—একেবারে কালিদাসের ভাষায় বলা যায়—নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত। কোথাও কোনো বিপদের সংকেত নেই।

এই জায়গাটায় তাঁবু ফেলাটা পছন্দ না হলেও, খানিকটা সময় থম্ মেরে থাকলেও—শেরপাদের সর্দার, অমৃৎ দরজি তার কাজে গাফিলতি করে না এক মুহূর্তও। এইজন্যেই ছোটখাটো চেহারার এই কঠোর পরিশ্রমী মানুষটিকে প্রথম থেকেই ভালো লাগছে বাপ্পার। মানিক অমৃৎ দরজির সঙ্গে এর আগেও গেছে দু একটা অভিযানে। মানুষটি খুব বুঝদার। খুবই অভিজ্ঞ। তবে সারাজীবনের সংস্কারকে তো এক ঝটকায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না এরা। অশরীরী আত্মা সম্পর্কে যে সব ধারণা এদের মধ্যে বহুকাল ধরে চলে আসছে—সেটাকে ওদের মন থেকে সহজে তাড়ানো যাবে না। যাই হোক, আজ তাঁবু খাটানোর পরই দিন পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাঁকিয়ে যখন ঠাণ্ডা নামছে, সেইসময় অমৃৎ দরজি ফ্লাস্ক ভর্তি গরম কফি নিয়ে এলো যখন, তখন মানুষটাকে বাপ্পার সত্যি সত্যিই হিমালয়ের আশীর্বাদ বলে মনে হচ্ছিল।

বাপ্পা এবং মানিকের মাঝারি আকারের সাদা রঙের মগ দুটিতে কফি ঢেলে দিল অমৃৎ দরজি। তারপর বাপ্পাকে জিজ্ঞাসা করল, বাপ্পার শরীর এবং মনমেজাজ ঠিক আছে কিনা। মানুষটা জানে মানিক ব্যানার্জি অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। অনেক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করেছে বহুবার। অনেক দুর্গম অভিযানের অভিজ্ঞতা মানিকের আছে। কিন্তু মানিকের তুলনায় বাপ্পা একেবারেই নতুন। এই ধরনের পর্বত শিখর জয়ের অভিযানে—এতোটা উচ্চতায় ওঠা এই তার প্রথম। তাই বাপ্পার মনের ভারসাম্য সম্পর্কে বিশেষ করে খোঁজখবর নেওয়া দরকার।

চারিপাশের ধবধবে সাদা বরফের মধ্যে দিনের শেষ আলো ফুরিয়ে গিয়ে অন্ধকার নেমে এলো অল্পক্ষণের মধ্যেই। আর বাইরে থাকা যাবে না। বাপ্পা আর মানিক তাদের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাপ্পার মনে হল, বাইরেটা যেমন দেখতে দেখতে দ্রুত পাল্টে গেল ভেতরটাও, মনের ভাবনা চিন্তা অনুভবগুলোও সেই সঙ্গে তেমনি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।

খানিক আগে গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বাপ্পা অমৃৎ দরজিকে বলেছিল যে তার শরীর এবং মন দুই বেশ চাঙ্গা ছিল। কোনোরকমের অসুবিধে হচ্ছিল না। কি সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে বাপ্পা বুঝতে পারছিল ভেতরে ভেতরে সে আর কেন যেন খুব স্বাভাবিক থাকতে পারছে না। কি যেন অস্বস্তি হচ্ছে তার। কিন্তু ঠিক কি যে হচ্ছে সেটা ঠিক ধরতে পারছে না।

বাপ্পা বুঝতে পারল, মানিক ওকে মাঝে মধ্যে তীক্ষ্ণভাবে নজর করছে। কী হল? বাপ্পার মুখের রেখায় তার ভেতরের এই অজানা অস্বস্তি কোনো ছাপ ফেলছে নাকি! মানিক বলল, 'আজ আর গপ্পো নয় বাপ্পা। তাড়াতাড়ি খাওয়া মিটিয়ে ঘুমের আয়োজন করছে বোঝা গেল। বাপ্পা তাঁর স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মানিকও দুজনের মাথার কাছে দুটো টর্চ রেখে দিয়ে শুয়ে পড়ল তাঁর স্লিপিং ব্যাগটার মধ্যে। তার আগে সে তাঁবুর ভেতরের জ্বলন্ত মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়েছে। বাপ্পা বুঝতে পারল, স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল মানিক।

বাপ্পারও ঘুম এসেছিল কিছুক্ষণের জন্য। গাঢ় ঘুমের মধ্যে সে টের পেল কেউ তাকে ডাকছে, ঘুমন্ত অবস্থায় জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে।

বাপ্পা আচমকা উঠে পড়ল। স্লিপিং ব্যাগ খুলে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনল, খুব নিচু গলায় তার নাম ধরে ডাকছে কেউ।

কিন্তু কে ডাকছে? অন্ধকার ঘরে ঘুমন্ত মানিক ছাড়া তো শুধু বাপ্পা নিজে। তাহলে! বাপ্পা অনেকক্ষণ চোখের পাতা খুলে বসে থাকল। তাঁবুর সেই অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় তার মনে হল চাপ চাপ অন্ধকার ঢুকে পড়ছে তার মাথার মধ্যে। অন্ধকার যে এমন ঠাণ্ডা হতে পারে তা বাপ্পার জানা ছিল না। ওই মারাত্মক শীতল অন্ধকার রুখে দেওয়ার জন্যে বাপ্পা তার চোখের পাতা বন্ধ করতে চাইল। বন্ধ করতে পারল না। চলন্ত বাসে চেপে যেতে যেতে দমকা বৃষ্টি

কেঁপে এলে কখনো কখনো যেমন হয়েছে, বাসের জানলার কাচ নামাতে গিয়ে আর কিছুতেই নামাতে পারা যায় না; জানলার সার্সিটা কিভাবে যেন আটকেই থাকে আর সেটা টানাটানি করতে করতেই বৃষ্টির ফোঁটা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব ভিজিয়ে একশা করে দেয়—এখনো তেমনি হলো। চোখের পাতা বন্ধ করার জন্যে চেষ্টা করতে করতেই যেন হুড়মুড় করে ঠাণ্ডা অন্ধকার—সেই বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বর্ষার মতো অনেকক্ষণ চলতে থাকলো বুঝিবা।

ঠাণ্ডা অন্ধকারের অনুভূতি বাপ্পার জানা ছিল। কিন্তু কোনো কোনো গাঢ় অন্ধকারের যে নিজস্ব একটা শব্দ আছে তা তার জানা ছিল না। বাপ্পার মাথার মধ্যে সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তাঁবুতে শব্দটা অনেকক্ষণ বাপ্পার অনুভবের মধ্যে বেজে যাওয়ার পর, একসময় থেমে গেল ধীরে ধীরে। তারপর ঘনরাতে ফাঁকা মাঠের মধ্যে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর চাঁদ উঠে মিহি জ্যোৎস্না ছড়ালে যেমনটা হয়—সেইরকম একটা ব্যাপার হতে থাকল বাপ্পার অনুভবের মধ্যে। মনে হলো কালো রঙের স্তূপ ঠেলে। বলা যায় স্তূপ গলে একটা বরফ নীল আলো, হলুদ ডিমের মত কিসব আধার ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

সেই বরফনীল জ্যোতির মধ্যে চোখ স্থির করে তাকিয়ে থাকতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল বাপ্পার। তবু তাকে ভেতর থেকে কি যেন একটা ক্রমাগত ঠেলতে শুরু করে দিয়েছিল। বাপ্পা বুঝতে পারছিল—কি যেন একটা হতে চলেছে—কি যেন একটা ঘটতে চলেছে এরপরেই।

বাইরে সম্ভবতঃ জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে বরফের ওপর ঝিরঝির করে। কিন্তু জ্যোৎস্না ঝরার আবার শব্দ আছে নাকি আরো একটা কি যেন—আরো একটা কিসের শব্দ যেন মিশে আছে না ওর মধ্যে!

বাপ্পা কান খাড়া করে থাকে।

ঠিক। একটা মেয়েলি গলা খুব নিচু স্বরে কি যেন বলতে চাইছে। প্রথমে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না, ক্রমে কথাগুলো স্পষ্ট হচ্ছে।

বাপ্পা কি ভুল শুনছে কিছু? এই রকম হাই অলটিচিউডে—সাধারণ উচ্চতা পেরিয়ে—অনেক সময় নাকি পর্বতারোহীরা হ্যালুসিনেসনে ভোগে—উদ্ভট কিছু দেখতে শুরু করে, শুনতে শুরু করে—এসব কথা বাপ্পা শুনেছিল—তেমন কিছু হচ্ছে না তো?

বাপ্পা উঠে বসল।

ভাবল, মানিককে ডাকবে কিনা! দুবার ডাকল মনিককে। মানিক তখন অগাধ ঘুমে।

তাঁবুর বাইরে আসতে গিয়ে একবার মনে হল বাপ্পার টর্চটা সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাইরে এসে আর সে কথা মনে হল না। বেরিয়ে আসার আগে বাপ্পা সেই নিচুগলার ডাক শুনে গলা তুলে বলল, 'কে? কে ডাকছে আমায়?'

বাপ্পা স্পষ্ট শুনলো সামান্য দূর থেকে উত্তর এলো। 'সুরঞ্জনা! আমি সুরঞ্জনা! আমার একটা উপকার করবে ভাই? আমার বোনের এই গলার হারের লকেটটা পৌঁছে দেবে?'

'কোথায় লকেট?'—তাঁবুর ভেতরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বাপ্পা জিজ্ঞাসা করল।

'এই যে!'

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে বাপ্পার হাতের মধ্যে কিছু একটা এসে ঠেকল। বাপ্পা তাঁবুর বাইরে এসে অবাক হয়ে গেল। কী আশ্চর্য! এরই মধ্যে রাত ফুরিয়ে যাচ্ছে নাকি! সে তো ভাবছিল—এখন মধ্যরাত। চারপাশের ধপধপে সাদা বরফ থেকে নীলচে আলো শেষ পর্যন্ত সাদা ফেনার মতো ফেটে পড়ছে। কোথাও কোথাও শুভ্রতা রীতিমতো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে! দৃষ্টি এতে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে যায়।

কোথায় সুরঞ্জনা? দু বছর আগে পর্বতারোহণে এসে এইখানেই সুরঞ্জনা নিখোঁজ হয়ে গেছিল না? দলের সবাই ফিরেছিল নিচের তাঁবুতে, শুধু তো সুরঞ্জনারই সন্ধান পাওয়া যায়নি! তবে কি দু বছর আগে সুরঞ্জনা মারা যায়নি?

বাপ্পা বাইরে এসে কাছাকাছি কাউকে দেখতে পেল না। আকাশে তো চাঁদ দেখতে পাওয়ার কথা। আশ্চর্য, সেটাও নেই। একটা তারার কুচিও নেই। অথচ একটা আলো আছে।

সুরঞ্জনা কি হামিং এর মত কিছু একটা সুর ভাঁজছে। কোথায় সে? চারপাশে তো শুধু স্তব্ধ তুষার। কিছুই নড়ছে না। কোনো কিছু স্পন্দমান নয়। যেন সাইলেন্ট

ট্রাকে বেজে যাচ্ছে সুরঞ্জনার হামিংটা।

বাপ্পা ডান হাতের মধ্যে লকেটটা চেপে ধরল। আর সেই মুহূর্তে খানিক দূরের একটা বরফের স্তূপ নড়ে উঠল। ওটা কি বরফের স্তূপ? না অন্য কিছু?

অবাক কাণ্ড! ওটা একটা ঘোড়া। হ্যাঁ, ঘোড়াই তো! সাদা ঘোড়া। বরফের ওপর মুখ নামিয়ে ল্যাজের ঝালর ঝাপটাতে ঝাপটাতে দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

বাপ্পা শুনেছে, হিমালয়ের এইরকমের উচ্চতায় একধরনের সাদা ভাল্লুক দেখা যায়। সে পড়েছে এসব জায়গায় নাকি 'ইয়েতি'র পায়ের ছাপও কেউ কেউ দেখেছে। কিন্তু এই উচ্চতায় এইরকমের সাদা ঘোড়া যে দেখতে পাওয়া যাবে তা বাপ্পার জানা ছিল না।

কিন্তু সুরঞ্জনা কোথায় গেল? সুরঞ্জনাদের পরিবারকে বাপ্পা জানে। একটি বাঙালী পর্বতপ্রেমী পরিবার। সুরঞ্জনার ভাইও মাউন্টেনিং এ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার। উত্তরকাশীতে এ্যাডভান্স কোর্স করেছিল বাপ্পার সঙ্গে। অন্ধকার তাঁবুতে বোনের গলার হারের সোনার লকেটটা আমার হাতে ফেলে দিয়েই সুরঞ্জনা গেল কোথায়?

বাপ্পা আবার শুনতে পেল সেই হামিং—মৃদু ধ্বনি-তরঙ্গ—সাইলেন্স সাউন্ড ট্রাক নাকি? কেউ কি রিণ রিণ করে হাসছে? শব্দটা আসছে ওইখান থেকেই—যেখানে সাদা ঘোড়াটা মুখ নিচু করে—সরে সরে যাচ্ছে। সেই অলৌকিক শুভ্রতায় বাপ্পা ঘোড়াটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

বাপ্পা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটাও আবার সরে গেল আরো কিছুটা দূরে। কি ব্যাপার? সাদা ঘোড়াটার পেছনে কেউ লুকিয়ে আছে নাকি? মেঘ? না, সাদা শাড়ির আঁচল ওটা?

বাপ্পা আরো এগোয়।

সঙ্গে সঙ্গে আরো সরে যায় সাদা ফেনার মত কেশ সমেত ঘোড়াটা।

বাপ্পার রোখ চেপে যায়। সে তাড়াতাড়ি পা চালাতে শুরু করে।

এইভাবে, বেশ খানিকটা সময় এগিয়ে যাওয়ার পর, বাপ্পা ঘোড়াটার অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে যেই—সাদা ঘোড়াটা সেই মুহূর্তে পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা গাঢ় নীল নদীতে লাফিয়ে পড়ল। মরিয়া হয়ে—বাপ্পাও সেই নদীতে লাফ দিতে যাবে যেই—বাধা পড়ল।

বাপ্পার জ্যাকেটটা টেনে ধরল কেউ।

ঝটকা মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে বাপ্পা এগিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু পারল না। বাপ্পাকে জাপটে ধরেছে। বাপ্পা সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে আবার সরিয়ে দিতে চাইল।

সঙ্গে সঙ্গে বাপ্পার মুখের ওপর একটা ঘুষি এসে পড়ল। এবার বাপ্পা বুঝতে পারল—লোকটি মানিক।

মানিকও চিৎকার করে অনেক কথা বলছিল। চিৎকার করছিল অমৃৎ দরজিও।

অথচ, বাপ্পা ওদের কিছুতেই বোঝাতে পারছিল না—ওরা যেটা গভীর খাদ বলছে—সেটা বাপ্পার চোখের আলোয়—এইমাত্র একটা ঘন নীল জলের নদী ছিল। বাপ্পা বোঝাতে পারছিল না যে এইমাত্র ওই ঘন নীল জলে যে শ্বেতবসনা ঝাঁপ দিয়েছে—সে সুরঞ্জনা কি না!

বাপ্পা বোঝাতে পারছিল না—যা সে দেখেছে তার নিজের চোখের আলোতেই দেখেছে—চোখ খুলেই দেখেছে!

আর সোনার এই লকেটটা তো এই শীতল অলৌকিক শুভ্রতায় এখনো তার হাতের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে।

অন্য মহিম

রতনতনু ঘাটী

স্কুল থেকে ফিরে বইয়ের তাকে স্কুলব্যাগটা রাখতে গিয়ে মহিম দেখল, বইগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। খুব অবাক হয়ে গেল মহিম। বই গুছিয়ে না রাখার জন্য মা যেদিন খুব বকেছিলেন, সেদিন থেকে মহিম কখনও বইয়ের তাক এলোমেলো করে রাখে না। স্কুলে যাওয়ার সময় যদি দেরিও হয়ে যায় তবুও না। তাহলে আজ বইয়ের তাকটায় কি কেউ হাত দিয়েছিল? মেজোপিসির মেয়ে দিপি এসেছিল হয়তো তার ভাইকে নিয়ে। দিপির খুব শখ বইয়ের ছবি গোনার খেলায়। ওরা ভাইবোনে মিলে হয়তো ছবি গোনার খেলা খেলেছিল। একজন নিয়েছিল বইয়ের সব বাঁ দিকের পাতা, আর-একজন ডান দিকের পাতা। তারপর ছবি গুনে-গুনে দেখেছে শেষ পর্যন্ত কার ভাগে ছবি বেশি হয়! তাহলে দিপিই হয়তো বইয়ের তাকটা ঘেঁটেছে।

মাকে জিজ্ঞেস করল মহিম, "মা, দিপি এসেছিল আজ?"

মা বললেন, "কই, না তো! দিপির কথা বলছিস কেন?"

মহিম বলল, "না এমনই মনে হল, তাই।"

মহিম মাকে সব কথা বলল না। কেননা, যদি এমন হয় যে, বইয়ের তাকটা ও নিজেই গুছিয়ে রেখে যেতে ভুলে গেছে, তাহলে মা খুব বকবেন। কিছুতেই মনে করতে পারছিল না মহিম বইগুলো গুছিয়ে রেখে গিয়েছিল কি না।

ওদিকে এখন বিকেল পড়ে এসেছে। ফুটবল শুরু হয়ে যাবে মাঠে। মাঠ মানে, ধান ওঠার পর সরু আলগুলো কেটে-ছেঁটে জমিটাকে মাঠ বানিয়ে নিয়েছে গ্রামের ছেলেরা। বল কেনার জন্য চাঁদাও দিতে হয়েছে সবাইকে, কিন্তু তাই বলে সবাই খেলার সুযোগ পায় না প্রতিদিন। যে-যে আগে মাঠে পৌঁছবে, তারাই সুযোগ পাবে—এরকমই নিয়ম ঠিক করে দিয়েছে গেনুদা।

ওদের গ্রামের মধ্যে গেনুদাই ফুটবল খেলার নেতা। গেনুদার ভাল নাম জ্ঞানরঞ্জন। নামটা এরকম হলে কী হবে, গেনুর পড়ার চেয়ে খেলাতেই আগ্রহ বেশি। মহিম কার কাছে যেন শুনেছিল, গেনুদা একবার মহকুমা শহরের মাঠে গিয়েও খেলে এসেছে।

বিকেলে যারা আগে গিয়ে গেনুদার কাছে হাজির হবে, তারাই খেলার সুযোগ পাবে। এক-একদিন এমনও হয়েছে, ষোলজন করে খেলেছে এক-এক দলে। এ-বছর একদিন তো মহিম বত্রিশজনের পর মাঠে পৌঁছেছিল বলে সারা বিকেলটাই লাইন্‌সম্যান হতে হয়েছিল। তিনদিন তো সে-সুযোগও পায়নি মহিম। শুধু দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে মাঠের বাইরে।

আজ অবশ্য মহিম খেলার সুযোগ পেয়েছিল। সন্ধের

মুখে গেনুদা খেলা শেষের বাঁশি বাজাতেই খেলা বন্ধ হয়ে গেল। যে-যার বাড়ি ফেরার পালা। মহিমও বাড়ি ফিরছিল। বড় রাস্তা ধরে শিবতলা পর্যন্ত অনেকেই ছিল মহিমের সঙ্গে। শিবতলা থেকে বাঁ দিকে বাঁক ঘুরেই সরু রাস্তাটা গেছে মহিমদের বাড়ির দিকে। রাস্তার দু'দিকে স্থলকলমির বেড়া। বাবলা আর খেজুর গাছের সারি। ফিকে অন্ধকারকেও মনে হয় ঘন অন্ধকার। সন্ধের মুখেই ঝাঁকে-ঝাঁকে জোনাকি উড়তে শুরু করেছে। বড় শেওড়া গাছটার কাছে আসতেই মহিমের হঠাৎ মনে পড়ে গেল বইয়ের তাকটা এলোমেলো হয়ে থাকার কথা। চারদিকে তাকাল মহিম। ঠাকুরমা সেদিন বলেছিলেন, শেওড়া, নিম আর খিরীষ গাছে নাকি কারা থাকে। অনেক চেষ্টা করেও মহিম 'ভূত' শব্দটা মনে আনল না। তাহলে কি কেউ হাত দিয়েছিল বইয়ের তাকে? মনে হতেই প্রাণপণে ছুটল মহিম।

সন্ধেবেলা হ্যারিকেনের সামনে পড়তে বসে কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারল না। তার হঠাৎ-হঠাৎ মনে হচ্ছিল, কেউ তাকে আড়াল থেকে দেখছে অপলক। আলো চোখে লাগলে দূরে অন্ধকারে কিছুই তেমন ভাল করে দেখা যায় না। মহিম একটুকরো কাগজ গুঁজে দিল হ্যারিকেনের প্যাঁচানো তারের ফাঁকে। পড়ায় মন দিতে গিয়েও দু-একবার আড়চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখল মহিম, কেউ তাকে দেখছে কি না। উঠোনের পাশের ছোট নিমগাছটা বাতাসে মাথা দুলিয়ে দোল খেল বারকয়েক। ভয় করল মহিমের। বই ফেলে রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, "মা, আমার ভয় করছে বারান্দায় একা-একা পড়তে।"

মা বললেন, "তাহলে বই নিয়ে এসে এখানেই পড়ো।"

মহিমের বাবা অনুতোষবাবু গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য। তাই আজ কিসের যেন মিটিং আছে পঞ্চায়েত অফিসে। তাঁকে যেতে হয়েছে।

বই নিয়ে এসে মহিম রান্নাঘরে মায়ের পাশে বসে মাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মা, ভূতগুলো কোথা থেকে আসে বলো তো?"

মা বললেন, "বোকা ছেলে কোথাকার! ভূত বলে সত্যিই কিছু আছে নাকি? সবই মানুষের মনগড়া!"

মা যতই বলুন, ভূত যে আছে সে-কথা ঠাকুরমা বেশ জোর দিয়েই বলতেন মহিমকে। তা ছাড়া ভূত যে আছে তার বড় প্রমাণ বিধু গুনিন। প্রায় রোজ ভূত তাড়াতে ডাক পড়ে বিধু গুনিনের। আশেপাশের পাঁচ-সাতটা গাঁয়ের মানুষ ভূতের হাত থেকে যে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে, সে তো শুধু বিনু গুনিনের জন্যই।

এই তো সেদিন, দেবকীর মাকে ভূতে ভর করেছিল কীরকম, সে-গল্প মহিম শুনেছে ওর বন্ধুদের মুখ থেকে। দেবকীর বাবা নেই, মারা গেছেন অনেকদিন আগে। দেবকীর মা অনেক কষ্টে মানুষ করছেন দেবকীকে। একদিন রাতে দেবকীর মার ঘুম ভেঙে গেল কীসব ভয়ের স্বপ্ন দেখে। ঘুম ভাঙতেই পা দুটো নাড়াতে গিয়েই তাঁর মনে হল পায়ের ওপর কী একটা যেন ভারী জিনিস চাপানো, পা নাড়ানো যাচ্ছে না। ভয়ে ঘেমে গেলেন দেবকীর মা। একটু পরেই দেখলেন, পায়ের ওপর আর কোনও ভারী কিছু নেই। উঠে ঢকঢক করে জল খেলেন। শুয়ে রইলেন বাকি রাতটুকু। কিন্তু আর ঘুম এল না তাঁর।

তার পরের দিন রাতে ঘটল আরও একটা ঘটনা। দেবকীর মা খাওয়া-দাওয়ার পর রান্নাঘরের কাজ গুছিয়ে যখন শুতে এলেন, দেখলেন, দেবকী ঘুমিয়ে একদম ভিজে বাতাসা। আলো নিভিয়ে যেই শুয়ে পড়লেন, অমনই ঘরের কোণায় রাখা চাল, ডাল আর সরষের কলসিগুলো গড়িয়ে-গড়িয়ে এসে বসল দেবকীর মায়ের মাথার পাশে। দেখে তো দেবকীর মায়ের শরীর ভয়ে হিম হয়ে গেল। উঠে আলো জ্বালাতেই দেখলেন, যেখানকার কলসি, গড়িয়ে-গড়িয়ে ফিরে গেল সেখানেই। দেবকীর মায়ের সে-রাতেও আর ঘুম এল না।

তারপর ডেকে আনা হল বিধু গুনিনকে। বিধু গুনিন এসে কী সব করল, তারপরে সব নিশ্চিন্দি। আর কখনও ভূতের উপদ্রব হয়নি দেবকীদের বাড়িতে।

শুধু এ-গল্পই বা কেন? সেদিন হঠাৎ এক পশলা ভারী বৃষ্টিতে মাঠে জল জমে গিয়েছিল বলে বিকেলে আর ফুটবল খেলা হয়নি। গেনুদা সবাইকে নিয়ে গ্রামের

শীতলা মন্দিরের চাতালে বসে গল্প শোনাচ্ছিল। একবার গেনুদার ছোড়দাদু গিয়েছিলেন অম্বিকাচকের হাটে। রাধামণি গ্রামের পাশের গ্রাম অম্বিকাচক। ফিরতে-ফিরতে রাত ন'টা হয়ে গিয়েছিল। রাধামণি আর অম্বিকাচকের মাঝে পড়ে শ্মশানকালীর বাঁশবন। দশ বছর অন্তর-অন্তর রাধামণি গ্রামের বাসিন্দারা শ্মশানকালীর পুজো করেন সেখানে। গেনুদার ছোড়দাদু ঠিক সেখানে আসতেই দেখলেন, রাস্তার ওপর শুয়ে আছে একটা ন্যাড়ামুড়ো বাঁশগাছ। তিনি ভাবলেন, কোনওভাবে বাঁশগাছটার গোড়া আলগা হয়ে গিয়েছিল, তাই হয়তো দমকা বাতাসে পড়ে গেছে রাস্তার ওপর। এই ভেবে যেই বাঁশগাছটা ডিঙনোর জন্য পা বাড়িয়েছেন, অমনিই বাঁশগাছটা উঠে গেল শূন্যে। ভীষণ এক আছাড় খেলেন ছোড়দাদু। সেই যে তাঁর কোমরের হাড় ভাঙল, শেষপর্যন্ত কখনও সোজা হয়ে হাঁটতে পারেননি গেনুদার ছোড়দাদু।

গেনুদাই বলেছিল, চার-পাঁচটা গ্রামের ভূত বিধু গুনিনের জ্বালায় নাকি অতিষ্ট। যে ভূতগুলোকে বিধু গুনিন রাধামণি গ্রাম থেকে তাড়িয়েছে, তারা ওই শ্মশানকালীর বাঁশবনে থাকার জন্য আশ্রয় চেয়ে নিয়েছে বিধু গুনিনের কাছ থেকে। ওই বাঁশবনের মাঝখানে আছে একটা প্রকাণ্ড মহানিমের গাছ। চৈত্র মাসের অমাবস্যার রাতে ওই মহানিমের গাছে বিধু গুনিনের বিরুদ্ধে সভা বসে ভূতেদের। বুক-ফাটা গরমে কোথাও যখন একটুও বাতাস থাকে না, তখনও সারারাত ঝড়ের মতো দোল খায় গোটা বাঁশবন, তোলপাড় হয় প্রকাণ্ড মহানিমের গাছ। খোনা গলায় সারারাত নানারকম কথা শোনা যায়। কেউ-কেউ নাকি ভূতের আলো জ্বলতে-নিভতেও দেখেছে ওই রাতে।

গেনুদা বলেছিল, বিধু গুনিন যে ভূতগুলোকে বোতলে পুরে মুখ বন্ধ করে কাঁকনকুশি নদীর জলে ফেলে দিয়ে আসছে, শুধু ওই ভূতগুলোই যা বন্দি থেকে যাচ্ছে চিরদিনের মতো। তবে নাকি ভূতকে বোতলে পুরতে খুব কষ্ট হয় বিধু গুনিনের। একটা ভূতকে বোতলে পোরবার পর তিনদিন মড়ার মতো শুয়ে থাকে বিধু গুনিন। উঠে দাঁড়াতে পারে না পর্যন্ত।

বিধু গুনিন হরেকরকমের তুকতাকও জানে। সে বলে, বড়দের ভূত তাড়ানো একরকম, ছোটদের ভূত তাড়ানো নাকি আর-একরকম। বিধু গুনিন ভূত তাড়ানোর অনেক মন্ত্রও জানে। গেনুদা কীভাবে যে দু'লাইনের একটা মন্ত্র জেনে ফেলেছে। একে মন্ত্র বলা যায়, আবার পদ্যও বলা যায়। বিধু গুনিন তেমন-তেমন ছেলেমেয়েকে পেলে চুপিচুপি মন্ত্রটা শিখিয়ে দেয়। ছোটদের ভূতেধরা একদম পছন্দ নয় বিধু গুনিনের। ভূতের ভয় পেলে মন্ত্রটা খুব নিচু স্বরে তিনবার আওড়ে গেলেই হল। ভূত পালিয়ে যাবে কোন তেপান্তরে। গেনুদা সেদিন সন্ধেবেলা শীতলা মন্দিরের চাতালে বসে মন্ত্রটা বলেছিল। আরও বলেছিল, ভূতের শরীর নাকি একদম মানুষের মতো। শুধু পায়ের গোড়ালি দুটো মানুষের মতো পেছনের দিকে থাকে না, থাকে সামনের দিকে। আর ভূতকে 'কুটুম' বললে নাকি ভূতেরা খুব খুশি হয়, আবার 'ভূতকুটুম' শব্দটা উল্টে বললে নাকি আরও খুশি হয়। মন্ত্রটা একবার শুনে মুখস্থ করে নিয়েছে মহিম।

আমগাছের, জামগাছের, আকন্দগাছের ফুল।
মুটুকুতভু, মুটুকুতভু, ভূতকুটুমের দুল।।

রাত্রে শুতে যাওয়ার সময় কেমন ভয়-ভয় করল বলে মহিম তিনবার মন্ত্রটা বিড়বিড় করে বলে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন স্কুল থেকে ফিরে মহিম কীরকম অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরছিল উঠোনে। কখনও টগরগাছের পাতায় হাত বুলোচ্ছে। কখনও করবীগাছের নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকছে। মা মহিমকে স্কুল থেকে ফেরার পর কখনও এত অন্যমনস্ক হতে দেখেননি। প্রতিদিন খেলার মাঠে যাওয়ার জন্য ছটফট করে। মা তাই মহিমকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবু, তোমার শরীর খারাপ নাকি?"

মহিম সাদা কলকে ফুলের গাছটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "না তো!"

"তাহলে আজ তো কই মাঠে যাওয়ার কথা বলছ না! অন্যদিন তো মাঠে যাওয়া জন্য. . ."

মার কথা শেষ হওয়ার আগেই মহিম ধীর পায়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বলল, "এই তো যাচ্ছি।"

মহিম হাঁটতে-হাঁটতে অনিল মাইতিদের শেওড়াগাছের কাছে রাস্তার বাঁক ঘুরে চোখের আড়াল হয়ে গেল। মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, ছেলেটার শরীর খারাপ নাকি! কীরকম যেন মন-শুকনো দেখাচ্ছে। ভাবতে-ভাবতে যেই বাড়ির কাজে মন দেবেন বলে পেছন ফিরেছেন, অমনই পাশের বাড়ির দীপন ডাকল, "কাকিমা।"

মহিমের মা ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে দিপু?"

দীপন বলল, "জানো তো কাকিমা, মহিমকে আজ অঙ্কের ক্লাসে দেববাবু সারা ক্লাসটা দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন।"

"কেন রে? মহিম কি অঙ্ক পারেনি?"

"না, না। আমাদের এখন তো বিবিধ প্রশ্নমালার অঙ্ক করাচ্ছেন সার। ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত ওই প্রশ্নমালার অঙ্ক দেববাবু আমাদের বাড়ি থেকে করে নিয়ে যেতে দিয়েছিলেন। সবাই করে নিয়ে গেছে। কিন্তু মহিম বলল, ওর অঙ্ক করা হয়নি। সবাই খাতা জমা দিয়েছে।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। মহিম ফিরে আসুক। ও তো সব অঙ্কই চটপট করে ফেলে।"

"মহিম কোথায় কাকিমা?"

"ও তো মাঠে গেল। তুই যাবি না মাঠে?"

"হ্যাঁ, মাঠেই তো যাচ্ছি।" বলে ছুটতে-ছুটতে দীপন চলে গেল।

মা মনে-মনে ভাবতে লাগলেন, ও, তাই বুঝি ছেলের অমন মনখারাপ! কিন্তু মহিন তো অঙ্কে একদম ভয় পায় না! তাহলে আজ অঙ্কগুলো করে নিয়ে গেল না কেন? তিনি নিজেও আজ সকালে পড়ার সময় মহিমের কাছে বসতে পারেননি। মহিমের বাবার এক ছেলেবেলার বন্ধু এসেছিলেন। তাই ব্যস্ত ছিলেন। যাক্, মহিম মাঠ থেকে ফিরুক, তারপর খোঁজ নেবেন। মা কাজে মন দিলেন।

বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। আর-একটু পরে সন্ধে নামবে। বাদুড়গুলো এসে পেয়ারাগাছের ডালগুলো তছনছ করবে একটু পরেই। পেয়ারাতলাটা যা নোংরা করেছে। মা পেয়ারাতলাটা ঝাঁট দিচ্ছিলেন। হাঁস দুটো পুকুর থেকে এখনও ফেরেনি। তুলে আনা দরকার। পুকুরঘাটে গিয়ে ডাকতে লাগলেন, "আয়, আয়—চইচই, চইচই।"

হাঁস দুটো হয়েছেও তেমনই! এই ঘাটের কাছে আসে, তো ফের চলে যায় মাঝপুকুরে। শেষমেশ হাঁস দুটোকে তাড়িয়ে নিয়ে মা বাড়ি যাচ্ছিলেন, এমন সময় বিপাশার বাবা রাস্তা থেকে বললেন, "দিদি, ছেলেটাকে বকেছেন বুঝি? আমি করঞ্জলিপুর থেকে ফিরছিলাম, দেখি মহিম কুশির ধারে বসে আছে একটা শিমুলগাছের নীচে।"

গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ কাকঁনকুশি নদীকে উচ্চারণের সুবিধের জন্য ছোট করে নিয়ে শুধু 'কুশি' বলেই ডাকে। মহিমের মা বললেন, "না, না, মহিম তো মাঠে খেলতে গেছে। আপনি কাকে দেখতে কাকে দেখেছেন!"

"না দিদি, আমি যে কথা বললাম, বললাম, 'মহিম, কুশির ধারে একা-একা বসে আছিস কেন? বাড়ি চল।' ও বলল, 'এই তো, এবার বাড়ি যাব।' মহিম বাড়ি ফিরলে জিজ্ঞেস করবেন।" বলেই বিপাশার বাবা চলে গেলেন।

আরও ভাবনায় পড়ে গেলেন মহিমের মা। ছেলেটা তাহলে মাঠে যায়নি! খুব মন খারাপ হয়েছে তাহলে। বরং আজ না পাঠালেই ভাল ছিল। আনচান করে উঠল তাঁর মন। সন্ধের অন্ধকার আড়াল করে দিচ্ছে শেষ বিকেলের আলোটুকু। মহিমের মা কুশির ধারে কাউকে পাঠাবেন কি না ভাবছিলেন, এমন সময় ছুটতে-ছুটতে মহিম ফিরে এল।

তখনই ছেলেকে ওইসব কথা কিছুই না বলে মা শুধু বললেন, "নাও বাবু, চটপট হাতমুখ ধুয়ে এসে পড়তে বসো।"

হাতমুখ ধুয়ে আসার পর মা মহিমকে দুধ খেতে দিলেন এক গ্লাস। তারপর হাঁস দুটোর গল্প বলতে লাগলেন। গল্প না বললে মহিমের কোনও কিছু খাওয়া হয় না। মহিমও হাঁস দুটোর মাঝ-পুকুরে পালিয়ে যাওয়ার কথা শুনে বেশ মজা পেল। মা হাসতে-হাসতে বললেন, "নাও, এবার দুধ খাওয়া হয়ে গেছে। আর দেরি করো না। তোমার বই-খাতা আনো তো বাবু।"

মহিম বই-খাতা নিয়ে আসার পর মা বললেন, "আচ্ছা বাবু, তুমি নাকি আজ বাড়ি থেকে অঙ্ক করে নিয়ে যাওনি স্কুলে? আমাকে দীপন বলল, সবাই অঙ্কের খাতা জমা দিয়েছে, তুমি নাকি দাওনি? তুমি কি অঙ্কগুলো পারোনি?"

মহিম মুখ নিচু করে বলল, "হ্যাঁ, অঙ্ক করতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম মা। যখন দেববাবু সবাইকে অঙ্কের খাতা জমা দিতে বললেন, তখন আমি অঙ্কের খাতাটা খুলে দেখি, একটাও অঙ্ক করা হয়নি।"

মা নরম গলায় বললেন, "এমন করে পড়াশোনার কথা ভুলে গেলে চলে বাবা?" মনে-মনে ভাবলেন, অনেক কথাই মহিম ঠিকঠাক মনে রাখতে পারে না। আগেও এই নিয়ে মহিমের বাবার সঙ্গে কথাও হয়েছে। মা ভাবলেন, এবার একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে মহিমকে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে আনবেন। মহিমের বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে আজই এই নিয়ে কথা বলবেন। মা মহিমকে নরম সুরে ডাকলেন, "আচ্ছা বাবু, তুমি তো বিকেলে আমাকে বলে গেলে যে মাঠে যাচ্ছ। অথচ, তুমি মাঠে যাওনি। কুশির ধারে চুপচাপ গিয়ে বসে ছিলে। দেববাবু বকেছিলেন বলে মনখারাপ করে কুশির ধারে গিয়েছিলে?"

মহিম বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল, "না, মা। তুমি কী বলছ? আমি তো মাঠে গিয়েছিলাম। কই, কুশির ধারে যাইনি তো!"

বিপাশার বাবা তোমাকে দেখে এসেছেন, তুমি চুপচাপ কুশির ধারে শিমুলগাছের নীচে একা বসে আছ। উনি তোমার সঙ্গে কথাও বলেছেন।"

"না, মা। আমি কুশির ধারে যাইনি। তুমি বিশ্বাস করো। আজ আমি একটা গোলও দিয়েছিলাম। শুধু অন্তুটা যদি না অফ সাইডে দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে গেনুদা গোলের বাঁশি বাজাত ঠিক। তুমি গেনুদাকে জিজ্ঞেস কোরো।"

মা গেনুদাকে জিজ্ঞেস করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না, পাশের বাড়ির দীপনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন।

দীপন বলল, "না কাকিমা, মহিমকে তো আজ খেলার মাঠে দেখিনি।"

মহিম প্রতিবাদ করে বলল, "তুই কী বলছিস, আমি যে গোল দিলাম, অন্তু অফ সাইডে ছিল বলে গেনুদা গোলের বাঁশি বাজাল না, আর তুই বলছিস কিনা আমি মাঠে যাইনি!"

দীপন জোর দিয়েই বলল, "না, না, তুই অন্য কোনওদিনের গল্প বলছিস হয়তো। আজ তুই মাঠে যাসইনি।"

মা ফিরে এলেন মহিমকে নিয়ে। মহিম কিন্তু ভাবল, দীপন ঠিক বলছে না, ও মাঠেই গিয়েছিল আজ। আবার ভাবল, বিপাশার বাবা যে কুশির ধারে তাকে বসে থাকতে দেখেছেন? তাহলে কি আর-একজন মহিম. . ., হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তারই মতো দেখতে আর-একজন মহিমকে তিনি কুশির ধারে দেখেছেন। ইস, সেই মহিমের ছায়া পড়েছিল কিনা যদি বিপাশার বাবা দেখতেন, তাহলে ঠিক হত। গেনুদা বলেছিল, ভূতের নাকি ছায়া পড়ে না। মহিমের ভয়-ভয় করল বেশ। সে তখন মায়ের কাছে সরে এসে বসল।

মা বললেন, "নাও বাবু, এবার পড়া শুরু করো। প্রথমে বিবিধ প্রশ্নমালার অঙ্কগুলো করে নাও। তারপর কালকের পড়া করবে। কোন অঙ্কটা বুঝতে পারছ না, আমাকে বলো।"

মহিম স্কুলব্যাগ থেকে বই-খাতা বের করল। তারপর অঙ্কের খাতাটা খুলেই অবাক হয়ে গেল। প্রায় চিৎকার করে উঠল মহিম, "মা, এ কী?"

মাও ওর চিৎকারে অবাক হয়ে বললেন, "কী হয়েছে বাবা?"

অঙ্কের খাতাটা এগিয়ে দিয়ে একদম মায়ের কোলের কাছে সরে এল মহিম। মা দেখলেন, সব অঙ্কই তো করা আছে খাতায়। বললেন, "তুমি তো সব অঙ্কই করেছ বাবা। খাতা দেখতে ভুল করেছিলে?"

মহিম জোর দিয়ে বলল, "না, মা, আমি তো ঠিকই খাতাটা দেখেছিলাম।"

মা একটু হেসে বললেন, "তাহলে কে আবার লুকিয়ে-লুকিয়ে তোমার খাতায় অঙ্কগুলো করে দিয়ে গেল? বোকা ছেলে কোথাকার!"

মহিমের তো ওই একটাই প্রশ্ন। কে খাতায় অঙ্কগুলো করে দিয়ে গেল? এ নিশ্চয়ই কুশির ধারে বসে থাকা আর-একজন মহিমেরই কাজ।

মা বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মহিম মায়ের আঁচলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বিড়বিড় করে তিনবার সেই মন্ত্রটা আওড়ে গেল—

আমগাছের, জামগাছের, আকন্দগাছের ফুল।
মটুকুতভূ, মটুকুতভূ, ভূতকুটুমের দুল।।

www.arisumu.com

বছর কুড়ি আগে

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

এই গল্প যারা পড়বে তারা সকলেই হয়তো এক বাক্যে বলবে এটা স্রেফ চমক সৃষ্টিকারী মস্তিষ্কপ্রসূত একটা ঘটনা মাত্র। কিন্তু এই গল্প যিনি আমাকে বলেছিলেন তাঁকে অবিশ্বাস করার মতো মানসিকতা আমার অন্তত নেই। ঘটনাকালও খুব বেশি পুরনো দিনের নয়। মাত্র বছর কুড়ি আগেকার কথা। মৌলালীর কাছে রতিকান্ত পোদ্দার নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। খুবই অভাবী লোক। স্ত্রী এবং দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দারিদ্রের সংসার। ভদ্রলোক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসা গুটিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় চাকরি খুইয়ে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন ভদ্রলোক। একেই চাকুরিহীন হয়ে মন মেজাজের ঠিক ছিল না, তার ওপর স্ত্রীর গঞ্জনা শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে রতিকান্তবাবু ঠিক করলেন আত্মহত্যা করে এই কলহ ও দুর্ভাবনার হাত থেকে রেহাই নেবেন তিনি।

এই ভেবে এক রাতে রতিকান্তবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবার অলক্ষ্যে কাছাকাছি এক বিখ্যাত কবরখানায় ঢুকে পড়লেন। পকেটে কাগজে মোড়া বিষও ছিল। এটা খেলেই সব জ্বালার অবসান হয়ে যাবে। নিরাপদে দেহরক্ষার জন্য নির্জন কবরখানাই হচ্ছে উপযুক্ত স্থান। এখানে কেউ চেঁচামেচি করবে না, বাধা দেবে না, অথচ শান্তিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া যাবে।

তখন গরমের দিন। তায় ফুটফুটে জ্যোছনার রাত। রতিকান্তবাবু কবরখানায় ঢুকে চাঁদের আলোয় আলোকিত জায়গাটার ভেতরের রূপ দেখে রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে গেলেন। চিরকাল এর বাইরে দিয়েই যাতায়াত করেছেন তিনি। ভেতরে কখনো ঢোকার প্রয়োজন মনে করেননি। আজ ভেতরে ঢুকে এক গভীর প্রশান্তিতে ভরে উঠল তাঁর মন প্রাণ। অন্য সময় হলে কবরখানায় ঢোকার কথা সজ্ঞানে চিন্তাই করতে পারতেন না তিনি। কিন্তু মৃত্যুর জন্য যে মানুষ তৈরি, তার আর ভয় কিসের?

কবরখানায় ঢুকে এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি। কত বিচিত্র রকমের স্মৃতিসৌধ যে আছে তা তাঁর ধারণারও বাইরে ছিল। অবশেষে অনেক ক্লান্ত হয়ে একটি খুব সুন্দর সোপানযুক্ত বড়সড় স্মৃতিসৌধর ওপর বসে পড়লেন। ফুরফুর করে হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ায় ঘুম নেমে আসছে চোখে। কত মানুষ তো এর ভেতরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। কাজেই এর ওপর শুয়ে যদি কেউ একটু ঘুমোয় তো কার কি বলার আছে? এই ভেবে তিনি কবর-সৌধর মসৃণ পাথরের চাতালে শুয়ে পড়লেন। কেউ কোথাও নেই। নিস্তব্ধ নিঝুম চারিদিক। শুধু আগাছায় ভরা। মাঝে মধ্যে দু' একটা কেঁদো কুকুরের ছুটোছুটি

ছাড়া আর কারো অস্তিত্বও নেই। শুয়ে থাকতে থাকতেই ঘুমে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন খেয়ালও নেই তাঁর। হঠাৎ একজনের ধমকে ঘুম ছুটে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই দেখলেন তাঁর সামনে একজন দীর্ঘ দেহ খাঁটি ইংরেজ সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যোছনার আলোয় সাহেবের গায়ের রঙে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরোচ্ছে। আর নীল চোখ দুটো যেন কাচের গুলির মতো চিকচিক করছে।

রতিকান্তবাবুকে উঠে বসতে দেখে কড়া গলায় সাহেব বললেন—হোয়াট নন্‌সেন্স ইজ দিস! গেট ডাউন।

রতিকান্তবাবু সাহেবের ধমক খেয়ে কবরের চাতাল থেকে মারলেন এক লাফ।

সাহেব ভাঙা ভাঙা বাংলায় গলার স্বর কঠিন করেই বললেন—কি নাম আছে টোমার?

—আজ্ঞে আমার নাম রতিকান্ত পোদ্দার।

—এটো রাটে টুমি কবরখানায় মটো আসিয়াছো কেন?

—আমি ভুল করে এসে পড়েছি সাহেব। আর কখনো আসব না।

—আর কখনো আসিবার সময় টুমি পাইলে টো আসিবে। হামি টো এখুনি টোমাকে গোলি করিয়া মারিয়া ডিবে।

রতিকান্তবাবু আত্মহত্যা করবেন বলেই এসেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—আমাকে এবারের মতন ক্ষমা করুন সাহেব। আমি এর আগে কখনো এখানে আসিনি। মা কালীর দিব্যি, আর কখনো আসবোও না। বহু দুঃখে এসেছিলাম, বলে পকেট থেকে কাগজে মোড়া বিষটা বার করে বললেন—এই দেখুন, আমি এটা খেয়ে সুইসাইড করব বলে এসেছিলাম।

—কী ওটা?

—এটা বিষ।

—কই ডেখি?

রতিকান্তবাবু সাহেবের হাতে বিষটা দিতেই সাহেব সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন—এটা খাইলে ইঁদুর ছুচা মরিবে। টুমি মরিবে কেন? ডু একবার বমি করিলেই টো বাঁচিয়া উঠিবে টুমি। একদম ভেজাল চীজ আছে।

রতিকান্তবাবু আঁৎকে উঠে বললেন—অ্যা! ভেজাল?

—টবে না টো কি? টোমরা স্বডেশীরা আসল মাল খাওয়াইবে লোককে? টা যাক। কিনটু টুমি সুইসাইড করিটে আসিয়াছিলে কেন? হামি মরিয়া যেখানে বাঁচিয়া উঠিতে চাহিটেছি টুমি বাঁচিয়া সেখানে মরিয়া যাইটে চাহিটেছ কি কারণে?

রতিকান্তবাবু তো লাফিয়ে উঠলেন—আ-আপনি বাঁচতে চাইছেন? মা-মা-মানে আপনি বেঁচে নেই? তার মানে আপনি মি-মি-মৃত?

—হ্যাঁ, হামি মৃটো। বাঁচিয়া ঠাকিলে হামি এই রাট ডুপুরে টোমার সঙ্গে এইখানে কি নক্সা মারিটে আসিটাম? টুমি যে কবরের উপর শুইয়া আছ এইটাই হামার কবর।

রতিকান্ত বললেন—অ। বুঝেছি। তা আপনি কতদিন আগে মরেছেন সাহেব?

—তাহা শুনিয়া টোমার লাভটা কি? টোমরা স্বডেশীরাই একডিন হামাকে গোলি করিয়া মারিয়াছিলে।

—তা হতে পারে। তবে আমি কিন্তু স্বদেশী ফদেশী নই সাহেব। দেশ এখন স্বাধীন হয়ে গেছে। আমি আপনাকে মারিনি। মা কালীর দিব্যি। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন সাহেব।

—ড্যাম ফুল ব্লাডি ইডিয়ট। টুমি মরিটে আসিয়াছো যডি টো বাঁচিবার জন্য এমন ছটফট করিটেছ কেন? কান ঢরিয়া ওঠ্‌বোস করো।

রতিকান্তবাবু তাই করলেন।

—স্টপ্। এইবার হামাকে সোট্‌টো করিয়া বলোটো টুমি এইখানে মরিটে আসিয়াছিলে কেন?

রতিকান্তবাবু বললেন—আমার দুঃখের কথা কি আর বলব সাহেব, বড় কষ্টে দিন কাটছে আমার। খুব গরীব লোক আমি। তার ওপর চাকরিটা খোয়ালাম।

—চাকরি খোয়াইলে? কেন? চুরি করিয়াছিলে না ঘুষ খাইয়াছিলে?

—ওসব কিছু নয় সাহেব। কোম্পানীটা উঠে গেল।

—ফের মিট্টা কঠা বলিতেছ? উঠিয়া গেল না উঠাইয়া ডিলে? কোনো কোম্পানী কি শুটু শুটু উঠিয়া যায়? যাক। টুমি টাহলে বলিটে চাও চাকরি খোয়াইয়া

টুমি অসুবিধায় পড়িয়াছ। পেট ভরিয়া খাইটে পাও না।

—হ্যাঁ, আমার বউ ছেলে মেয়ে সব আছে। আমি এখন এমনই অভাবে পড়েছি যে নিজেও খেতে পাই না, তাদেরও খেতে দিতে পারি না।

—অ। এইজন্য টুমি মরিটে আসিয়াছিলে?

—ঠিক তাই।

—মরিয়া টুমি ভুট হইটে আর আকাশ হইটে খাবার পাড়িয়া উহাডের খাইটে ডিটে, এই টো?

—হ্যাঁ।

—ইডিয়ট। টোমার কি ধারণা সব লোক মরিলেই ভূট হয়?

—জানি না সাহেব।

—ঠিক আছে। হামি টোমার সব কঠা শুনিলাম। টোমার স্যুইসাইড করিবার প্রয়োজন নাই। হামি টোমাকে একটা গিনি ডিটেছি। টুমি এইটি লইয়া চলিয়া যাও। এইটি বিক্রয় করিলে অনেক টাকা পাইবে টুমি। ঐ টাকায় টোমরা পেট ভরিয়া খাইয়া বাঁচিবে। টাকা ফুরাইলে টুমি আবার আসিবে হামার কাছে। হামি টোমাকে আবার গিনি ডিবো। কিনটু এই কঠা টুমি কাউকে বলিবে না। যডি বলো, হামি টোমাকে মারিয়া ফেলিব।

রতিকান্তবাবু গিনিটা পকেটে পুরেই কবরখানার বাইরে এসে একবার গিনিটা বার করে দেখলেন সত্যিই সেটা পকেটে আছে কিনা। কেননা এতক্ষণ যা ঘটে গেল তা তো রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হাত দিতেই ধাতব গিনিটা হাতে ঠেকল। এই তো, এই তো রয়েছে। তবে তো মিথ্যে নয়। কেননা তাঁর বারবারই মনে হচ্ছিল এতক্ষণ তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু চকচকে গিনিটা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল এতক্ষণ যা তিনি দেখেছেন তা সত্যই।

রতিকান্তবাবু গিনিটা পরদিনই একটি জুয়েলারীর দোকানে বিক্রি করে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকগুলি অর্থ লাভ করলেন। কারণ গিনিটির ধাতব মূল্যের থেকেও এর প্রাচীনত্বের দাম ছিল অনেক।

দোকানদার রতিকান্তবাবুর পূর্ব পরিচিত। গিনি দেখেই বললেন—কী ব্যাপার রতিকান্তবাবু, এ মাল কোথায় পেলেন?

—কোথায় আর পাবো মশাই? আমারই ছিল। বাবা জাহাজে কাজ করতেন। সাহেবদের নেকনজরে পড়ে গিয়েছিলেন। দু' একদিন ছাড়াই সাহেবরা বাবাকে একটা করে গিনি উপহার দিতেন। তারই কিছু কিছু জমানো ছিল। এতদিন বেচিনি। এখন অভাবের জ্বালায় বেচতে এসেছি।

—তা বেশ করেছেন। তবে একটা কথা, আপনার যখনই ওগুলো বেচবার দরকার হবে তখন আমার দোকানেই আসবেন, কেমন? কেননা এ জিনিস আমরা দাম দিয়ে কিনলেও এগুলো আমরা নষ্ট করব না। এতদিন আপনার সঞ্চয়ে ছিল, এবার আমার সংগ্রহে থাকবে, এই আর কি।

রতিকান্তবাবু গিনি বিক্রির টাকা গৃহিণীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। গৃহিণী অবাক হয়ে বললেন, ও বাবা! এত টাকা! কোথায় পেলে তুমি? এই যে শুনলুম তোমার চাকরি নেই।

—চাকরি সত্যিই নেই। আপাততঃ ছোটখাটো কাজ একটা জুটিয়ে নিয়েছি। তবে দিনমানে নয়, রাতে।

—রাতে! কোনো খারাপ কাজ নয় তো?

—না। আর হলেও তোমার তাতে কি? খারাপ কাজ করলে তার ফল আমিই ভোগ করব। তুমি তো করবে না। আমি টাকা আনব, তুমি সংসার চালাবে। আমি কি করছি না করছি সে ব্যাপারে তুমি একদম মাথা গলিও না।

গৃহিণী চুপ করে গেলেন।

রতিকান্তবাবু সাহেবের কথামতো গিনি প্রসঙ্গও তুললেন না, সাহেবের কথাও বললেন না। তবে পরদিন থেকে রোজই সন্ধের পর চাকরি করতে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা কবরখানায় চলে যেতেন এবং সাহেবের স্মৃতিসৌধ নিজে হাতে পরিষ্কার করে দিতেন। সাহেবও রোজই একবার করে দেখা দিতেন রতিকান্তবাবুকে এবং প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে একটি করে গিনি উপহার দিতেন।

এই ভাবেই দিন যায়।

একদিন হঠাৎ গিনি বিক্রি করতে গিয়ে রতিকান্তবাবু হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন সাদা পোশাকের পুলিশের

www.arisumu.com

হাতে। দোকানদারের কারসাজিতেই হোক বা অন্য কোনোভাবেই হোক রতিকান্তবাবু পুলিশের শিকার হলেন।

পুলিশ নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে জানতে চাইল রতিকান্তবাবুকে, এগুলো চোরাই মাল, না সত্যিই তাদের পিতৃপুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তি। যদি তাই-ই হয় তবে তার পরিমাণ এখন কত?

রতিকান্তবাবু কি আর বলেন? তিনি একই কথা বার বার বলতে লাগলেন—এসব চোরাই মাল নয়, সবই তাঁর পিতৃদত্ত ধন। এমন কি এও বললেন, আজকের এই গিনিটি ছাড়া তাঁর সঞ্চয়ে আর একটি গিনিও অবশিষ্ট নেই।

পুলিশ তবুও তাঁর কথা বিশ্বাস করল না। কেননা এই গিনিগুলোর একটির সাথে আর একটির মিল নেই। যথেষ্ট সময়ের ব্যবধানে এগুলি তৈরি হয়েছিল। কাজেই একই লোকের কাছে বিভিন্ন সময়ের এতগুলি গিনি কি করে থাকতে পারে? এটা একটা রীতিমতো সন্দেহের ব্যাপার। তাই পুলিশ রতিকান্তবাবুকে অ্যারেস্ট করে তাঁর বাড়িতে এসে ঘরদোর তছনছ করে চারিদিক তন্ন তন্ন করে নেড়ে ঘেঁটে কিছুই না পেয়ে ফিরে গেল। ফিরে গিয়েও লক আপে রাখা রতিকান্তবাবুকে ভীতি প্রদর্শন করে কথা আদায়ের চেষ্টা করতে লাগল।

রতিকান্তবাবু অনেক কাঁদাকাটা করলেন। দারোগাবাবুর হাতে পায়ে ধরলেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না তাতে। রতিকান্তবাবুর গৃহিণী এসেও হাতে পায়ে ধরলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

দারোগাবাবু বললেন—যতক্ষণ না সত্যিকথা বলবেন উনি, ততক্ষণ ওনাকে ছাড়া হবে না।

রতিকান্তবাবুর গৃহিণী স্বামীর কাছে গিয়ে কেঁদে বললেন—আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল, নিশ্চয়ই তুমি কোনো খারাপ কাজ করছ। কেন ও কাজ করতে গেলে তুমি? রোজ সন্ধেবেলা তুমি চাকরি করতে যাবার নাম

করে বেরোতে আর ফিরতে রাত বারোটার পর। এখন আমি কি করি?

রতিকান্তবাবু তখন সাহেবের নিষেধ সত্ত্বেও সব কথা খুলে বললেন গৃহিণীকে। এবং বললেন, যে ভাবেই হোক সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে এই বিপদের কথাটা জানিয়ে আসতে।

গৃহিণী তো ভয়েই সারা। শোনা মাত্রই আঁৎকে উঠে বললেন—ওরে বাবা! কবরখানায় ঢুকে সাহেব ভূতের সঙ্গে আমি কি করে কথা বলব গো! একেই আমার ভূতের ভয়।

রতিকান্তবাবু বললেন—তা অবশ্য ঠিক। তবু তুমি এক কাজ করো, আমি বরং একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি সেটা সাহেবের কবরের ওপর পাথর চাপা দিয়ে রেখে এসো। তবে খুব সাবধান। ভুলেও যেন কারো কাছে বলো না একথা।

—না, না, তা বলব না। কিন্তু আমি সাহেবের কবর চিনব কি করে?

—সে সব বলে দিচ্ছি আমি। বলেই রতিকান্তবাবু একটা সাদা কাগজে দু' এক ছত্রে নিজের বিপদের কথা জানিয়ে লিখে দিলেন, 'প্লিজ হেল্প মি', তারপর গৃহিণীকে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে কোন্‌খানে যেতে হবে। এবং এও বলে দিলেন ঐ কবরখানার সবচেয়ে বড় স্মৃতিসৌধটাই সাহেবের।

রতিকান্তবাবুর গৃহিণী দিনের আলো থাকতে থাকতেই রক্ষীদের নজর এড়িয়ে ভাঙা পাঁচিলের পাশ দিয়ে কবরখানায় ঢুকে পড়লেন। তারপর রতিকান্তবাবু যেভাবে যেমন করে যেতে বলে দিয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই গিয়ে এখানকার সবচেয়ে বড় স্মৃতিসৌধটির কাছে পৌঁছলেন। তারপর বিশেষ চিহ্ন আঁকা দীর্ঘ এপিটাফের নীচে একটি পাথর চাপা দিয়ে চিঠিটা রেখে চলে এলেন।

রাত তখন একটা।

থানার লক-আপের ভেতরে দারোগাবাবু রতিকান্তবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদের পর জিজ্ঞাসাবাদ করে চলেছেন। আর রতিকান্তবাবুও সেই একই উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন—বিশ্বাস করুন আপনারা, আমি চুরি করিনি। এ সবই আমার পিতৃদত্ত ধন। যা ছিল সবই বেচে দিয়েছি। তাছাড়া আপনারা তো আমার বাড়ি তল্লাস করে দেখেই এসেছেন, তবুও কেন অবিশ্বাস করছেন আমাকে?

—অবিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই করছি। এই সব দুষ্প্রাপ্য গিনিগুলি আপনার পিতৃদত্ত ধন হলে আপনার এই রকম দশা হতো? আপনি তাহলে ভাড়া বাড়িতে টিনের ঘরে থাকতেন? চালাকির জায়গা পাননি?

রতিকান্তবাবু নীরব। সত্যিই তো। কী উত্তর দেবেন তিনি?

এমন সময় হঠাৎ এক কাণ্ড।

রুদ্র মূর্তিতে ঝড়ের বেগে যিনি এসে সেখানে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখেই চমকে উঠলেন সকলেই। দরোয়ান থেকে ও. সি. পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে স্যালুট করলেন তাঁকে। সেই অতি ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন সবাই। কে ইনি? পুলিশ কমিশনার? না। তিনি তো বাঙালি। তবে কি সেন্ট্রাল থেকে এসেছেন কোনো ব্রিগেডিয়ার? তাই বা কি করে হবে? ইউনিফর্ম তো পরে আছেন উচ্চপদস্থ সার্জান্টের। তাহলে? কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব! কী ভয়ানক তাঁর নীল চোখের চাহনি! কী হিংস্র তাঁর লাল টকটকে মুখ! খাঁটি ইংরেজ সাহেব। কে পাঠাল এঁকে? কোথা থেকে এলেন?

সাহেব এসেই গটগট করে ও. সি.র ঘরে ঢুকলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ক্রুদ্ধ চোখে ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। টেবিলের কাগজপত্তরগুলো একটু নাড়াচাড়া করলেন। চেয়ারটা টেনে নিয়ে একবার বসতে গিয়েও বসলেন না। জুতোসুদ্ধু একটা পা চেয়ারের ওপর রাখলেন। তারপর টেবিলে রাখা ময়লা ছোপ ধরা কাচের গেলাসটা ঘরের কোণে আছাড় মেরে বোমার মতো ফেটে পড়লেন—আমার ঘরের এই রকম অবোসঠা কে করিয়াছে? তারপর ও. সি.র দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন—হু আর য়্যু?

ও. সি. সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন—স্যার, আমি বর্তমানে এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার।

—ইউ ব্লাডি ফুল। টেল মিস্টার টেগার্ট। ইউ আর রিয়্যালি আনফিট ফর দিস পোস্ট।

তারপর গোটা থানার চারিদিক ব্যাঘ্র বিক্রমে ঘুরে ফিরে দেখে লক-আপের কাছে এসে রতিকান্তবাবুর দিকে তাকিয়ে ও. সি.-কে বললেন—এই লোকটাকে তোমরা ধরিয়া রাখিয়াছ কেন?

—একে আমরা স্মাগলার সন্দেহ ধরে রেখেছি স্যার।

—ব্লাডি ফুল। হি ইজ এ ভেরি গুড্ ম্যান। আই নো হিম। যডি ভালো চাও টো তোমরা ইহাকে এখুনি ছাড়িয়া ডাও।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দেওয়া হলো রতিকান্তবাবুকে।

লক আপ থেকে বেরিয়ে রতিকান্তবাবু দেঁতো হেসে সাহেবকে একটা স্যালুট দিলেন।

সাহেব রতিকান্তবাবুকে ধমকালেন—গেট আউট অফ হিয়ার।

রতিকান্তবাবু সাহেবের এ রকম মূর্তি কখনো দেখেনি। এমন ইউনিফরম পরা বদমেজাজি পুলিশি চেহারা কখনো না। তাই ধমক খেয়ে কোনো রকমে কোঁচা গুটোতে গুটোতে দৌড়ে পালালেন।

রতিকান্তবাবু চলে যাবার পর সাহেবও চলে গেলেন ঝড়ের বেগে।

আর থানাসুদ্ধু লোক ভয়ে বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

সাহেব যাবার আগে পুলিশের খাতায় খসখস করে কি যেন সব লিখে গেছেন।

বিস্ময়ের ঘোর কাটলে সবাই একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে খাতার পাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখলেন সাহেব যা লিখে গেছেন 'দি ম্যান ইজ নোন টু মি এ্যান্ড অ্যাজ সাচ আই অ্যাম রিলিজিং হিম।' লেখার শেষে নিজের নামও সই করে গেছেন সাহেব।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে এমনই সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে সবাই যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিলেন। সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করার মতো মনোবলও ছিল না কারো। যাই হোক, সে রাতের সেই অবাস্তব অভিজ্ঞতার সত্যাসত্য যাচাই করতে গিয়ে দেখা গেল টেগার্ট যখন পুলিশ কমিশনার তখন এই থানায় এই নামাঙ্কিত ব্যক্তি ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। পুরনো নথিপত্রের সইয়ের সঙ্গে সে রাতের সেই রহস্যময় মানুষটির সইয়ের হুবহু মিল পাওয়া গেল। শুধু তারিখেরই যা হেরফের হলো। এবং অনুসন্ধানে এও জানা গেল এই সাহেবটি তৎকালীন সময়ে স্বদেশীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

অজানা শক্তি

অদ্রীশ বর্ধন

www.arisumu.com

আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি। একেবারে পাগল হয়ে যাওয়ার আগে, অথবা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাওয়ার আগে, লিখে রেখে যেতে চাই আমি যা বুঝেছি, জেনেছি, দেখেছি।

ওরা আমার সামনেই বসে আছে। হুমড়ি খেয়ে দেখছে আমি কি লিখছি। কেউ উচ্চাঙ্গের হাসি হাসছে, কেউ বিদ্রূপের হাসি হাসছে। কিন্তু ওদের আর আমি পরোয়া করি না। আমার ভেতরে যে শক্তি জেগেছে, সেই শক্তিই আমাকে অকুতোভয় করে তুলেছে। এ শক্তির প্রকৃতি আমি আজও বুঝে উঠিনি। শুধু জানি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শক্তির সমুদ্র থেকে ধেয়ে আসছে এই শক্তি আমার ভেতরে। আমি যেন একটা আতসকাচ। রোদ্দুরের তেজ আতসকাচের মধ্যে দিয়ে সংহত হয়ে যেমন দাহিকা শক্তি অর্জন করে, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শক্তি সমুদ্রের এই তেজও যেন আমার মধ্যে দিয়ে, আমার কলমের মধ্যে দিয়ে পুঞ্জীভূত আকারে বেরিয়ে আসছে। অনেক চিন্তার পরে আজ আমি কলম ধরেছি আত্মকথা (গল্পকথা নয়) লিখে যাব বলে, তাই প্রচণ্ড শক্তি ফেটে পড়তে চাইছে আমার কলমের ডগায়। দেখতেই তো পাচ্ছি এই শক্তির মহিমা। প্রতিটি অক্ষর যেন কাগজ পুড়িয়ে দিচ্ছে। কাগজ ঝলসে যাচ্ছে। দাউ দাউ করে আগুন না লেগে যায় রুখে রেখে দিয়েছি আমারই শুভ শক্তি দিয়ে। এ শক্তির অসাধ্য কিছু নেই, শুভ, অশুভ—সবকিছুই করান যায় কল্পনাতীত এই শক্তি দিয়ে। তুচ্ছ বিজ্ঞান এই অনন্ত অফুরন্ত শক্তির কোন দিনই নাগাল পায়নি—পাবে বলেও মনে হয় না।

এই শক্তির জোরেই ওদের আমি দেখতে পাচ্ছি বাতাসের চাইতেও মিহি ওদের শরীর। তবুও আমি দেখতে পাচ্ছি। শুধু চোখে ওদের দেখা যায় না। তবুও ওদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। তখন ওদের আমরা বলি ভূত, প্রেত, কায়াহীন, অশরীরী। কিন্তু শক্তিমন্ত এই দুচোখ দিয়ে ওদের এখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অন্যের চোখে ওরা অদৃশ্য, কিন্তু আমার চোখে নয়। বিদেহী ওরা প্রত্যেকেই, তা সত্ত্বেও ওদের ইথার দিয়ে গড়া সত্তা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নানা রঙের দ্যুতি—কোনটা গাঢ়, অশুভ বলে কোনটা উজ্জ্বল, শুভ সত্তা এবং একমাত্র এরাই অভয় হাসি হাসছে আমার দিকে চেয়ে। যেন নীরবে বলতে চাইছে, ভয় নেই, ভয় নেই, সব সত্যি, সব সত্যি।

সত্যি তো বটেই। জাদুকর হ্যারি হুডিনি ১৯২৬ সালে মারা যাওয়ার আগে স্ত্রী বিয়েট্রিসকে একটা সাঙ্কেতিক শব্দ বলে গেছিলেন। হুডিনি ম্যাজিক দেখাতেন ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাস করতেন মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে। মৃত্যুর ঠিক দু বছর পরে ১৯২৮ সালে আমেরিকান

স্যার আর্থার ফোর্ড প্রেতচরে বসে পেয়ে গেছিল সেই শব্দ—তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিয়েছিল বিয়েট্রিসকে। সাত অক্ষরের ঐ একটি শব্দ দিয়েই হুডিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন—আছে, আছে, পরলোকের অস্তিত্ব আছে, মৃত্যুর পরেও জীবন আছে চড্রম্চড্রদ্দড্র—এই ছিল সেই শব্দ।

মৃত্যুর পর স্ত্রীকে বিশ্বাস করতে বলেছিলেন হুডিনি, আর আমি বিশ্বাস করেছি মৃত্যুর আগে। আছে, আছে, অনন্ত রহস্যে ভরা এই দুনিয়ায় কায়াহীনরা আছে বৈকি—তার চেয়েও বড় যা আছে তা এই শক্তি—যে শক্তি অজস্রধারায় ফেটে পড়তে চাইছে আমার মধ্যে। জানি না কতক্ষণ রুখে রেখে দেব তাকে। অথবা তাদেরকে। কেননা, অজস্র শক্তি সমাহার এই শক্তি। কাউকে আলাদা করে চেনাবার ক্ষমতা আমার নেই।

প্রথম যেদিন বিস্ময়কর এই শক্তির প্রভাব আমি টের পেয়েছিলাম, সেদিনও ছিল নিশুতি রাত্রি। অমাবস্যার তমাল কালো অন্ধকার ঘরের মধ্যেও চেপে বসেছিল। কারণ হাতে এমন পয়সা ছিল না যে মোমবাতি কিনি। ইলেকট্রিক বিলের টাকা দিতে না পারায় লাইন কেটে দিয়ে গেছিল অনেক আগেই। সম্পাদকের পায়ে ধরতে কেবল বাকি রেখেছি, কেউ আমার লেখা ছাপাননি। ব্যঙ্গের হাসি হেসেছেন। কেউ বলেছেন, আপনার নাম হোক, তারপর আসবেন। কেউ বলেছেন, লেখার ধার থাকলে তো ছাপব? কেউ বলেছেন, পকেটে রেস্ত কিছু আছে? থাকলে ছেড়ে যান—দেখব ছাপা যায় কিনা।

পকেটে পয়সা ছিল না বলেই পত্র-পত্রিকার অফিসগুলোয় হত্যে দিয়েছি দিনের পর দিন। লেখা ছাপানর মোহে শুধু নয়—পেটের জ্বালায় লিখতে পারা ছাড়া আর কোন বিদ্যে তো আমার জানা নেই। কিন্তু এমন সর্বনাশা বিদ্যে যে আর হয় না, সম্পাদকদের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম।

তারপর একদিন এক রদ্দিমার্কা কাগজের সম্পাদক তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে আমাকে বলেছিলেন, দেখুন মশায়, আপনার যা চেহারা আর লেখার যা ছিরি—ভূতের গল্প লিখুন। ভূতেরা নিশ্চয় কৃপা করবে আপনাকে। ভূতের গল্পের বাজার আছে। আপনার কপাল খুলে যেতেও পারে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেছিল টিটিকিরি শুনে। সম্পাদকরা দেমাকী হয়, সবজান্তা হয়, ধরাকে সরা জ্ঞান করে জানতাম—কিন্তু এত ছ্যাঁচড়া হয় জানতাম না। না খেয়ে রোদে জলে ঘুরে আমারও মাথার ঠিক ছিল না। ঘরে ফিরে এসেও অন্ধকারে বসে থাকতে পারিনি। ছিটকে বেরিয়ে পড়েছিলাম বাইরে। পাগলের মত হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছিলাম টালিগঞ্জে। আদি গঙ্গার ধারে শ্মশানের দিকে চেয়েছিলাম এপাড়ের জঙ্গলের মধ্যে বসে।

সেদিনও অমাবস্যা। জঙ্গলের ঘন অন্ধকারে একটুও গা ছমছম করেনি। একমনে ডেকে গেছিলাম অশরীরীদের। আবাহন করেছিলাম মনে প্রাণে, এস, এস, —যেখানেই থাক না কেন তোমরা—এস—কৃপা কর আমাকে—ভূতের গল্প লেখার প্রেরণা জুগিয়ে যাও। সম্পাদকটাকে যেন মুখের মত জবাব দিতে পারি।

কেউ সাড়া দেয়নি। কেউ কাঁধে হাত দেয়নি। কানে কানে কেউ ফিসফিস করে কথা বলেনি, অট্ট হেসে কেউ পিলে চমকে দেয়নি।

শুধু একটা আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। শ্মশানকালীর মন্দির থেকে কে যেন আমাকে চুম্বকের মত টানছে। মানুষের দেহেও চৌম্বক তরঙ্গ আছে শুনেছিলাম। হঠাৎ যেন প্রবলতর একটা চুম্বক আমার এই শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে মন্দিরের দিকে।

আদি গঙ্গা তো আসলে একটা খাল। অগভীর জল পেরিয়ে গেছিলাম মুহ্যমানের মত। বিগ্রহের সামনে জ্বলছিল শুধু একটা প্রদীপ। প্রদীপের সামনে কে যেন রেখে গেছিল একটা সস্তার ঝর্ণা কলম আর একটা বাঁধান খাতা। দেবীর কৃপা যাএগ করেই নিশ্চয়।

হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম কলম আর কাগজের ওপর। পাগলের মত লিখেছিলাম পাতার পর পাতা। আগে থেকে কিছুই ভাবিনি। কিন্তু লেখা হয়ে গেছিল একটা ভূতের গল্প।

শক্তির মহিমা টের পেয়েছিলাম পরের দিন। কসমিক ইচ্ছাতেই লেখা গল্পের অক্ষরে অক্ষরে জড়িয়ে গেছিল কসমিক শক্তি। সম্পাদকের সামনে খাতাখানা ফেলে

দিয়ে বলেছিলাম, পড়ে দেখুন। চলবে?

আগের দিনও যে লোকটা আমাকে নিকৃষ্ট জীব মনে করেছিলেন, সেদিন কিন্তু তিনি আমার তিন শব্দের কথাটি শুনে কেন জানি চমকে উঠেছিলেন। শক্তি ভর হয়েছিল আমার ওপর আগের রাত থেকেই—তখনও তা বুঝিনি। মন্ত্রশক্তির মতই কাজ করেছিল তিন শব্দের কথাটা। মন্ত্রশক্তি অথবা কসমিক শক্তি যে রয়েছে আমার লেখা গল্পের প্রতিটি শব্দে—তা বুঝলাম দশ মিনিট পরেই।

পড়া শেষ করেই মুখ তুলে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়েছিলেন সম্পাদক। বলেছিলেন তোতলাতে তোতলাতে—এ-এ-এ গল্প আপনার লেখা?

হ্যাঁ।—সংক্ষেপে বলেছিলাম আমি।

পনরো দিন পরেই ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে গেল গল্পটা। সম্পাদক লোক পাঠিয়ে ডাকিয়ে নিয়ে গেলেন আমাকে। এরকম গল্প আরও চাই। পাঠকমহল রোমাঞ্চিত হয়েছে, ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছে—বহুদিন এমন ভূতের গল্প নাকি বাংলা সাহিত্যে লেখা হয়নি।

নগদ টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। সস্তার ঝর্ণা কলমটা দিয়ে একটার পর একটা গল্প লিখে গেছি তারপর থেকে। প্রতিটা গল্পই মন্ত্রমুগ্ধ করেছে পাঠক-পাঠিকাদের। করবেই তো। এ তো নিছক গল্প নয়। শব্দব্রহ্ম সমাবেশ। প্রতিটা শব্দই মহাশক্তির মন্ত্র।

গল্পের পর গল্প লিখে এই মহাশক্তিকেই দিনের পর দিন আকর্ষণ করে গেছি আমার মধ্যে। দৈবাৎ যে যোগসূত্র রচিত হয়েছিল এক অমাবস্যার রাত্রে, তাকে

বিচ্ছিন্ন হতে দিইনি। দিনে দিনে তাই শক্তির আধার হয়ে উঠেছি। একটার পর একটা সুপারহিট গল্প বেরিয়েছে কলম দিয়ে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি এই মহাশক্তির উপযুক্ত আধার আমি নই। মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাকে অথবা যাদের নিরন্তর টেনে নিয়েছি নিজের মধ্যে নশ্বর এই দেহকে ফাটিয়ে তারা ফের বিলীন হতে চাইছে শক্তি সমুদ্রের মধ্যে।

ব্যাপারটা টের পেলাম একদিন রাত্রি বেলা। এক নিঃশ্বাসে ঝড়ের মত একটা গল্প শেষ করে কলম মুড়ে আলো নিভিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম অন্ধকারে রোশনাই ঠিকরে যাচ্ছে আমার লেখা প্রতিটি শব্দ থেকে। বর্ণালির সাতটা রঙের খেলা চলছে কাগজ জুড়ে। বিহ্বল হয়ে কাগজে হাত দিতে গিয়ে দেখেছিলাম ভলকে ভলকে রোশনাই ঠিকরে যাচ্ছে আমার আঙুলগুলোর ডগা থেকে। শিউরে উঠে সরে আসতেই সামনের আয়নায় দেখেছিলাম নিজের প্রতিবিম্ব। কিন্তু এ কে? এই কি আমি? এ যে একটা নরকরোটি। কঙ্কালের মুখ। হাড় ছাড়া কিছু নেই। চোখের জায়গায় কোটর। অগ্ন্যুৎপাতের মত সপ্তরশ্মি ছিটকে যাচ্ছে চক্ষুকোটর থেকে!

সভয়ে গালে হাত দিয়েছিলাম। চামড়া, মাংস সবই টের পেয়েছিলাম আঙুলের ছোঁয়ায়। তা সত্ত্বেও কিন্তু দেখেছিলাম আয়নায় প্রতিবিম্বতে একটা নরকঙ্কাল। লুঙ্গি আর গেঞ্জিপরা একটা বিকট কঙ্কাল। যার দুই চোখের গর্তে জ্বলছে আগুন।

তখনও বুঝিনি কসমিক শক্তিই দিব্য দৃষ্টি দান করেছে আমাকে। মহৎশক্তিকে নামের মোহে পয়সার ধান্দায় কাজে লাগিয়ে নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছি। পরিণতিটা দেখতে পেলাম তাই স্বচক্ষে।

বিহ্বলভাবে আয়নায় প্রতিফলিত আমার কঙ্কাল অবয়বের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম কতক্ষণ বলতে পারব না—আচমকা টের পেয়েছিলাম ওরা এসে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে। কাতারে কাতারে। অবয়বহীন আতঙ্কদের দেখে কিন্তু এতটকু শিহরিত হইনি। বরং ভেবেছিলাম এইটাই তো স্বাভাবিক। এতদিন যাদের নিয়ে চুটিয়ে লিখেছি এবার তারা এসে দাঁড়িয়েছে আমাকে দেখা দিতে। বুঝিনি, বুঝিনি, তখনও বুঝিনি আমিও দলে যোগ দিতে চলেছি। আয়নায় দেখেছি তারই পূর্বাভাস।

শুভ বিদেহীদেরও দেখেছিলাম ওদের মাথার ওপর দিয়ে। শান্ত অবলোকিত চাহনি মেলে যেন আমাকে নিবৃত্ত করতে চাইছে মহাশক্তির অপপ্রয়োগ থেকে। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। প্রচণ্ড মহাশক্তিকে মহত্তর কাজে লাগাতে চাইনি। লোভ আর মোহে অন্ধ হয়ে গেছিলাম।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাই প্রবলতর হয়েছে ওদের আকর্ষণ। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে মহাশক্তির প্রভাব। প্রতিটি গল্প ধিকিধিকি অঙ্গারের মতো দাগিয়ে গেছে পড়ুয়াদের চিত্ত।

আর অশান্ত হয়েছি আমি। অস্থির হয়েছে আমার অবয়ব। প্রতিটি দেহকোষ যেন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে চাইছে কসমিক শক্তির দাহিকাশক্তিতে। শতকোটি কোষের এই অনির্বাণ অসহ্য অবর্ণনীয় শক্তিমত্ততা আমি আর সইতে পারছি না। নগণ্য আধার আমি। আবাহন করেছিলাম অজান্তে মহাশক্তিকে। ভূতের গল্প লিখেছি, ভূতেদের দেখছি, দেখেছি নিজের ভূতকেও।

আর পারছি না। চৌচির হয়ে যাব মনে হচ্ছে। জানি না আগামীকাল মরলোকে থাকব কিনা। থাকলেও হয়ত অপ্রকৃতিস্থ হয়ে থাকব। যদি না থাকি হুঁশিয়ার করে দিয়ে যাই সমস্ত শিল্পী আর লেখক, ভাস্কর আর বক্তাদের—প্রতিটি ছবি, মূর্তি, লেখা আর কথার মধ্যে রয়েছে কসমিক শক্তি। সর্বসাধারণকে তাই মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারে প্রকৃত শক্তিধররা। কিন্তু সাবধান—এই শক্তির অপব্যবহার যেন কখনও না ঘটে।

পরের দিন সকালে বিখ্যাত ভূতের গল্প লেখক শচীন চৌধুরীর ঘরে পাওয়া গেল শুধু একরাশ ছাই। আর অক্ষর ঝলসান এই লেখাটা।

ভদ্রলোককে আর পাওয়া যায়নি।

www.arisumu.com

রাতদুপুরে অন্ধকারে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তারপর টের পেলাম সারা পাড়া জুড়ে লোডশেডিং। কারণ জানলা খোলা আছে, অথচ ঘরের ভেতর ঘুরঘুট্টে অন্ধকার আর ভ্যাপসা গরম।

কিন্তু শব্দটা অস্বস্তিকর এবং সেটা হচ্ছে আমার খাটেরই তলায়। সেখানে থাকার মধ্যে আছে কিছু পুরনো খবরের কাগজ। একটা স্যুটকেস। তার মধ্যে কেউ যেন নাড়াচাড়া করছে। সেই সঙ্গে অদ্ভুত ফোঁস ফোঁস শব্দ।

প্রথমে ভাবলাম সাপ নয় তো? পরে মনে হল, তিন তলার এই ঘরে সাপ কোথা থেকে আসবে? ধেড়ে ইঁদুর বা ছুঁচো হলেও হতে পারে। কিন্তু ওরা কি ফোঁস ফোঁস শব্দ করে? নড়াচড়াটাও যেন কোন ওজনদার প্রাণীর। প্রাণীটা সম্ভবত লম্বাটে গড়নের। নাঃ, কখনই বিড়াল নয়। অস্বস্তি বেড়েই গেল। টেবিলে একটা দেশলাই আছে। মোমবাতি আছে। হাত বাড়ালেই পেয়ে যাব। কিন্তু সাহস পাচ্ছি না। যদি চোর হয়? আজকাল চোরদের সঙ্গে ছোরা-ভোজালি-পিস্তল থাকে শুনেছি। একটা টর্চ আছে অবশ্য। কিন্তু সেটা বিগড়ে যাওয়ার সময় পায়নি, আজ সন্ধ্যা বেলাতেই বিগড়ে গেছে। খুব অসহায় বোধ করলাম। এদিকে নড়াচড়া আর শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো ফোঁস ফোঁস শব্দটা বেড়েই চলেছে।

কিছুক্ষণ পরে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। মরিয়া হয়ে করুণ স্বরে বলে উঠলাম, "দেখুন সার (কেন যে মুখ দিয়ে সার বেরিয়ে গেল কে জানে!), আমার খাটের তলায় সোনাদানা বা টাকাকড়ি কিছু নেই! টেবিলের ড্রয়ারে আমার মানি ব্যাগ আছে। তাতেও বেশি টাকাকড়ি নেই। তবে ওটা আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে চলে যেতে পারেন। আমার রিস্ট ওয়াচটা দাবি করলে সেটাও আপনার হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হব। কিন্তু দয়া করে আমাকে যেন মারবেন না সার!"

নড়াচড়া আর ফোঁস ফোঁস থেমে গিয়েছিল। আমার কথা শেষ হওয়ার পর খাটের তলা থেকে কেউ খ্যানখেনে গলায় বলল, "মলোচ্ছাই! এ যে দেখছি আমার চেয়েও ভীতু! এই একটুতেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে যেন। আবার আমাকে সার সার করা হচ্ছে! খবরদার! আমাকে সার বলবে না বলে দিচ্ছি!"

"আজ্ঞে, বলব না। কিন্তু রাত দুপুরে আপনি আমার খাটের তলায় কি করছেন? কে আপনি?"

"আমি যে-ই হই, তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কিসের? আমি একটা জিনিস খুঁজছি। পাচ্ছি না।"

"খাটের তলায় আপনার জিনিস আছে বুঝি?"

"থাকারই কথা। কিন্তু গেল কোথায়? তুমি ফেলে দিয়েছ নাকি?"

"কী জিনিস বলুন তো?"

"একটা ছোট্ট শিশি।"

"আজ্ঞে আমি তো তেমন কোনও শিশি দেখিনি!"

"তুমি কবে থেকে এই ঘর ভাড়া নিয়েছ?"

"প্রায় এক মাস হয়ে এল।"

"বুঝেছি। তাহলে হারাধনেরই কাজ। বাকিটুকু অন্য কাকেও খাইয়ে দিয়েছে। ব্যাটাচ্ছেলে মহা ধড়িবাজ।"

ক্রমে ক্রমে আমার সাহস বেড়ে যাচ্ছিল। তাই জিজ্ঞেস করলাম, "হারাধন কে বলুন তো?"

"হুঁ। তোমাকে তার পরিচয় দিই আর তুমি তাকে পুলিসে ধরিয়ে দাও। বাঃ! আমাকে অত বোকা ভেবো না হে ছোকরা!"

"আজ্ঞে, জাস্ট একটু কৌতূহল! তা ঠিক আছে। শিশিতে কি ছিল বলতে আপত্তি আছে?"

"নেই। শিশিটা পেয়ে গেলে তোমাকেই একটুখানি খাইয়ে দিতাম। আমার একজন সঙ্গীর দরকার বলেই তো ওটা খুঁজতে এসেছি। হারাধনকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আর কাকে সাপ্লাই করেছে।"

"প্লিজ দাদা! আপনার সঙ্গী হতে আপত্তি নেই। কিন্তু জিনিসটা কি, যা খেলে আপনার সঙ্গী হতে পারতাম?"

"বলব! আগে হারাধনটাকে জিজ্ঞেস করে আসি, আর একটু আধটু ওর কাছে আছে কি না।"

এই সময় আমার মাথার দিকে জানালার পাশ থেকে কেউ চাপা গলায় বলে উঠল, "কেষ্টদা আছে নাকি?"

খাটের তলার লোকটি খাপ্পা হয়ে বলল, "তুমি কে হে ছোকরা, আমাকে এখানে ডাকতে এসেছ?"

সাবধানে মাথা একটু ঘুরিয়ে দেখলাম, জানালার ওধারে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে বললে ভুল হবে, ভেসে আছে। কারণ এটা তিনতলার একটা ঘর। ওদিকে খাড়া দেয়াল নেমে গেছে। বুক ধড়াস করে উঠল।

ছায়ামূর্তিটা কেমন অদ্ভুত খি খি শব্দে হেসে বলল,

"আমি হারাধন কেষ্টদা!"

কেষ্টবাবু বললেন, "এই এক্ষুণি তোমার নাম করছিলাম। এস, কথা আছে।"

"কেষ্টদা! আমরা তোমাকে খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে শেষে এখানে এলাম। পানুবাবু বললেন, কেষ্টবাবু হয়তো শিশিটার খোঁজে গেছেন!"

"পানুবাবু কোথায়?"

"ওই চিলেকোঠার ছাদে বসে আছেন।"

"তাকে ডেকে আনো। তিনজনে বসে একটু আলোচনা করব।"

চোখের কোণা দিয়ে দেখলাম ছায়ামূর্তিটা উধাও হয়ে গেল। এবার ডাকলাম, "কেষ্টদা!"

"মলোচ্ছাই! আগেই কেষ্টদা বলে ডাকছ কেন হে? ডাকার কাজ করো, তবে তো কেষ্টদা বলে ডাকবে!"

"কী কাজ বলুন তো?"

"একটু ওয়েট করো। ওরা দুজনে আসুক। শিশিটার খোঁজখবর নিই। তবে না?"

"শিশির ভেতর যা আছে, তা খেলে পরেই আপনি আমার কেষ্টদা হয়ে যাবেন?"

"বাঃ! তোমার মাথা আছে হে ছোকরা।"

"কিন্তু শিশিটা যদি না পাওয়া যায়, তাহলে?"

"দেখ ভায়া, যদি সত্যি তুমি আমাদের দলে ভিড়তে চাও, শিশির দরকার অবশ্য হবে না। আরও কত উপায় আছে। তবে শিশির জিনিসটা বেস্ট। তুমি টেরও পাবে না কি ঘটে গেল!"

"সে কী দাদা! টেরও পাব না? কিন্তু ঘটবেটা কী?"

"চুপ! বকবক করো না। খাটের তলায় যা বিচ্ছিরি গরম!"

এই সময় মনে হল, এবার দেশলাই জেলে মোমবাতিটা ধরিয়ে ফেলি। লোডশেডিং দুঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টাও চলতে পারে। কিন্তু টেবিলের দিকে হাত বাড়াতে সাহস হল না।

একটু পরেই আমার মাথার দিকে জানালায় কেউ বলে উঠল, "কেষ্টবাবু! আছেন না কেটে পড়েছেন?"

কেষ্টবাবু সাড়া দিলেন, "আসুন পানুবাবু! কেটে পড়ার মতো অবস্থা হয়নি এখনও। হারাধন, চলে এস।"

পানুবাবু বললেন, "আরে! এখানে কে শুয়ে আছে দেখছি!"

"ওর ব্যাপারেই একটু আলোচনা আছে।"

খাটের তলায় ঢুকে আলোচনা চলে না। বেরিয়ে আসুন।"

"বিচ্ছিরি গরম লাগছে বটে, কিন্তু বেরুতে ইচ্ছে করছে না।"

"কেন?"

"কোথাও এমন নিরুপদ্রব জায়গা নেই মনে হচ্ছে। আজকাল সবখানেই লোকের ভিড়। আপনারা দুজনেও এখানে থাকতে পারেন। পুরনো জায়গায় পুরনো কথা মনে পড়ে আনন্দ পাওয়া যাবে।"

"ধুর মশাই! একজন জলজ্যান্ত লোক মাথার ওপর শুয়ে থাকবে। অস্বস্তি হবে না বুঝি?"

"মোটেও না পানুবাবু! এ ছোকরা খুব নিরীহ আর শান্ত। দেখছেন না কেমন চুপচাপ শুয়ে আছে!"

"জেগে নেই, তা-ই।"

"নাঃ। দিব্যি জেগে আছে।"

"সে কী! ও হারাধন! কেষ্টবাবু কী বলছেন শুনলে?"

হারাধন বলল, "কৈ দেখি, দেখি!"

খাটের তলা থেকে কেষ্টবাবু বললেন, "খামোকা ওকে ভয় পাইয়ে দিয়ো না। বরং ওকে আমাদের সঙ্গী করে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। পানুবাবু, আসুন এখানে। হারাধন, এস হে!"

পানুবাবু বললেন, "হারাধন যায় তো যাক। আমি যাচ্ছি না! খাটের ছোকরাকে বিশ্বাস করা যায় না। আজকাল ছেলে ছোকরাদের মতিগতি বোঝা কঠিন।"

হারাধন বলল, "ঠিক বলেছেন পানুবাবু!"

কেষ্টবাবু চটে গেলেন। "বেশ। আসতে হবে না কিন্তু শিশিটা কোথায় গেল?"

হারাধন বলল, "তুমি খাওয়ার পর যেটুকু ছিল, তার খানিকটা পানুবাবু খেয়েছিলেন। বাকিটুকু কী হল পানুবাবু বলুন।"

পানুবাবু বললেন, "আমি চায়ের কাপে একটুখানি মিশিয়ে দিয়ে শিশিটা ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। পরে দেখেছি, নর্দমার ধারে একটা বেড়াল দাঁত বার করে পড়ে আছে। বাকিটুকু সে-ই সাবাড় করেছিল।"

হারাধন বলে উঠল, "কেষ্টদা! ওই সেই বিড়ালটা!"

কেষ্টবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "বেড়ালটাকে ধরো হারাধন! আমি এই ছোকরার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখি, কী ভাবে একে দলে নেওয়া যায়।"

পানুবাবু বললেন, "অত আলাপ-আলোচনার কী আছে? ছোকরা যদি নিরীহ শান্ত হয়, ওকে বলুন না! ওই তো একটা সিলিং ফ্যান ঝুলছে। চাই শুধু একটা শক্ত দড়ি, ঘরেই পেয়ে যাবে। হ্যাঁ—আমার নাইলনের মজবুত দড়িটা এখনও আছে নিশ্চয়। বৃষ্টি বাদলের দিনে ঘরে ভিজে কাপড় শুকোতে দিতুম। অত ভালো দড়ি কি এই ছোকরা ফেলে দেবে?"

এতক্ষণে আর্তনাদ করে উঠলাম, "না না না! ওরে বাবা! আমি ফ্যান থেকে ঝুলতে পারব না!"

তারপরই বিদ্যুৎ এসে গেল। টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টিপে দিলাম। অমনি খাটের তলা থেকে আমার মাথার পেছন দিয়ে কালো লম্বাটে একটা ছায়ামূর্তি যেন পিছলে বেরিয়ে গেল। মাথার দিকে ঠাণ্ডা হিম বাতাসের ঝাপটানি টের পেলাম। এক লাফে উঠে গিয়ে ঘরের টিউবল্যাম্পও জ্বালিয়ে দিলাম।

সেইসময় চোখে পড়ল, একটা কালো বেড়াল পাশের দিকের জানলা থেকে সরে গেল। ওদিকে একটা আম গাছ আছে। আম গাছে কাকেরা বাসা করে। বেড়ালটাকে ওই গাছের গুঁড়ি বেয়ে একদিন উঠতে দেখেছিলাম না?

কিন্তু এতক্ষণে মনে হল, ব্যাপারটা বুঝে গেছি। তবে আগাগোড়া সবটাই নিছক দুঃস্বপ্ন কি না কে জানে! আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। এক গ্লাস জল খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করলাম। তারপর টেবিলল্যাম্পটা নামিয়ে খাটের তলা দেখে নিলাম। খবরের কাগজগুলো এবং স্যুটকেসটা যথাস্থানে আছে। তবে স্যুটকেসটা একটু যেন কাৎ হয়ে গেছে।...

কীভাবে সেই রাত্রিটা কাটিয়েছিলাম, সে আমিই জানি। পরদিন সকালে দোতলার ফ্ল্যাটে আমার পরিচিত রামবাবুকে গিয়ে ধরলাম। উনিই তেতলার ওয়ানরুম ফ্ল্যাটটা আমাকে পাইয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ির মালিক তাঁর বন্ধু।

আমার পিড়াপিড়িতে রামবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আজকাল ফ্ল্যাটটি খালি পড়ে থাকে। আসলে আপনার একটা মাথা গোঁজার জায়গা দরকার ছিল। তাই ওই ফ্ল্যাটটাই—"

বাধা দিয়ে বললাম, "কিন্তু আপনার একটু আভাস দেওয়া উচিত ছিল!"

রামবাবু হাসলেন। "আপনাকে যদি বলতাম ওই ফ্ল্যাটে হারাধনবাবু, তারপর পানুবাবু, শেষে কেষ্টবাবু পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন, আপনি কি ওখানে থাকতে রাজি হতেন? তবে দেখুন, ওরা আপনার কোনও ক্ষতি তো করেননি!"

"কী বলছেন! লোডশেডিং আর একটু চললে আমাকে ওরা সিলিংফ্যান থেকে ঝুলিয়ে ছাড়ত!"

রামবাবু জিভ কেটে বললেন, "না, না! আমি আছি কি করতে? আপনি ওদের কারও সাড়া পেলেই আমার নাম ধরে ডাকবেন। আমার নাম শুনেই ওরা পালিয়ে যাবে। কেন বুঝলেন তো? আমার নামে রাম শব্দটা আছে, রামনাম শুনলেই ওরা—বুঝলেন তো?"

বুঝলাম এবং সাহসও পেলাম যথেষ্ট। কিন্তু কথা হচ্ছে, খাটের তলায় শিশিটা পেয়ে গেলে ওরা আমাকে জোর করে খাওয়াতই। আর আমি—

বাপস! ভাবতেই হৃৎকম্প হচ্ছিল। ভাগ্যিস একটা কালো বেড়ালের ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা গেছে। তবে এখনই গিয়ে লাল রঙের নাইলনের দড়িটা পুড়িয়ে ফেলতেই হবে। কিছু না জেনে পরের জিনিস ব্যবহার করা আমার মোটেও উচিত হয়নি।...

দূরের সঙ্কেত

অনিন্দ্য বক্সী

গভীর খেদের সঙ্গে স্তবক বলে ওঠে, রমেশ, তুই চলে গেলে, আমাদের দুর্গাপুর স্পোর্টিং ক্লাব কানা হয়ে যাবে। স্তবকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দেবায়ন বলে, তুই ঠিক বলেছিস স্তবক। আমাদের চারজনের অক্লান্ত চেষ্টায় দুর্গাপুর স্পোর্টিং ক্লাব গড়ে উঠেছে। রমেশের মত গোলকিপার এই তল্লাটে আর একটাও নেই। এখন কে আমাদের গোল খাওয়া আটকাবে? একটা গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে আলোচনায় যোগ দেয় রমেশ। স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত তোর পক্ষে কি দুর্গাপুরে থাকা সম্ভব নয়?

চার বন্ধুতে মিলে দুর্গাপুরের খেলার মাঠে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছিল। সন্ধ্যের অন্ধকার তখন নামতে শুরু করেছে। মাঠের একটা নির্জন কোণে তারা ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না। দলের চতুর্থজন রমেশ জানা, এবার মুখ খুলল, ক্লিষ্ট কণ্ঠে রমেশ বলল, নারে. . . তা সম্ভব নয়। বাবা কলকাতায় বদলী হয়ে যাচ্ছেন। আমার পক্ষে আর দুর্গাপরে থাকা সম্ভব নয়। তোদেরকে বিশেষ করে দুর্গাপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে ছেড়ে যেতে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। তবু উপায় নেই, যেতেই হবে। তবে তোদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রেখে চলব। বড় খেলা থাকলে, আমি ঠিক দুর্গাপুরে এসে হাজির হব।

অতি কষ্টে ঢোক গিলে অর্নব টিপ্পনী কাটে, দেখ. . . আমাদের চারজনের মধ্যে স্তবক হচ্ছে স্ট্রাইকার; দেবায়ন হচ্ছে লিঙ্কম্যান; আমি হচ্ছি ফুল ব্যাক; আর রমেশ গোলি। অর্নবকে বাধা দিয়ে দেবায়ন বলে ওঠে, তার মানে পুরো টিমের একটা লাইন হচ্ছে, আমরা এই চারজন। স্তবক সঙ্গে সঙ্গে যোগ দেয় লাইনের একটা বিন্দু ছিটকে যাওয়া মানে পুরো টিমটা দুর্বল হয়ে পড়া।

তোরা অতশত ভাবিস না, সামনের বোকারো শীল্ডের ফাইনালে, জান দিয়ে লড়ে যা। দুর্গাপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে এবারকার শীল্ড চ্যাম্পিয়ন হতেই হবে।

চার বন্ধুর প্রত্যেকেই দুর্গাপুরে থাকে। স্থানীয় এক ইংরাজী-মাধ্যম স্কুলে ক্লাস টেনে সবাই পড়ে। চারজন শুধু অভিন্নহৃদয় সহপাঠী নয়; খেলাধূলায় তাদের সবাই পারদর্শী। তাদের সমবেত চেষ্টায় দুর্গাপুর স্পোর্টিং ক্লাব ফুটবলে অদ্বিতীয়, স্থানীয় লীগ ও শীল্ড বিজয়ী। চার বন্ধুর সকলের অভিভাবকই দুর্গাপুর স্টীল প্লান্টে কাজ করেন।

ভবানীপুরে নিজের বাড়িতে বসে রমেশ ভাবছিল আগামী শনিবার বোকারো শীল্ডের ফাইনাল দুর্গাপুরের মাঠে হবে। বোকারো ইলেভেন ফাইনালে উঠেছে। তারাও শক্তিশালী দল। রমেশ কলকাতায় চলে এলেও শীল্ডের ফাইনাল খেলতে তাকে দুর্গাপুরে যেতে হবে। কাল সকালে উঠেই ব্ল্যাকডায়মন্ড ধরতে হবে। ফাইনাল খেলা অমীমাংসিত থাকলে, তাকে দুর্গাপুরে দু-চারদিন থাকতে

হবে। রমেশ তাড়াহুড়ো করে জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে রাত দশটা বাজল। খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণের ঘরটাতে রমেশ একলাই শুতো। দরজাটা ক্যাঁচ করে শব্দ হতেই রমেশ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। ভেজানো দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারে। না, কোথাও কেউ নেই। দরজাটায় ছিটকিনি লাগিয়ে রমেশ আবার স্যুটকেশ গোছাতে থাকে। ঘড়িতে ভোর চারটে অ্যালার্ম দেওয়া আছে। এবার শুয়ে পড়তে হবে।

হঠাৎ কে যেন রমেশ বলে ডেকে ওঠে। স্যুটকেশের ডালাটা বন্ধ করে, রমেশ অবাক হয়ে যায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে, আরে স্তবক, তুই কখন এলি? কালকেই তো বোকারো শীল্ডের ফাইনাল খেলা। ভোরবেলায় হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরব বলে স্যুটকেশ গোছালাম। ফিক করে স্তবক সুন্দর ভট্টাচার্য হাসল। রমেশের মনে হল, বড় ম্লান বড় বিষণ্ণ সে হাসি।

কালকে দুর্গাপুরে শীল্ড ফাইনাল খেলা হবে না। তোর আর তাড়াহুড়ো করে সকালের ট্রেন ধরবার দরকার নেই। সে কথা জানাবার জন্যেই ছুটে এলাম।

রমেশ যেন আকাশ থেকে পড়ল। সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল, কি বলছিস তুই? হঠাৎ এভাবে ফাইনাল খেলা বাতিল হয়ে যাবে কেন? রমেশ. . . . কার সঙ্গে এত রাত্রে কথা বলছিস? বাইরে থেকে রমেশের দাদু হেঁকে ওঠেন। এতক্ষণে রমেশের সম্বিত ফেরে। যাই দাদু, বলে সে দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে।

বাইরে বেরিয়ে রমেশ তার দাদুকে সব কথা বলে, কি যা তা বলছিস? সদর দরজা বন্ধ; দরজার কলিং বেল বাজল না। অথচ তোর বন্ধু দুর্গাপুর থেকে কি হাওয়া হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল? আরে তাই তো! এতক্ষণে রমেশের হুঁশ ফেরে। সত্যিই তো . . . ঘরের ছিটকিনি তো বন্ধ ছিল, স্তবক ঘরের ভেতর ঢুকলো কি করে? দাদুকে নিয়ে রমেশ আবার তার ঘরের মধ্যে ঢোকে। আশ্চর্য! কোথাও কেউ নেই। রমেশের দাদু হেসে বলেন, খেলা. . . .খেলা করে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিস।

অতি কষ্টে বিস্ময় দমন করে রমেশ দুর্গাপুরে স্ট্রেট ট্রাঙ্ক ডায়াল করে। দেবায়নের বাবা বড় ডাক্তার। রাত্রে প্রায়ই ফোন আসে। তাই ফোনে দেবায়নকে পাওয়া গেল। কে রমেশ? তুই ফোন করে ভাল করেছিস। তুই না করলে, আমি তোকে ফোন করতাম। ফাইনাল খেলাটা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে পিছিয়ে গেছে। দেবায়নের কথা শুনে বিস্মিত রমেশ বলে ওঠে, আরে!. . . . সে কথাই তো স্তবক এইমাত্র জানিয়ে গেল।

স্তবক!! কি বলছিস তুই? হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। দেবায়নের কথার জবাবে, রমেশ পূর্বাপর ঘটনা বিবৃত করে। রমেশের কথা শুনে দেবায়ন স্তম্ভিত হয়ে যায়। করুণ কণ্ঠে বলে, স্তবক বড় ভাল ছেলে ছিল রে। তোর যাতে হয়রানি না হয়, তাই নিজে দেখা দিয়ে তোকে সব জানিয়ে গেল। স্তবক? অবাক হয়ে রমেশ প্রশ্ন ছোঁড়ে, স্তবক ছিল. . . .দেখা দিল; তোর এসব কথার মানে বুঝছি না। হেঁয়ালি ছেঁড়ে দিয়ে, স্পষ্ট করে বল, কেন শীল্ডের ফাইনাল খেলা হবে না?

ওপার থেকে দেবায়নের কান্না ভেজা গলা শোনা যায়। আজ সন্ধ্যে ছটার সময় হাইওয়ে পেরোতে গিয়ে, গাড়ি চাপা পড়ে স্তবক মারা গেছে । তাঁকে দাহ করে, শ্মশান থেকে এই সবে ফিরছি। রমেশ ফোনটা কেটে দেয়।

ভূত ধরার গল্প

নিরূপ মিত্র

www.arisumu.com

রাত দু'টোর ঘণ্টা বাজলো পুলিশ লাইনে। অনেক দূরের আওয়াজ. . .কিন্তু নিঝঝুম রাত্তিরে যখন কোথাও কোনো শব্দ নেই, দুরের ঘণ্টাও মনে হয় পাশেই যেন বাজলো কোথাও। সেই শব্দেই ঘুম ভেঙ্গে গেল ভবানীভূষণের।

এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। পুলিশ লাইনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘণ্টা পেটানো হয়। য'টা বাজলো ততবার ঘণ্টা বাজে। এগারোটায় এগারোবার, বারোটায় বারোবার। একটায় একবার মাত্র। . . .কিন্তু সে সব আওয়াজ ভবানীভূষণের কানে ঢোকে না, বা ঢুকলেও ঘুম চটিয়ে দেয় না। ভবানীভূষণ রাত দশটায় শুয়ে পড়েন নিয়ম করে। চমৎকার ঘুমোন দু'টো পর্যন্ত। কিন্তু যে-ই রাত দু'টোর ঘণ্টা বাজে পুলিশ লাইনে—আশ্চর্য—ভবানীভূষণের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ভাঙ্গবেই। রোজই। যেন কেউ তাঁকে জাগিয়ে দেয়।

আর তারপরেই শুনতে পান সেই শব্দটা—কেউ যেন পা ঘষে ঘষে তাঁর মাথার কাছের জানালাটার দিকে এগিয়ে আসছে।

ভবানীভূষণ যে মেস বাড়িটায় থাকেন সে বাড়িটা লম্বা বারান্দাওলা একটি ব্যারাকের মত। বারান্দার ওপর পাশাপাশি ছ'টা ঘর। ছ'জন অধ্যাপক ছ'টি ঘরের বাসিন্দা। ছয় অধ্যাপকের মেস—কলেজের ছেলেরা এ নামই দিয়েছে। অবশ্য বাসিন্দারা নিজেরা বলে—'নিঝুম নিবাস'।

নিঝুম নিবাসই বটে। মফঃস্বল শহরটির উত্তর প্রান্তে পায়রাটুংগি খাল। খালের ওপর দিয়ে কাঠের ব্রিজ। ব্রিজ পেরিয়ে ডিস্ট্রিকট বোর্ডের রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলে ইনস্‌পেকশন বাংলো। চারদিকে ধান খেত বাঁশ ঝাড় আর পুকুরের ছড়াছড়ি। বাংলোটা বেশির ভাগ খালিই পড়ে থাকে।

রাস্তার যে ধারে ইনস্‌পেকশন বাংলো, তার উল্টো দিকে পায়ে চলা রাস্তা নেমে এগোতে এ পাশ ও পাশ পুকুর। কিছুটা এগিয়ে বাঁশ ঝাড়ের এক জঙ্গল। জঙ্গল পেরোলে একটুকরো চষা জমি। জমিটার ধার ঘেঁসে লম্বালম্বি ব্যারাক বাড়িটা—যার নাম নিঝুম নিবাস। নিঝুম নিবাসের সামনেই আর একটা বড়োসড়ো পুকুর। পুকুর-এর ধারে বাবলা গাছের ভিড়। সে ভিড়ের ফাঁক ফোকর দিয়ে দেখা যায় বিস্তীর্ণ মাঠ, তার ওপারে অস্পষ্ট রূপনারায়ণ নদী।

ঠিক রাত দু'টোয় ব্যারাক বাড়ির দ্বিতীয় ঘরে ভবানীভূষণ শুনতে পান পা ঘসটে ঘসটে বারান্দা ধরে কে যেন তাঁর ঘরের মাথার কাছের জানালার দিকে এগিয়ে আসছে।

প্রথম দিকে ভবানীভূষণ ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথা

ঘামাননি। ভেবেছিলেন ছয় অধ্যাপকের কোনো একজন হয়ত বাথরুমের প্রয়োজনে. . .

. . .কিন্তু এক পূর্ণিমার রাত্তিরে শব্দটা যখন তাঁর মাথার জানালার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ভবানীভূষণ মাথা তুলে দেখতে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না।

বিস্মিত হলেন ভবানীভূষণ। মাথার কাছের জানালা তাঁর শোবার খাটের প্রান্ত থেকে মাত্র হাত তিনেক দূরে। জানালার ওপার দিয়ে কেউ হেঁটে গেল;—অথচ তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না! এটা কি করে হয়?

ভবানীভূষণ যাচাই করে দেখবার জন্যে উঠে বসলেন। তিনি উঠে বসতেই পা ঘসটে হাঁটার শব্দটা থেমে গেল। ভবানীভূষণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার যেই শুতে যাচ্ছেন, শব্দটা আবার শুরু হলো। এবার মনে হলো লোকটি জানালার দিকেই ফিরে আসছে। ভবানীভূষণ তাড়াতাড়ি উঠে বসে জানালার দিকে চেয়ে রইলেন। পা ঘসটে ঘসটে হাঁটার শব্দ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানালা পেরিয়ে চলে গেল। অথচ এবারেও কাউকে দেখতে পেলেন না ভবানীভূষণ।

হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা ভয় ভবানীভূষণের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যেতে লাগলো। ভবানীভূষণ শুয়ে পড়ে গায়ের চাদরটা মাথা পর্যন্ত টেনে নিলেন। ঘসটে হাঁটার শব্দ কিছুক্ষণ ধরে পায়চারি করতে লাগল।

ভবানীভূষণ কাঠের মত অনড় হয়ে শুয়ে রইলেন। তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো। নিজেকে প্রাণপণে বোঝাতে চাইলেন একজন অর্থনীতির অধ্যাপকের এ ভাবে ভয় পাওয়া মোটেই ঠিক হচ্ছে না। . . .অথচ ভয়টা তাঁকে পেয়ে বসল। এবং তিনি ভয় পেয়েছেন এটা বুঝেই পায়ের শব্দ তাঁর মাথার জানালায় এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

ভবানীভূষণ বুঝতে পারলেন, তিনি জ্ঞান হারাচ্ছেন। প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। হঠাৎ পায়ের শব্দ জানালা থেকে দূরে সরে গেল। মনে হলো একজন বারান্দা ছেড়ে মাটিতে নামলো। তারপর পুকুরের ধারে নেমে গেল। পুকুরের জলে ঘষে ঘষে হাত ধোয়ার শব্দ হতে লাগলো।

ভবানীভূষণ অবসন্ন বোধ করতে করতে একসময়ে কখন ঘুমিয়ে পড়লেন নিজেই মনে করতে পারলেন না।

ঘুম ভাঙ্গলো বেশ বেলায়। ঘরের দরোজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন কান্তিপ্রসন্ন, অজিত বোস, সুখেন্দু চক্রবর্তী, অনিরুদ্ধ চৌধুরী সবাই চা হাতে আড্ডায় বসেছে।

কান্তিপ্রসন্নই প্রথম চেঁচিয়ে উঠলেন—কি ব্যাপার ভবানীবাবু? কাল রাতে ঘুম হয়নি নাকি? এত বেলা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন?

অজিত বোস বললেন—আমার মনে হয় ভবানীভূষণ কাল সুর্মা পরে শুয়েছিলেন।

সুখেন্দু চক্রবর্তী জিগ্যেস করলেন—তাতে কি হলো?

অজিত বোস বললেন—বুঝলেন না? চোখে সুর্মা দিলে লোকে টেকনিকালার স্বপ্ন দেখে। তাই ঘুম ভাঙ্গতে মায়া হয়।

অনিরুদ্ধ চৌধুরী তাঁর নেয়াপাতি ভুঁড়ি নাচিয়ে বেজায় হাসতে শুরু করে দিলেন।

ভবানীভূষণ কাউকে কিছু না বলে রান্না ঘরে গেলেন—কেষ্টর কাছে চায়ের দরবার করতে। গিয়ে দেখেন দীপেন ঘোষ উন্মনা হয়ে বসে আছেন একটি মোড়ার উপর। কেষ্ট আপ্যায়ন করল—বা-আ-বু চা-আ দি-ই।

কেষ্টবরণ একটু তোতলা। ভবানীভূষণ আরেকটা মোড়া টেনে দীপেনদার পাশে বসলেন। সংকোচের সঙ্গে শুধোলেন—আচ্ছা দীপেনদা, কাল রাতে—

কথা শেষ করার আগেই দীপেনদা চোখ বড় বড় করে বললেন—আপনিও শুনেছেন—তাই না?

দীপেনদা বললেন—শুনেছি বৈকি। কে যেন হাঁটছে—যাচ্ছে—আবার ফিরছে। তাই তো?

ভবানীভূষণ উত্তেজিত হয়ে বললেন—ঠিক তাই। জানেন আমি তাকিয়ে দেখেছি—শব্দ চলে গেল কিন্তু কোনো লোক নেই!

দীপেনদা প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—আপনিও কাউকে দেখতে পাননি তাহলে?

ভবানীভূষণ উত্তেজিত সুরে বললেন—পাইনি। কিন্তু লোকটা আমার জানালার পাশ দিয়ে বারবার গেল, এলো . . .এক সময় স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

দীপেনদা গলা চালিয়ে গেলেন। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন কি? পায়ের শব্দে শুধু প্রথম তিন ঘরের সামনে

ঘোরাঘুরি করছিল? আমার ঘর পেরিয়ে আর বাকিদের ঘরের দিকে যায়নি!

ভবানীভূষণ বললেন—আমারও তাই মনে হয়েছে। কি ব্যাপার বলুন তো? ভূত?

দীপেনদা মার্ক্সের ভক্ত। বস্তুবাদীতত্ত্বে বিশ্বাসী। এক কথায় ভূত মানতে রাজী হলেন না। বললেন—আমার সন্দেহ এটি প্রভুজীবন-এর কাণ্ড। শুনেছেন বোধহয় ওর মাথা একেবারে বিগড়ে গেছে। রাত বিরেতে বনে বাদাড়ে একা একা ঘুরে বেড়ায়। হয়তো ইদানীং অন্য জায়গায় তাড়া খেয়ে আমাদের এই নিরিবিলি 'নিঝুম নিবাসে' নৈশ ভ্রমণ করে যায়।

ভবানীভূষণ এই সংবাদে আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভূত বরং ভালো, নিজের মনে থাকে, কারোর ক্ষতি করে না। ভয় না পেলেই হলো। কিন্তু পাগল-এর ঠিক কি? যদি খোলা জানালা দিয়ে. . .।

দীপেনদা বললেন—কথাটা আমাকেও ভাবাচ্ছে। আসুন এক কাজ করা যাক। আজ রাতেও চাঁদ থাকবে—জোরালো চাঁদ। আমরা দুজনেই জেগে থাকব। যেই শব্দটা শুরু হবে আমি দু'বার হাততালি দেব। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে একসঙ্গে দরোজা খুলে, বুঝলেন তো?

প্রস্তাবটা ভবানীভূষণেরও খুব পছন্দ হলো।

ঠিক রাত দশটায় শুয়ে পড়লেন ভবানীভূষণ। জেগে থাকবেন—কিছুতেই ঘুমোবেন না—ইত্যাদি ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও অভ্যাস ছাড়তে পারলেন না। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লেন কে জানে—যথারীতি এগারো, বারো এবং একটার ঘণ্টা তিনি শুনতে পেলেন না। অথচ ঢং ঢং করে দু'টোর ঘণ্টা পড়তেই ভবানীভূষণের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ঘুম ভাঙ্গার পর কিছুক্ষণ একটা আচ্ছন্নতা ভবানীভূষণকে জড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় তীব্রভাবে সজাগ হয়ে উঠল—ভবানীভূষণ শুনতে পেলেন কে একজন পা ঘসটে ঘসটে এগিয়ে আসছে।

পায়ের শব্দ কান্তিপ্রসন্নর এক নম্বর ঘরের দিক থেকে এসে দু নম্বরের ভবানীভূষণের ঘর ছাড়িয়ে তিন নম্বরে দীপেনদার ঘরের সামনে গিয়ে থামল। আবার তিন নম্বর থেকে দু'নম্বর ঘরের দিকে রওনা হতেই ভবানীভূষণ

উঠে বসলেন। ভবানীভূষণ জানতেন এবারে দীপেনদা দুবার হাততালি দেবেন।

কিন্তু হাততালি পড়ল না। পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। ভবানীভূষণ এমন ভাবে বিছানার ওপর বসে আছেন যে আগন্তুকের সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হতে বাধ্য।

পায়ের শব্দ ফিরে এসে ভবানীভূষণের জানালায় ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। ভবানীভূষণ চেষ্টা করেও চোখ বন্ধ করতে পারলেন না. . .ঘরের বাইরে দালান জুড়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্না অথচ ভবানীভূষণ কাউকে দেখতে পেলেন না।

ভবানীভূষণ দীপেনদাকে ডাকার চেষ্টা করলেন। একটা ভাঙ্গা গোঙানির আওয়াজ বেরোল। ভবানীভূষণের সারা শরীরটা কাঁপতে কাঁপতে শয্যা নেবার উপক্রম করার মুহূর্তে ভবানীভূষণের মনে হলো তিনি দু'বার হাততালির শব্দ পেলেন।

তিনি একা নেই, আরো একজন জেগে আছে মনে হতেই ভবানীভূষণ গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। তাঁর শিথিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এক মুহূর্তে টানটান হয়ে গেল। এক লাফে খাট থেকে নামলেন। দ্বিতীয় লাফে দরোজার অর্গল খুলে বারান্দায় ঝাঁপ দিলেন।

কিন্তু বারান্দায় নেমেই দেখলেন তিনি একা। দীপেনদার ঘরের দরোজা খোলেনি। হা-হা করছে বারান্দায় চাঁদের উজ্জ্বল আলো। কেউ কোথাও নেই।

ভবানীভূষণের শরীর বেয়ে ছমছমে শীতলতা নামল। ভবানীভূষণ পায়ের জোর হারিয়ে বারান্দাতেই বসে পড়লেন। আর তখনই অনুভব করলেন পায়ের ঘসটানির শব্দ তাঁর পিঠের দিক থেকে এগিয়ে আসছে।

একেবারে স্থাণু হয়ে গেলেন ভবানীভূষণ। তাঁর চেতনা লুপ্ত হবার মত অবস্থা হলো। আর তখনই চটাপট দু'বার হাততালি দিয়ে ধড়মড় করে দরোজা খুলে বাইরে এলেন দীপেনদা।

ভবানীভূষণ বাক্‌শক্তি হারিয়েছিলেন, নড়াচড়ার শক্তিও। পদশব্দ কিন্তু থামলো না। হাঁটতে হাঁটতে কান্তিপ্রসন্নর ঘরের দিকে চলে গেল। তারপরেই পুকুরের জলে কচ্‌লে কচ্‌লে হাত ধোয়ার শব্দ।

হঠাৎ দীপেনদা জোরে হেসে উঠলেন। কথা বলার শক্তি থাকলে ভবানীভূষণ হাসির কারণটা জানতে চাইতেন নিশ্চয়। . . .দীপেনদা ঘরের থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই নিয়ে এলেন। দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসলেন। ফস্ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিলেন। তারপর বললেন—ভূত তাড়াতে হলে বারান্দার কাঠের থামগুলোয় আলকাতরা লাগাতে হবে।

ভবানীভূষণ বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল চোখে দীপেনদার দিকে চাইলেন। দীপেনদা হেসে বললেন—ভূত তো ধরা পড়ে গেল ভবানীবাবু!

ভবানীভূষণ ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—ধরা পড়ল?

দীপেনদা জোর গলায় বললেন—ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি?

ভবানীভূষণ নেতিবাচক ঘাড় নাড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পা ঘসটে চলার শব্দ জেগে উঠল একেবারে ভবানীভূষণের ঠিক পেছনে। ভবানীবাবু চমকে মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন। শব্দ চলতে লাগলো। এবারে ভবানীভূষণেরও স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল মুখে। আপনমনে বললেন—ঘুণ পোকা!

দীপেনদা বললেন—একস্যাক্‌টলি! বারান্দার এই দিককার তিনটে খাম্বায় ঘুণ ধরেছে। পর্যায়ক্রমে এক একটা খাম্বা থেকে পোকা কাটার আওয়াজ ওঠে—আমরা ভাবি কেউ বুঝি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।

ভবানীভূষণ শুধোলেন—আর ওই জলে হাত ধোবার শব্দটা?

দীপেনদা বললেন—শুনুন, এখনো হচ্ছে। ওই দেখুন পুকুরের জলে মাছেরা এক পাল একসঙ্গে ঘাই মারছে—এ তারই শব্দ।

অসম্ভব নিশ্চিন্ত হয়ে ভবানীভূষণ হাত বাড়ালেন—দীপেনদা, একটা সিগারেট দিন তো।

যে কাহিনী কাউকে বলা হয়নি

প্রণবেশ চক্রবর্তী

থানা থেকে কোয়ার্টারে ফিরেই নিতাই দারোগা ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে বিছানার উপর এলিয়ে পড়লেন, তাঁর কোয়ার্টারে সেদিন তেমন আর কেউই নেই—বাস্তব অর্থেই তিনি একা। তাঁর স্ত্রী শিশুপুত্রটিকে নিয়ে সেদিনই সকালে তিনদিনের জন্য বাপের বাড়িতে গেছেন। থাকার মধ্যে আছে সর্বক্ষণের সঙ্গী খগেন। খগেনই রান্না করে, আবার খগেনই ঘরের সব কাজকর্মও করে। আজ অন্যদিনের চাইতে থানা থেকে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন রাত প্রায় নটা হবে।

দারোগার বেশভূষা ত্যাগ না করেই তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ডাক দিলেন, 'খগেন—ও খগেন, একটু চা তৈরি করে দে তো।'

তারপর নিজের মনেই ভাবতে থাকেন পরপর সারাদিনের ঘটনাগুলি। প্রকৃতপক্ষে এমন বিপদে তিনি এর আগে আর কখনও পড়েননি। দেখতে দেখতে তাঁর দারোগাগিরির রজতজয়ন্তী বর্ষ মানে পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে। এই পঁচিশ বছরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের ছটি থানায় কাজ করেছেন—একেবারে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ। কিন্তু শেষপর্যন্ত বনজঙ্গলে ঢাকা এই জয়পুর থানায় এসেই পড়েছেন মহাবিপদে।

এই পঁচিশ বছরের দারোগাগিরিতে কত চোর ডাকাতকে তিনি পিটিয়ে শায়েস্তা করেছেন, কত হিংস্র খুনীকে জেলে ঢুকিয়েছেন, সে-সব কাহিনী যদি ঠিকমত লেখা হত, তাহলে অনায়াসেই নতুন একটা মহাভারত তৈরি হয়ে যেতে পারত। এ-সব ভাবতে ভাবতে তাঁর বুকের পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে এল একটা বড় মাপের দীর্ঘশ্বাস। এই জয়পুরে এসেই তাঁর চাকরিটা বুঝি যায়। সকাল থেকে এই রাত পর্যন্ত হাজার চেষ্টা করেও আসল রহস্যের কোন প্রকার জটই তিনি খুলতে পারেননি, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জটগুলি যেন আরও পাকিয়ে গেছে। নিতাই দারোগা আর ভাবতে পারছিলেন না, বিছানায় শুয়েই পড়লেন।

ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করেই বলি তাহলে। সেদিন সাতসকালেই থানায় একটা ফোন এল। নিতাই দারোগাই —ও হ্যাঁ, ভুল হয়ে গেছে। নিতাই দারোগার পরিচয়টাই এতক্ষণ দেওয়া হয়নি। তাঁর পিতৃদত্ত পুরো নাম নিতাই চন্দ্র বটব্যাল। কেউ কেউ তাঁর সযত্নে পালিত চেহারার দিকে তাকিয়ে কখনও কখনও তাঁকে ব্যাটবল বলেও ডাকে। অবশ্যই সামনে নয়। কারণ, তাঁকে সবাই যমের মত ভয় করে। তাঁর আদি বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। কথাবার্তায় সেই ঐতিহ্য দিব্যি বজায় আছে। পুলিশের চাকরি মানেই বদলির চাকরি। আর ঝামেলার চাকরি। তাই খালি এ থানা থেকে ওই থানায় ছুটেছেন, এপারে এখনও কোন বাড়িঘর তৈরি করা হয়নি। নাম নিতাই

হলে কি হবে, গায়ের রংটা আবলুশ কাঠের মত কালো, তাঁর উপর জোড়া ভুরু এবং মাথায় টাক—উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। তিনি যখন হাঁটেন, তখন তাঁর ভুঁড়িটি যায় আগে আগে। একবার কোন থানায় বা পথে ঘাটে দেখলেই নিতাই দারোগাকে বিলক্ষণ চিনে নিতে পারবেন।

যাক তাঁর চেহারার কথা। যে কথা বলছিলাম তাই বলি। সেদিন সাতসকালেই থানায় একটা ফোন এল। ফোনটা ধরলেন নিতাই দারোগা নিজেই। তাঁর গলা থেকে যখন "হ্যালো" শব্দটা নির্গত হয়, তখন সেটাকে বাঘের ডাক মনে করে শিশুরাও ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। এবারও ফোনটা তুলে কানে চেপেই ব্যাঘ্র-গর্জনের মতই "হালুম" না বলে তিনি "হ্যালো" বলেছিলেন।

কিন্তু তারপরই টেলিফোনের ওপার থেকে ভেসে আসা একটা চাপা কণ্ঠস্বরের ফিসফিসানি কথায় যা শুনলেন, তাতে তাঁর মুখ দিয়ে আর আওয়াজ বেরুল না। একেবারে দমবন্ধ অবস্থা তাঁর। তিনি নিজে আর ফিসফিস করতেও পারছিলেন না।

টেলিফোনটা দড়াম করে রেখে তিনি বেশ কিছুক্ষণ পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। সকাল বেলা এ আবার কী ফ্যাসাদ। টেলিফোনের ওপার থেকে ভেসে আসা ওই কি ফিসফিসানি পুরুষকণ্ঠ বলল, জয়পুর রাজবাড়ির ছোটকুমারের স্ত্রী অর্থাৎ ছোট বৌমাকে কাল রাত্রে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। তারপর সেই মহিলার লাশটা গুম করে দেওয়া হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর খবরটা দিয়েই সেই টেলিফোনের সংবাদদাতা কথা না বাড়িয়ে টেলিফোনটা ছেড়ে দিল।

সে তো ছেড়ে দিল টেলিফোনটা, কিন্তু এখন নিতাই দারোগা কি করবেন? যদিও জয়পুর রাজবাড়ির নামডাক থাকলেও সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি আর নেই—কিন্তু তবুও সবকিছু ভালোভাবে না জেনে সেই তিন মহলা বাড়িতে এই খুনের তদন্ত করতে গেলে অনেক ঝামেলা হতে পারে। হয়ত গোটা ব্যাপারটাকেই এলোমেলো করে দেওয়ার জন্য একটা রাজনীতির রঙও দেওয়া হতে পারে। তাই নিতাই দারোগা ভাবতে বসেন ঃ এখন কি করবেন?

তিনি শেষ পর্যন্ত দারোগা হরেকেষ্ট তলাপাত্রকে ডেকে আনলেন, পরামর্শ করার জন্য। হরেকেষ্ট ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের কথাবার্তা বলেই সরে পড়লেন। যত জ্বালা নিতাই দারোগার। জয়পুর রাজবাড়ির নাম শুনলে আর কেউ এগোতে চান না।

জ্বালা কি কম! মনে মনে ভাবেন, আগে এ-সব জানলে দারোগাগিরি ছেড়ে মুটেগিরি করতাম। তাতে টাকা না পাওয়া গেলেও শান্তি পাওয়া যেত। সবকিছু সঠিকভাবে না জেনে এখন এরকম একটা উড়ো খবরের ভিত্তিতে জয়পুর রাজবাড়িতে তদন্ত করতে যাওয়া খুবই ঝুঁকির ব্যাপার এবং ঝামেলার কাজ। সত্যি যদি ছোট বৌ খুন না হয়ে থাকেন, তাহলে জয়পুরের জমিদাররা তাঁকে নিশ্চয়ই জামাই আদর করবেন না। রাজা-জমিদারদের যেমন তোষামোদকারী থাকে, তেমনি শত্রুও থাকে প্রচুর। আর যদি সত্যি খুন হয়ে থাকে, যদি সত্যি লাশ গুম হয়ে থাকে, তাহলে উপর মহলে যদি কেউ তথ্য-প্রমাণ দিয়ে সব-কথা জানিয়ে দেয়, তাহলে একদিনেই নিতাই দারোগার দারোগাগিরি ঘুচে যাবে। তখন দারোগার উর্দি খুলে খড়ের ব্যবসা করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকবে না।

এতসব সাতপাঁচ যখন ভাবছেন, ঠিক সেই সময় জয়পুরের ছোটকুমার রঞ্জিৎসিং দেও নিজেই এসে থানায় হাজির। এ-যেন মেঘ না চাইতেই জল। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, সুন্দর চেহারা। খুব দামি একটা গরদের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে এসেছেন। তাঁকে দেখেই বোঝা যায়, খুব বিষণ্ণ এবং বিব্রত তিনি। ধীর পায়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন নিতাই দারোগার সামনে।

তাঁর দিকে চোখ পড়তেই নিতাই দারোগা চমকে উঠলেন। থানার সেইসব ঘটনা স্মরণ করেই তিনি আবার যেন চমকে উঠলেন।

ইতিমধ্যে কখন যে খগেন চায়ের কাপটা রেখে গেছে, সেটা তিনি খেয়ালই করেননি। ছোটকুমারের কথা ভাবতে ভাবতে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপটা সরিয়ে রাখলেন। একে তো এক কাপ চায়ে খগেন উদার হস্তে এক কিলো চিনি দিয়ে একেবারে সরবৎ বানিয়ে দিয়েছে, তার উপর পড়ে থাকতে থাকতে সেই চা-টা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ায় সত্যি সত্যি সরবৎ হয়ে গেছে।

ছোটকুমারকে অভ্যর্থনা জানাতে নিতাই দারোগা

www.arisumu.com

একটু বাড়াবাড়ি করেই নিজের সন্দেহকে আড়াল করতে একবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, বললেন, "কী সৌভাগ্য, আপনি নিজেই একেবারে থানায় চলে এসেছেন। বলুন, আপনার কী সেবায় আমি লাগতে পারি।"

নিতাই দারোগার এই আপ্যায়নেও বিষণ্ণ ছোটকুমার যেন চেষ্টা করেও সহজ হতে পারলেন না। ধপ করে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। তারপর মাটির দিকে চোখ রেখেই ধরা গলায় বললেন, "একটা খুব বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।" অপলক নয়নে নিতাই দারোগা ছোটকুমারের সেই বিষণ্ণ অথচ রহস্য ঘেরা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। একটু দম নিয়ে ছোটকুমার বললেন, "দেখুন দারোগাবাবু, আমি একটা ডায়েরি করতে চাই।" একটু থেমে তারপর আবার বললেন, "গতকাল রাত্রে আমার স্ত্রী রহস্যাবৃত কারণে গৃহত্যাগ করে কোন অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছেন। তিনি বাড়ির কাউকে কিছু জানিয়ে যাননি এবং যাওয়ার সময় অনেক সোনা-গয়না নিয়ে গেছেন। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তিনি আমার শ্বশুরবাড়িতেও যাননি।

নিতাই দারোগার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে রহস্যটা যেন আরও জটিল ও জমাট হয়ে উঠল। অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি টেলিফোন করে খবর দিলেন ছোটকুমারের স্ত্রীকে গত রাত্রে হত্যা করে লাশ গুম করে দেওয়া হয়েছে। আর এখন স্বয়ং ছোটকুমার বলছেন, তাঁর স্ত্রী গয়না-গাঁটি নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তাহলে আসল ব্যাপারটা কি?

এ তল্লাটে ছোটকুমারকে সবাই তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য ভয় পায়, আবার রাজরক্তের জন্য সমীহও করে। অবশ্য একটা কথা বলা প্রয়োজন, শুধু রাজপরিবারের সন্তান বলেই নয়, তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বও ছিল অসাধারণ। ছোটকুমারের কথা শুনে নিতাই দারোগা একটু হকচকিয়ে যান। কি করবেন, কি বলবেন, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলেন না। তারপর একটু সাহস সঞ্চয় করে বললেন, "আপনার স্ত্রী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হতে গেলেন কেন? আপনার সঙ্গে কি কোন মনোমালিন্য ছিল?"

এরকম একটা প্রশ্ন যে কেউ ছোটকুমারকে করতে পারেন, সেটা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। তাই ব্যাপারটা বোঝার জন্য কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নিতাই দারোগার দিকে, তারপর বললেন, "দেখুন, আমার সঙ্গে এ সংসারে কারোরই কোন মনোমালিন্য নেই। আর তিনি কেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, সেটা তাঁকে খুঁজে বার করে তাঁর কাছ থেকেই জেনে নেবেন।"

এবার নিতাই দারোগা ব্যাপারটা একটু সহজ করার জন্য হাসতে হাসতে বললেন, "কিছু মনে করবেন না ছোটকুমার। চাকরি বজায় রাখার জন্য আমাদের এরকম অনেক অপ্রীতিকর কথা বলতে হয়।" নিতাই দারোগা হাসলেও ছোটকুমার কিন্তু হাসলেন না। খুব গম্ভীর হয়েই বললেন, "আর কী জানতে চান, বলুন।"

তদন্তের প্রয়োজনে নিতাই দারোগা আরও কিছু ব্যাপার জেনে নিলেন। জেনে নিলেন ছোটকুমারের শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা। এরকম কিছু কথাবার্তা হওয়ার পরই ছোটকুমার উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "আমার কিছু জরুরী কাজ আছে। আমাকে এখন উঠতে হবে। তবে আপনার যদি আরও কিছু জানতে হয়, কাল সকালে আমার বাড়িতে এলেই জানতে পারবেন।"

পরদিন সকালে রাজবাড়িতে নিতাই দারোগা যাবেন—একথা জানাতেই ছোটকুমার উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "কাল সকালে আপনার জন্য অপেক্ষা করব। গরিবের বাড়িতেই সকালে এসে চা খেলে খুব খুশি হব।"

ছোটকুমার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে থানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। হতভম্ব নিতাই দারোগা তাঁর যাত্রাপথের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন, মনে মনে ভাবলেন, "এমনও তো হতে পারে যে, ছোটকুমার নিজের বৌকে নিজেই হত্যা করে বেশ জমিয়ে এখন এই নিরুদ্দেশের গল্প তৈরি করেছেন।" তারপরই আবার ভাবলেন, "কিন্তু মৃতদেহটা যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ তো এটাকে খুনের কেস বলে দাঁড় করানো যাবে না। তাহলে উপায়?"

সেই উপায় নিয়ে ভাবতে ভাবতে একসময় দারুণ ক্লান্ত হয়ে নিতাই দারোগা নিরুপায় অবস্থায় থানা থেকে নিজের কোয়ার্টারে চলে এসেছেন। তারপর ঘরে ঢুকেই ক্লান্ত দেহ ও অবসন্ন মাথাটাকে মেলে দিলেন বিছানার উপর।

।। ২ ।।

বাড়িতে কেউ নেই—আছে একমাত্র খগেন। উদাস মনে বিছানায় শুয়ে শুয়েই আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছেন নিতাই দারোগা। তাঁর এই দীর্ঘ দারোগাগিরির জীবনে এমন বেমক্কা বিপদে তিনি এর আগে কোনদিনই পড়েননি। তিনি ভাবতে থাকেন, সত্যি যদি জয়পুর রাজবাড়ির ছোট বৌ খুন হয়ে থাকেন, যদি খুনের পর তাঁর লাশ গুম হয়ে গিয়ে থাকে—তাহলে ছোটকুমার গোটা ব্যাপারটা বিলক্ষণ জেনেও দিব্যি নাটক করে গেলেন। তাহলে কি ছোটকুমারই খুন করে ছোট বৌ নিরুদ্দেশ হওয়ার গল্পটা তৈরি করেছেন? এই সম্ভাবনাটা নিতাই দারোগাকে বারবার বিচলিত করে তুলছিল।

এতসব ভাবতে ভাবতে রাত অনেক হয়ে গেল। খগেন একসময় রাতের খাবার টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে নিজের কাজে চলে গেল। কিন্তু কোনদিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই নিতাই দারোগার। এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে—সে খেয়ালও তাঁর নেই।

হঠাৎ বাইরে ভীষণ ঝড় উঠল। তারপরই শুরু হয়ে গেল মুষলধারে বৃষ্টি। নিতাই দারোগা একবার সামনের দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, রাত একটা বেজে গেছে।

ঝড় ও বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়া আর কোন আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎঝলকে বাইরের মত্ত প্রকৃতির উদ্দাম ছবিটা কাঁচের জানালা ভেদ করে নিমেষের জন্য ঘরের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। বিদ্যুৎঝলক, বৃষ্টির শব্দ, ঝড়ের দাপাদাপি—গোটা পরিবেশটাকেই কেমন যেন রহস্যময় করে তুলেছে। আর সেই রহস্যে আপন মনে ডুবে গেছেন নিতাই দারোগা। এক সময় তাঁর দু'চোখে তন্দ্রা নেমে এল। তিনি বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে ভীষণ শব্দে একটা বাজ পড়ল। সেই শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন আতঙ্কিত নিতাই দারোগা। প্রথমেই তাঁর চোখ গেল সামনের কাঁচে ঢাকা জানালার দিকে। ঘরের আলোটা সেই কাঁচের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে ওপারেও কিছুটা আলো ম্লান—শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই অস্পষ্ট আলোয় নিতাই দারোগা দেখলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন একজন পরমা সুন্দরী রমণী। নিতাই দারোগা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সেই মায়া-সুন্দরীর দিকে। সত্যি দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু বড়ই করুণ, বড়ই ভয়ার্ত তাঁর চাহনি। সেই রমণী কেমন যেন শীতল-চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন নিতাই

দারোগার দিকে। কাঁচের ওপরে ছায়ার শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মহিলা, নির্বাক, নিস্পন্দ, নিশ্চল।

এই ঝড়-জলের রাত্রে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কে এই সুন্দরী রমণী? এমন সময় বিদ্যুৎ-ঝলকে তিনি একটু ঠাহর করতেই দেখলেন, লাল চওড়া পাড়ের শাড়ি পরা রমণীর সর্বাঙ্গে মাটি কাদা লেগে আছে। কপালে একটা সিঁদুরের টিপ—বেশ বড় মাপের। এত জল ঝড়েও টিপটা উজ্জ্বলই আছে। আর কপালের ডানদিকে যেন দগদগে লাল রক্ত জমাট বেঁধে আছে। কয়েক ফোঁটা রক্ত গালের উপর চুঁইয়ে পড়েছে।

—কে ইনি? এত রাত্রে এই দুর্যোগে এখানেই বা কেন? রোমাঞ্চিত নিতাই দারোগা তখন নিজের মনেই সহস্র প্রশ্নের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। হঠাৎ তিনি দেখেন, মোমের পুতুলের মত নির্বিকার সেই রমণী ডান হাত তুলে ইশারায় তাঁকে ডাকছেন। বিদ্যুৎঝলকে দেখা গেল, ডান হাতে তাঁর মোটা সোনার বালা, আর মোটা শাঁখা। ডান হাত তুলে সেই ভাবলেশহীনা রমণী আবার ইশারায় ডাকলেন। সেই ডাকে কেমন যেন এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ছিল—এ-ও যেন মূর্তিমতী নিশির ডাক। বাক্‌শক্তিহীন নিতাই দারোগা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কি করবেন আর কি করবেন না—তা ভেবে ঠিক করার আগেই মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেলেন দরজার সামনে। তারপর নিজের অজান্তেই দরজা খুলে দেখেন, সেই ঝড়-জলের মধ্যে সেই রমণী সেই জানলা থেকে সরে গিয়ে অনেকটা দূরে ঠিক আমগাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। চমকে উঠলেন নিতাই দারোগা—এত কম সময়ে ঠিক চোখের পলকে কি কেউ অতটা দূরে সরে যেতে পারে? তিনি আবার তাকালেন সেই দূরবর্তিনী রমণীর দিকে। আবার তিনি দেখলেন, রমণী তাঁকে হাতের ইশারায় আগের মতই ডাকছেন।

এই ডাক যেন সেই হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার সেই বাঁশির সুর—যাকে অনুসরণ না করে উপায় নেই। প্রচণ্ড জল-ঝড়ের মধ্যে বনজঙ্গল ঝোপ ডিঙ্গিয়ে ঠিক নেশাগ্রস্ত মানুষের মতই নিতাই দারোগা সেই রমণীকে অনুসরণ করতে থাকেন। কেন যে সেই ছায়া-মূর্তি মহিলাকে অনুসরণ করছেন, তা নিজেও জানেন না। এভাবে তিনি কতক্ষণ চলেছেন, কিছুই তাঁর খেয়াল নেই। গাছপালায় লেগে হাত-পা ছিঁড়ে যাচ্ছে—কোনদিকেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি একজন অন্ধ মানুষের মতই শুধু ওই রমণীকে অনুসরণ করে চলেছেন।

তারপর তিনি আচমকা, আকাশভরা এক বিদ্যুতের ঝলকে দিখলেন, একটু দূরেই একটা কাঁচা মাটির ঢিবির সামনে দাঁড়িয়ে ওই রমণী বারবার ওই ঢিবিটাকে দেখাচ্ছেন আর হাত বাড়িয়ে কিছুটা দূরের একটা জলে ডোবা গর্তকে দেখাচ্ছেন। রমণী কি যেন বলতে চান, কিন্তু কিছুতেই বলতে পারছেন না।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় জলে ভেজা অবসন্ন নিতাই দারোগা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তারপর আর কিছুই তাঁর খেয়াল নেই।

যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, তখন সবে ভোর হয়েছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। মাটিতে শুয়ে শুয়েই তিনি গতরাত্রের ঘটনাটাকে স্মরণ করার চেষ্টা করলেন, বুঝলেন তিনি স্বপ্ন দেখেননি। কারণ, তাঁর সামনে সেই কাঁচা মাটির ঢিবিটা তখনও রয়েছে এবং একটু দূরে রাত্রে দেখা সেই গর্তটাও রয়েছে। চারদিকে চোখ বোলাতেই তিনি বুঝে গেলেন, জয়পুর রাজবাড়ির ঠিক পিছন দিকের পতিত জমিতে তিনি শুয়ে আছেন। এই জায়গাটাকে স্থানীয় মানুষ 'ভাগাড়' বলে।

শরীরটা অবশ হয়ে গেছে। তবু তিনি জোর করেই উঠে বসলেন। সর্বাঙ্গে তাঁর কাদা। লোকে এই অবস্থায় তাঁকে দেখলে কি ভাববে! তাই তিনি ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত শরীরটা নিয়েই তাড়াতাড়ি নিজের কোয়ার্টারের দিকে ছুটে চললেন, আর মনে মনে ভাবতে থাকেন, কে সেই রমণী—যিনি ওই ঝড়-জলের মধ্যে পথ দেখিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন? কোনক্রমে কোয়ার্টারে এসে স্নান-টান করে নিজেই এক কাপ চা তৈরি করে খেয়ে নিলেন। কারণ, খগেন তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তারপর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে পুলিশের পোশাক পরে তিনি সটান গিয়ে হাজির হলেন থানায়।

এত সকালে বড়বাবুকে থানায় আসতে দেখে ঘুমন্ত ডিউটি অফিসার, কনেস্টবল সকলেই ধড়মড় করে উঠে বসলেন। তিনি মাটি কাটার মত কয়েকজন লোক এবং গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানকে তক্ষুণি ডেকে আনতে বললেন একজন কনেস্টবলকে। নিতাই দারোগা আর দেরি করতে

পারছেন না। ভিতরে ভিতরে তিনি এক তীব্র উত্তেজনা অনুভব করছেন, সর্বদেহে তাঁর শিহরন। অথচ কাউকে কিছু বলতে পারছেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই এসে হাজির। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন : ব্যাপারটা কি? হঠাৎ মাটি কাটার লোক কেন?

তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন, কোন কথা নয়, আমার সঙ্গে চুপচাপ চলুন। অগত্যা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে। তারপর সকলকে নিয়ে রাজবাড়ির ঠিক পিছনের সেই পতিত জমিতে এসে হাজির হলেন।

তখন সকাল ছ'টা। গ্রামের ঘুম সবে ভেঙেছে। দেখতে দেখতে অনেক গ্রামের লোকও এসে সেখানে জড়ো হল।

সকলের সামনে, পঞ্চায়েত প্রধানকে সাক্ষী রেখে নিতাই দারোগা মাটি কাটার সেই লোকজনকে বললেন, কাঁচা ঢিবির নরম মাটিটাকে সরিয়ে ফেলতে। আর জলে ডোবা গর্তটাকে খুঁড়তে।

কয়েকশো কৌতূহলী মানুষ হাঁ করে তাকিয়ে আছে, "কি হয়" দেখার জন্য।

শেষ পর্যন্ত নরম মাটি সরাতেই সেই ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রাজবাড়ির ছোট বৌয়ের কাদা মাখা লাশ।

নিতাই দারোগা সেদিকে তাকিয়ে কাঠের মত শক্ত হয়ে গেলেন। কারণ, ছোট বৌ-এর পরনে লাল চওড়া পাড়ের শাড়ি। হাতে মোটা সোনার বালা এবং শাঁখা। কপালে বড় একটা সিঁদুরের টিপ। আর কপালের এক দিকে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

রাত্রে যে রহস্যময়ী রমণী নিতাই দারোগাকে ঝড়-জলের মধ্যে এই নির্জন প্রান্তরে টেনে এনেছিলেন, এ-যে তাঁরই মৃতদেহ। মনে হয় যেন নরম মাটির নিচে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। সমস্ত শরীরে এক ভয়ঙ্কর শিহরন অনুভব করলেন তিনি।

তারপরই নিতাই দারোগা দেখলেন, একটু দূরের গর্তটা খুঁড়ে পাওয়া গেল জয়পুরের ছোটকুমারের জামা-কাপড়—সবই রক্তমাখা। পাওয়া গেল একটা লোহার রড—সেটাও রক্তমাখা।

এরপরের কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। এরপর ছোটকুমারকে গ্রেপ্তার করা হল, নিজের স্ত্রীকে খুন করা এবং লাশ গুম করার অপরাধে। আর এরকম একটা খুনের কিনারা করার জন্য নিতাই দারোগা পেলেন পুলিশ পদক, পেলেন প্রমোশন।

কিন্তু তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। আজও নিতাই দারোগা যখন একা থাকেন, তখনই চোখের সামনে দেখতে পান সেই রমণীর সুন্দর মুখে বিষণ্ণ এবং ভয়ার্ত ছায়া। দেখতে পান সুন্দর কপালের ডানদিকে জমাট রক্তের দাগ। এ কাহিনী নিতাই দারোগা কোনদিনই কাউকে বলতে পারেননি। কারণ, কেউই যে অবিশ্বাস্য এই অলৌকিক ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নিতে রাজি হবেন না।

www.arisumu.com

লোকটা কে

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে পরাশর সেনের তখন বেশ নামডাক। এই নাম ছড়াবার পেছনে রয়েছে একটা জোড়াখুনের রহস্য উদ্ধার। যেভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরাশর সেই দুর্ধর্ষ খুনীকে আবিষ্কার করেছিল, তাতে তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এই নিয়ে খবরের কাগজে খুব লেখালিখি হয়েছিল একসময়।

অবশ্য এমনিতে পরাশরকে দেখলে মনে হবে ছাপোষা মানুষ। যেন ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু ডিটেকটিভ হিসেবে তদন্তের কাজে ওর বুদ্ধি যেন ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। কোন পরিবেশে কোথায় কিভাবে টোপ ফেলে এগোতে হবে, সে ব্যাপারে ওর জুড়ি মেলা ভার।

গড়িয়ার কাছে বড় রাস্তার ওপরই পরাশরের অফিস। অফিস মানে ছোট্ট একটা ঘর। বেশ সাজানো-গোছানো। সেখানে হারু নামে একটা ছোকরা সারাদিন ঘর খুলে বসে কাটায়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ফাই-ফরমাস খাটে, চা-ফা এনে দেয়। অফিসে কে এলো তা নোট করে রাখে। এছাড়া কখনও বা ব্যাঙ্কে যাওয়া, পোস্ট অফিসে যাওয়া, কাউকে কোনো চিঠি দিয়ে আসা ইত্যাদি সব কাজই হারুকে করতে হয়।

পরাশরকে গোয়েন্দাগিরির কাজে সারাক্ষণই ঘোরাঘুরি করতে হয়। যথাবিহিত সে দিনও ছুটোছুটির কাজ সেরে সন্ধ্যা নাগাদ পরাশর অফিস ঘরে এসে ঢুকল।

ঢুকেই দেখল, হারু একটা টুলের ওপর বসে ঝিমুচ্ছে।

কি রে হারু ঘুমুচ্ছিস?

কেমন যেন চমক ভেঙে লাফিয়ে ওঠে হারু, আজ্ঞে না স্যার। আসলে—, বোকার মতো একটু হাসে। আসলে স্যার, সারাদিন একা একা বসে ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।

তা অবশ্য ঠিক। তোকেও আর দোষ দিয়ে লাভ নেই। সারাদিন ওরকম বসে থাকলে ঘুম পাওয়ারই কথা। ঠিক আছে, একটা কাজ কর দেখি। খাতাটা দে, কে কে এসেছিল একবার দেখে নিই।

আজ্ঞে স্যার, আজ কেউ আসেনি, একটা মাছিও না স্যার।

সে কি রে? কেউ না!

হারু আবার বোকার মতো তাকায়, মাথা চুলকোয়।

ঠিক আছে, তাহলে একটু চা-ই নিয়ে আয়। চা-টা খাইয়ে তুই বাড়িও চলে যেতে পারিস। মিছিমিছি বসে থেকে আর কি করবি।

হারু চায়ের কেটলিটা হাতে নিল। তারপর ছুটে গিয়ে চা নিয়ে এসে পরাশরকে একটা কাপে ঢেলে দিল। নিজেও একটু নিল। তারপর চা খাওয়া হয়ে গেলে বোকার মতো একটু হাসল আবার।

কি হলো, হাসছিস যে? বললাম তো তুই যেতে পারিস। আমি বরং আর একটু বসেই যাই। চাবিটা এখানে রেখে যা।

হরু তাই করে। চাবিটা রেখে চলে গেল।

পরাশর ঘড়ি দেখল। সবে সাতটা। তার মানে এখনো সন্ধ্যাই বলা যেতে পারে। চেয়ারে হেলান দিয়ে পা দুটো সামনের দিকে টেনে লম্বা করে ছড়িয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হওয়ায় নতুন কেস হিস্ট্রির ফাইলটা পাশের র‍্যাক থেকে টানতে গিয়ে দরজার দিকে চোখ পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। পর্দার ওপাশে কেউ একজন দাঁড়িয়ে।

কে? টান টান হয়ে বসে জিজ্ঞেস করে পরাশর।

বাইরে থেকে কেমন একটা মিনমিনে গলা, ভেতরে আসতে পারি স্যার?

আসুন। ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?

পর্দা সরিয়ে লোকটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। কেমন যেন ইতস্তত ভাব। একটু কথা ছিল স্যার।

লোকটার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিল পরাশর। বছর পঞ্চাশেক বয়স। পরনে ময়লা ধুতি, গায়ে কলার ছেঁড়া শার্ট, পায়ে ছেঁড়া ফাটা চপ্পল। কিন্তু এসব যেমন তেমন, লোকটার কপালের পাশে একটা টিউমার। ছোটখাট একটা আপেল যেন ওখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আর চোখ দুটোও কেমন যেন মিয়োন।

কি ব্যাপার, বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বসবার জন্য একটা চেয়ার দেখিয়ে দেয় পরাশর।

লোকটা এগিয়ে এসে চেয়ারে বসে।

কি কথা বলুন এবার।

আগন্তুক ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর পরাশরের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, একটা খুনের ঘটনা স্যার।

খুনের ঘটনা, মানে! পরাশর কেমন সোজা হয়ে বসে। কোথায় খুন, কে খুন করল?

খুন করে স্যার বডিটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

পরাশর কেমন বোকার মতো তাকায়। তারপর নোট করার জন্য ডায়েরি বুকটা টেনে নেয়, একটু খুলে বলুন দেখি। কোথায় খুন, কাকে? কেমন যেন উত্তেজনা বোধ করতে থাকে পরাশর।

অথচ লোকটা নির্বিকার। শীতল ভাবেই বলল, আপনি যদি দেখতে চান স্যার দেখাতে পারি। তবে খুনী কিন্তু বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাই স্যার, এই অসময়ে আপনাকে খবরটা দিতে এলাম।

পরাশর লোকটাকে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, লোকটার মাথায় কোনো গোলমাল নেই তো! কিন্তু না, তাও মনে হয় না। বলল, আচ্ছা দাঁড়ান, চা খাবেন?

না স্যার, আমি চা খাই না। তা ছাড়া স্যার, এদিকে যদি দেরি করেন লোকটা কিন্তু পালিয়ে যাবে। আজ রাতের ট্রেনেই ও বোম্বাই পালাবে বলে ঠিক করেছে। টিকিটও কাটা হয়ে গেছে ওর।

পরাশর বলল, কিন্তু ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন তো। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে, কে সে?

বেশি দূরে নয় স্যার। এই গড়িয়াতেই, খালের ধারে। একটা বহুকালের পুরনো বাড়িতে।

ঠিকানা বলুন।

ঠিকানা বলল লোকটা। পরাশর চটপট তা লিখে নিল।

বেশ, এবার বলুন, কে খুন হয়েছে আর কেই বা খুন করেছে?

যে খুন করেছে স্যার, তার নাম সি দাস মানে চণ্ডী দাস। মহা ফেরেববাজ লোক, ডেঞ্জারাস।

বটে। কাকে খুন করেছে?

আজ্ঞে স্যার ওরই এক পার্টনার অম্বিকা রায়কে। টাকাপয়সা নিয়ে দু'জনের মধ্যে অনেক দিন ধরেই ঝগড়া চলছিল। আজই স্যার, সকালে নিজের বাড়িতে অম্বিকাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মওকা বুঝে খুন করে।

আজ সকালে! কি ভাবে খুন করল?

বাড়িটা স্যার, এমনিতেই খুব নির্জন। চণ্ডী ছাড়া আর কোনো লোক থাকে না ওখানে। দুজনে ঘরের ভিতর বসে কথা বলছিল। হঠাৎ সুযোগ বুঝে চণ্ডী একটা চপার দিয়ে ওর মাথায় একটা কোপ মারে। আর তাইতেই স্যার।. . .

বটে, তা আপনি জানলেন কি করে? আপনি কি দেখেছেন?

লোকটা কি যেন একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, আর ঠিক তখনই কেলেঙ্কারি। টুক করে আলো নিভে গেল।

www.arisumu.com

পরাশর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বুঝল, লোডশেডিং।

লোকটা বলল, আমি তাহলে যাই স্যার। খুনের খবরটা আপনাকে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। এবার আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।

বলতে বলতে লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে টের পেল পরাশর। সে কি মশাই, কোথায় যাচ্ছেন? কথাই তো হলো না। তাছাড়া স্পটটা দেখাবেন তো আমাকে?

সেখানে আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না স্যার। আপনি একাই চলে যান। এখনই গেলে চণ্ডীবাবুকে পেয়ে যাবেন। ওকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানতে পারবেন।

টুক করে ঘরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল আগন্তুক।

পরাশর কেমন বোকার মতো তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে দাঁড়াল, ঘরের ভিতর এভাবে এখন বসে থাকারও মানে হয় না। একটু কি ভেবে জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর বেরিয়ে এলো ঘরের বাইরে। চারপাশে তাকাল, না, লোকটা উধাও।

অদ্ভুত ব্যাপার। পাগল না তো। হঠাৎ করে এসে একটা মার্ডারের কথা শুনিয়ে গেল, অথচ চোখে মুখে ওর বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই। নাকি আমাকে খানিকটা হ্যারাস করার জন্যই ব্যাপারটা করে গেল! কে জানে!

আবার ভাবল, নাহঃ, একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাত তো এখন সবে সাড়ে সাত। দেখাই যাক না চণ্ডীবাবু নামে কাউকে পাওয়া যায় কি না।

ঘরে তালা লাগিয়ে ডায়েরিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পরাশর। আর রাস্তায় পা দিয়ে খানিকটা এগোতেই আবার আলো জ্বলে উঠল চারপাশে। যাক বাবা, বাঁচা গেল। অল্পের ওপর দিয়েই লোডশেডিং কাটল।

তারপর হাঁটতে শুরু করে পরাশর। এ-রাস্তা সে-রাস্তা করে শেষটায় নম্বর মিলিয়ে হাজির হলো চণ্ডীবাবুর বাড়ির সামনে। আবার ঘড়ির দিকে তাকাল, আটটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। কিন্তু এরই মধ্যে পাড়াটা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। নিস্তব্ধ।

বাড়িটার দিকে তাকাল। বহু পুরনো আমলের বাড়ি। দেয়াল ফুঁড়ে গাছ গজিয়ে গেছে। সামনের দিকে বাগান মতো অনেকখানি জায়গা। ঝোপজঙ্গলে ভরে রয়েছে। কেউ যে এরকম একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে বাস করে ভাবাই যায় না।

পরাশর দেখল, বাড়ির সব কটা দরজা জানালাই বন্ধ। তবে পাশের দিকে একটা ঘরে যে আলো জ্বলছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে কলিং বেল টিপল পরাশর।

আর, কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। কে?

পরাশর দেখল, মধ্যবয়সী একজন লোক। পরনে

প্যান্ট শার্ট। পায়ে সু। একটু যেন ব্যস্তসমস্ত ভাব।

আমি একটু চণ্ডীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বলুন কি দরকার। আমার কিন্তু একদম সময় নেই। ট্রেন ধরতে হবে।

পরাশর বলল, আপনি যে বোম্বে মেল ধরবেন সেটা আমি জানি। ট্রেন কটায়?

ভদ্রলোক কেমন যেন একটু চমকে উঠলেন, তার মানে, কে আপনি? আপনি কি করে জানলেন আমি বোম্বেই যাচ্ছি?

পরাশর মাথা ঠাণ্ডা রাখে। না দেখুন, বোম্বেতে আপনি ক'দিন থাকবেন? কোথায় উঠবেন? এ সবও আমার জানা দরকার।

চণ্ডীবাবুর চোখ মুখের চেহারাই যেন পাল্টে গেছে। এক পলক ভ্রূ বাঁকা করে পরাশরের দিকে তাকালেন, এসব আপনি জিজ্ঞেস করার কে? কে আপনি?

এরকম পরিস্থিতিতে কিভাবে কথা বলতে হয় পরাশরের জানা। বলল, দেখুন চণ্ডীবাবু, আপনাকে একবার আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। সেখানেই জানতে পারবেন আমি কে।

হোয়াট ডু ইউ মিন? থানায় কেন? কি করেছি আমি? যান যান মশাই, থানা দেখাবেন না। আমার এখন সময় নেই। যান।

বলতে বলতে ভদ্রলোক আবার ঘরে ঢুকে পড়লেন।

পরাশর কেমন বোকার মতো তাকিয়ে রইল। সন্দেহটা মাথার মধ্যে বেশ দানা বেঁধে উঠল। কিছুতেই লোকটাকে এখন হাতের বাইরে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হলো, ও তো একদম খালি হাত পা। আবার লোকটা তো খুনী আসামী, ও না পারে হেন কাজ নেই।

টুক করে ঘরের আলোটা নিভে গেল। নিভে যেতেই চমকে উঠেছিল পরাশর। চণ্ডীবাবু একটা স্যুটকেস হাতে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন, ও কী, এখনো আপনি দাঁড়িয়ে আছেন! বললাম, জরুরী কাজে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। এখনই না বেরুলে ট্রেন ধরতে পারব না।

বলতে বলতেই ভদ্রলোক ঘরে তালা লাগিয়ে স্যুটকেস হাতে সদরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

পরাশর কি করবে বুঝতে পারে না। লোকটাকে কি ফলো করা উচিত? আবার মনে হলো, ফলো করে কি লাভ, তার চেয়ে থানাতেই যাই, থানাকেই ব্যাপারটা আগে জানানো দরকার।

হঠাৎ পেছন থেকে কার একটা গলার আওয়াজ, স্পটটা একটু দেখে যাবেন না স্যার?

কে? পরাশর চমকে উঠে পিছনে তাকিয়ে দেখে, আরে এ তো সেই লোকটাই। খানিকক্ষণ আগে ওর চেম্বারে গিয়ে খুনের খবরটা ওকে দিয়ে এসেছিল।

আপনি!

হ্যাঁ স্যার, আমি। চণ্ডী তো আপনাকে পাত্তাই দিল না দেখলাম। ও তো একটা ট্যাক্সি চেপে সটান হাওড়ার দিকে চলে গেল।

আপনি কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

লোকটার সেই মিয়োন চোখ, আসুন না, জায়গাটা আপনাকে দেখিয়ে দিই। খুন করে মাটি চাপা দিয়েছে দেখে যান।

বাড়ির পেছন দিকে এগিয়ে যেতে থাকে লোকটা। পরাশরও ওর পিছু নেয়। এককালে এদিকেও বাগান ছিল বোঝা যায়। এখন বাগানের বদলে জংলা গাছে ঠাসা। বাউন্ডারি ওয়ালটা এদিকে বেশ উঁচু।

এই বাউন্ডারি ওয়ালের পাশেই স্যার খাল।

তাই বুঝি!

আর ওই কোণের দিকে দেখুন স্যার। লোকটা আঙুল তুলে দেখায়।

পরাশর দেখে দেওয়ালের এক পাশে ময়লা জঞ্জালের স্তূপ। তারই ওপর একটা ভাঙাচোরা ড্রাম বসানো।

ওই যে স্যার, ময়লা ফেলার ড্রামটা দেখা যাচ্ছে, ওটা একটু সরালেই দেখা যাবে, গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। বডিটাকে একটা বস্তায় ভরে ওখানে পুঁতে রাখা হয়েছে।

পরাশর এগিয়ে গেল ড্রামটার কাছে। ড্রামটা সরাবার জন্য হাত বাড়াতেই লোকটা হাঁ হাঁ করে উঠল, না স্যার, আপনি হাত দেবেন না। আগে পুলিশকে আসতে দিন। পুলিশের সামনেই বডিটা বার করা ভালো।

পরাশর হাত সরিয়ে নিয়ে পিছিয়ে এলো। পুলিশকে তাহলে এখনই খবরটা দিতে হয়।

পুলিশ এখনই এসে পড়বে স্যার। ওই তো জিপের

শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

হ্যাঁ, এ টা গাড়ি আসার শব্দই যেন পাচ্ছে পরাশর। সদর গেটের দিকে এগিয়ে গেল। সত্যিই একটা পুলিশ ভ্যানই এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য পুলিশও জেনে গেছে তাহলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। ভ্যান থেকে নেমে এলেন ও.সি.।

এই যে পরাশরবাবু, কি ব্যাপার, তলব করেছেন কেন?

পরাশর একটু অবাক হয়, তলব করেছি, কই আমি না তো! তবে আপনারা এসে পড়ায় খুব ভালো হয়েছে।

সে কি মশাই, খানিকক্ষণ আগে তাহলে কে ফোন করল আমাদের? খুব জরুরী দরকার, আপনি অপেক্ষা করছেন, ফোর্স নিয়ে এখুনি এই ঠিকানায় চলে আসতে বলেছেন আপনি!

কেমন রহস্যময় লাগে পরাশরের। কিন্তু তখন আর ওসব কচকচি বাড়িয়ে লাভ নেই। বলল, এ বাড়িতে ভীষণ একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটে গেছে। বাড়ির পেছন দিকে মাটির নিচে দারুণ এক রহস্য লুকোন রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

তাই নাকি! কি রহস্য? চলুন তো দেখি।

খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়ে গেল। ড্রামটা সরিয়ে খানিকটা মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল বস্তাবন্দি একটা মৃতদেহ।

টেনে উপরে তুলে আনা হলো বডিটাকে। তারপর টর্চের আলোর মধ্যে বস্তাটা কেটে সরাতেই চমকে ওঠে পরাশর। আরে এ কি করে সম্ভব! পরনে ধুতি, গায়ে শার্ট। আরও আশ্চর্য লোকটার পাশে সেই আপেলের মতো টিউমারটাও।

কি হলো?

পরাশর চারপাশে তাকায়। কিন্তু এতক্ষণ যে লোকটার সঙ্গে ও কথা বলল, সে কোথায়?

কে কোথায়, কার কথা বলছেন?

পরাশর এবার ভয়ে ভয়ে তাকায়। জানেন ও.সি., অবিকল এরকম চেহারারই একটা লোক আমার চেম্বারে গিয়ে খুনের ঘটনার খবরটা দিতে গিয়েছিল। আবার কিছুক্ষণ আগেও লোকটা এখানে এসে আমার সঙ্গে কথা বলে গেছে। অবিকল এই চেহারা। এ রকম ধুতি শার্ট, কপালের টিউমারটাও।

তার মানে, আপনি বলছেন—

বিশ্বাস করুন ও.সি., আমার মনে হচ্ছে এই লোকটার আত্মাই আমাকে এখানে টেনে এনেছে। থানায় যে ফোনটা গিয়েছিল সেটাও বোধহয় ওরই কীর্তি।

তাই নাকি! পুলিশ অফিসারও কেমন বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর সোজা হাওড়া স্টেশনে। বম্বে মেলেই পাওয়া গেল চণ্ডীকে। তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো থানায়। পুলিশের কাছে চণ্ডী স্বীকার করলো, বন্ধুকে সেই হত্যা করেছে।

গিরিধারীর গেরো

আনন্দ বাগচী

www.arisumu.com

ভর সন্ধ্যের ঝিমধরা অন্ধকারে পিন্টু বাড়ির দিকে ছুটছিল। খেলার মাঠে আজ তার বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। হাত-পা ধুয়ে এক্ষুণি তাকে পড়তে বসে যেতে হবে। কিন্তু বাবার বকুনির থেকেও খুব জ্যান্ত একটা ভয় এই মুহূর্তে তার পিছু নিয়েছিল। তাই ডাইনে বাঁয়ে কোনো দিকে তাকাবার সাহস ছিল না। কাছেই কোথাও গাছের ডালে একজোড়া হুতুম প্যাঁচা ভুতুড়ে গলায় রক্তহিমকরা ডাক ডাকছিল। এর চেয়ে বাঘের ডাক শুনলেও বুঝি পিন্টু এরকম ভয়ে সিঁটিয়ে যেত না।

জায়গাটা উর্ধ্বশ্বাসে পেরিয়ে এসে পিন্টু পায়ের গতি কমিয়ে দিয়েছিল। বাড়ি এসে গেছে, শাঁখের শব্দ শোনা গেল। শাঁখের নয়তো, যেন মায়ের গলা। আশপাশের বাড়ির থেকে ঠিক আলাদা, চিনতে পারে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো ভয়টা এতক্ষণে গা ছেড়েছে। রাস্তার শেষ বাঁকটা এসে গিয়েছিল, মোড় ঘুরলেই এবার বাড়ি দেখা যাবে। তাই আনমনা পিন্টু প্রথম দেখতে পায়নি। বাঁকের মুখে ঝাঁকড়া তেঁতুলতলায় মাথায় ইয়া পাগড়ি বাঁধা একটা লোক উবু হয়ে বসে খৈনি ডলছিল। পেছন ফিরে বসে থাকায় লোকটাও পিন্টুকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ হাততালির মতো শব্দ শুনে পিন্টু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর একটু নজর করতে আবছা মতন চোখে পড়ল। প্রথমে মনে হয়েছিল কোনো কাকতা[illegible] কেউ দুষ্টুমি করে ওখানে পুঁতে রেখে গেছে। প্রকাণ্ড হাণ্ডার মতো মাথাটা ঝুঁকে আছে, গায়ে চিত্তির-বিচিত্তির করা খাটো কামিজ বোধহয় হাওয়ায় দুলছে। কিন্তু না, ওটা একটা লোক, চোরচোট্টা হওয়াই সম্ভব, খুব নিরিবিলি নিশ্চিন্তে খৈনি টিপছে। ফট ফট ফটাস আওয়াজটা সেই জন্যেই।

একটুও ভয় পায়নি তা নয়। কিন্তু ভাবটা চাপা দিতে বেশ জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল পিন্টু, হ্যাই লোকটা! কী করছ ওখানে?

আচমকা হাঁক শুনে খুব চমকে গিয়েছিল লোকটা। তিড়িং করে এক পাক ঘুরে উঠে দাঁড়াতেই পিন্টুর হাসি পেয়ে গেল। ও হরি, এ যে পুঁচকে, এক তালপাতার সেপাই! হাড্ডিসার লিকপিকে চেহারায় অ্যাত্তোবড়ো পাগড়ি একদম মানায়নি। তার ওপর আবার কাঠবেড়ালির ফুলকো ন্যাজের মতো একজোড়া পালোয়ানী গোঁফ। কোনো রকমে হাঁটুর তলা অবদি নেমেছে একটা ডোরাকাটা আঁটোখাটো পাজামা। পিন্টুকে হাসতে দেখে লোকটাও চোখ পিটপিট করে হাসতে লাগলো বিনয়ের অবতার হয়ে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপনে দেখা কুর্নিশ করা মূর্তির মতোই আধভাঙা চিঁচিঁ গলায় বলল, ওঃ আপুনি খোঁকাঁবাবু আসেন!

লোকটা হিন্দুস্থানী কিন্তু ভাঙাচোরা বাংলা বলে।

খোকাবাবু বলায় পিন্টুর আত্মসম্মানে একটু চোট লাগলো। সে দুধের খোকা নাকি! এবার রীতিমতো ক্লাস সিক্সে উঠেছে। সবুজ সাথী ক্রিকেট ক্লাবে স্পিন বোলার হিসেবে তার নাম হয়েছে। ক্লাবের দাদারা পর্যন্ত তাই আদর করে স্পিনটু বলে ডাকে, আর এই পুঁচকে লোকটা তাকে কিনা—

ধমকের গলায় পিন্টু বলল, পিন্টুবাবু বলবে।

লোকটা বাধ্য ছেলের মতো পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। ঘাড় নেড়ে বলল, হাঁ হাঁ, যা বোলাবেন হামি বলবে। পিন্টুঁবাঁবু। বহুৎ আচ্ছা নাম আসে। বহোৎ মিঠা।

পিন্টু বলল, তা তো বুঝলাম। কিন্তু কি মতলব? এখানে কেন?

এই কুছ কামকাজের খোঁজে।

হুঁ, কাজ খোঁজার জায়গাই বটে! দেখি দেখি, তোমার বগলে ন্যাকড়ায় জড়ানো ওগুলো কি! সিঁদ কাঠিফাটি নয় তো?

লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে লোকটা বলে, জী হাঁ। ঝুটা কেনো বলব। সিঁদ খাঁটি ভি আসে!

পিন্টু চমকে যায় ওর সত্যবাদিতায়। বলে, অ্যাঁ! তুমি তাহলে চোর?

লোকটা এবার প্রতিব[illegible] জানালো, নেহি পিন্টুঁবাঁবু। হামি চৌর না, কামচোর [illegible] মেহন্নত করকে খাই। সাচ্চা আদমি।

পিন্টু মনে মনে বলে, সাচ্চা আদমি না হাতি! কামচোর কথাটার মানে তার ঠিক জানা ছিল না। মুখে বলতে যাচ্ছিল, তাহলে এইসব যন্তরফন্তর কেন্‌? কিন্তু বলা হ[illegible] না, লোকটা বোধহয় তার মনের কথা বুঝতে পেরেই ভাঙা বাংলায় বলল, যন্তরফন্তরের কোথা ছেড়ে [illegible]ন, বাড়ির কাম তো, কোখন কোন চীজ দরকার হোয় কা[illegible] জানে!

[illegible]পিন্টুর মনে পড়ে গেল তাদের বাড়িতে এখন কাজের [illegible]কের খুব অনটন চলেছে। বহু দিনের পুরনো লোক বিশুদা খুব বুড়ো হয়ে [illegible]ল, আর পেরে উঠছিল না। কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে [illegible]লে যাবার পর বাবা অনেক চেষ্টা-চরিত্র ক[illegible] [illegible]কে[illegible] ধরে আনেননি তা নয়, [illegible]কেনি [illegible]কে [illegible]ক সপ্তাহ কেউ এক মাস বড়জোর। মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে, রোজ বাবাকে বলে। কিন্তু এখন নাকি লোক পাওয়া দুষ্কর। চতুর্দিকে এত ছোট ছোট কারখানা গজিয়েছে, বাড়ির কাজ ফেলে সবাই সেখানে চলে যায়।

তুমি বাড়ির কাজ ঘরের কাজ করবে?

হাঁ হাঁ জরুর করবো।

কী কী কাজ জানো?

সোব। যা বোলবেন সোব ফিনিশ করে দিব।

ওরে বাবা, এ যে আবার ইংরিজি-মিংরিজিও বলে। পিন্টু মাথা চুলকে বলে, ইয়ে, বিড়ির কারখানা, রংকল, তাঁতকল, প্লাস্টিক, প্লাইউড. . .

লোকটা ওকে কথা শেষ করতে দিল না, কভি নেহি, কোখোনা না, আমি ঘরকা আদমি। উ পেলাস্টিক-ইলাস্টিক বহোত খতরনাক্, ডর লাগে, পিন্টুঁবাঁবু। এক্‌বার আঁগ লাগবেঁ তো ব্যস্ খতম!

বাজিয়ে নিয়ে ভালোই হলো। এ যাত্রা এই লোকটা হয়তো টিকেও যেতে পারে। তবে যা পলকা। অবিশ্যি মায়ের যদি পছন্দ হয় তবে। খুশি হয়ে পিন্টু বলল, তা হলে চলো আমাদের বাড়ি।

ছুটতে ছুটতে এসে পিন্টু বাড়িতে ঢুকেই বাবার মুখোমুখি পড়ে গেল। বারান্দায় চটি ফটফটিয়ে পায়চারি করার ধরন দেখেই বুঝেছিল বাবা ভীষণ চটেছেন। কিন্তু ওর এখন সাতখুনও মাপ হয়ে যাবার কথা, ঘন্টাখানেক দেরি তো কোনো ব্যাপারই নয়। বাবা কিছু বলার আগেই ও হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বাবা, আমি গিদ্‌ধর সিং

কথাটা শেষ করতে পারল [illegible] ওর বাবা রাগে ফে[illegible] পড়লেন, তা তো বটেই। গিদধ[illegible] [illegible] গাধা। তুমি গ[illegible] না হলে কি আর মাথায় সি[illegible]

আমি না। কাজে[illegible] [illegible] ওর বলুন।

অ্যাঁ! কোথায়?

পিন্টুও কেমন ঘাবড়ে গেল। বলল, তা[illegible] তো [illegible] কোথায়? আমার পিছু পিছুই তো—

বুঝেছি! তোমার মাথায় শুধু সি[illegible] [illegible] মাথাটিও গেছে!

জী হুঁজৌর? পিন্টুর বাবার পিছ[illegible] থেকে মিহ[illegible]

গলার স্বর উঁচু হলো, গিরধর লাল সিং হাজির!

পিন্টু তার বাবাকে এরকম চমকাতে কখনো দেখেনি। লোকটার চেহারা দেখে ওঁর মুখ দিয়ে কথা বেরলো না।

কার সঙ্গে কথা বলছ? বলতে বলতে পিন্টুর মা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো, কী আপদ! এই সড়টা আবার এখানে কি করছে? এ ভূতটাকে তুমি কোত্থেকে জোটালে?

পিন্টুর বাবা বললেন, তোমার লোক।

আমার লোক? পিন্টুর মা আকাশ থেকে পড়ল। পিন্টুও আর দাঁড়ালো না, এই সুযোগে সরে পড়ল।

তা গিরিধারী না গিরধর এ বাড়িতে বহাল হয়ে গেল তিন মিনিটের মধ্যেই। শুধু একটা ব্যাপারে ফয়সলা হতে যা এই দেরিটুকুন হলো। গিরিধারী নাকি মাইনে নিতে কিছুতেই রাজী হলো না। সে শুধু খাবে আর কাজ করবে। আর থাকবে। শুধু খাওয়া-থাকার বদলে সর্বক্ষণের কাজের লোক। সংসারের যাবতীয় কাজ সে একা করবে। এ যুগে ভাবাই যায় না।

ওই রোগা-পটকা লোকটা কিন্তু সত্যিই ভেলকি দেখালো। একাই একশো বলে একটা কথা আছে, লোকটা যেন তাই। কিন্তু প্রতিটা কাজ যেমন নিখুঁত তেমনি তাড়াতাড়ি। পাঁজা পাঁজা বাসন যা অন্য লোকের এক দেড়ঘন্টা লেগে যাবার কথা, কুয়োতলা থেকে মেজে আনতে গিরিধারীর পাঁচ মিনিট লাগে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ফাঁকি নেই। প্রতিটি বাসন-কোসন ঝকঝক করছে, বুঝি মুখ দেখা যায়। ঘরদোর তক্‌তক্‌ করছে, এক কণা ধুলো নেই। বিছানাপত্র টানটান, আলনা ফিটফাট, জুতোর পালিশ থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। রান্নাঘরে পা দিয়েই পিন্টুর মা চমকে যায়, উনুনে আঁচ গনগন করছে। ঠাকুরকে ফুলজল দিয়ে এসেই স্তম্ভিত। বাটনা বাটা হয়ে গেছে, একতাল আটা মাখা শেষ। বঁটির আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে দেখেন কুটনো-ফুটনো রেডি। তবু এই লোকের হাতে রান্না খেতে প্রবৃত্তি হয় না। সেই এক জামা-কাপড়, এক পাগড়ি, ছাড়াছাড়ির বালাই নেই। জন্মে কখনো চান করেছে বলে তো মনে হয় না। মায়ের খুব বাছবিচার কিন্তু বাবা নিচু গলায় সাবধান করে দেন, এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ওকে ঘাঁটিয়ো না। যদি ছেড়ে পালায়, তুমিই পস্তাবে।

তা ঠিক, কাজে-কর্মে লোকটার তুলনা হয় না। দোষের মধ্যে রাক্ষুসে খোরাক আর কুম্ভকর্ণের মতো ঘুম। ভাত পেলে ওর মাথার ঠিক থাকে না। ভেতো বাঙালী না, এ ভেতো হিন্দুস্থানী। তাদের তিনজনের ভাত একলা সাঁটিয়ে দেয়। আর ঘুমোলে ওকে জাগায় কার সাধ্যি। তখন বাড়িসুদ্ধু লোককেই জেগে থাকতে হয়, আর ও বাড়ি কাঁপিয়ে ঘুমোয়। নাকের দুই ফুটোয় যেন বাঘ সিংঘি এক সঙ্গে ডর করে তখন। দিন তিনেকে মায়ের অবস্থা কাহিল। বাবার কাছে গিয়ে নালিশ জানালো, এ কি মনুষ্য না আর কিছু?

বাবা হাসি চেপে গম্ভীর হলেন, কেন, কি করেছে গিরিধারী?

কী করেনি? রাতদিন কাজ দাও কাজ দাও করলে আমি কেমন করে সামলাই বলতে পারো?

খানিকক্ষণ চিন্তা করে বাবা বললেন, ঠিক আছে, ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। ও কতবড় ম্যাজিক জানে দেখছি। বাছাধনের এবার নাভিশ্বাস তুলিয়ে ছাড়বো।

গিরিধারী এসে সেলাম কবে দাঁড়ালো। ওর ওপরে নতুন হুকুম জারি হলো। এখন থেকে রোজ সকালে ওকে টাউনশিপের বাজারে যেতে হবে বাসে-ফাসে না, হেঁটে যাবে হেঁটে ফিরবে। শুনে পিন্টু আঁতকে উঠলো। টাউনশিপের বাজার তাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মাইলের ওপর। তার মানে রোজ দশ-সাড়ে দশ মাইল ঠেঙিয়ে ওকে বাজার বয়ে নিয়ে আসতে হবে। এটা খুবই অবিচারের কাজ হলো, তবে বাবার হুকুম, সে আব কি বলবে!

বাজারে পাঠিয়ে বাবা হাসতে হাসতে মাকে বললেন, এর ফলটা কিন্তু খুব ভালো হলো না। লোকটা আজই পালাচ্ছে, তুমি জেনে রাখো।

একটু ফাঁক পেয়ে মা বাবার সঙ্গে সুখদুঃখেব গল্প করছিল এমন সময় রান্নাঘর থেকে মাঁ জীঁ-র তলব [illegible] পিন্টু ঘড়ির দিকে তাকাল। মিনিট পনরো হলো টাকা[illegible] থলে-ফলে বুঝে নিয়েছে, অথচ এখনো পর্যন্ত বাড়ি থেকে বেরতেই পারল না মা বা[illegible] উঠে গেল ও ধমকাতে।

নিজের আবিষ্কার বলে কিনা কে জানে, গিরিধারীর ওপরে পিন্টুর একটু দুর্বলতাই জন্মে গেছে। বাজারটা কিন্তু ও দারুণ করে, খুব সস্তায়। একই টাকায় বাবার চেয়ে তিনগুণ জিনিস আনে।

পিন্টুর মা ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। দেখেই বোঝা গেল ভীষণ ভয় পেয়েছে। মুখ কাগজের মতো সাদা, সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে, কথা বলার ক্ষমতা নেই।

কী ব্যাপার দেখার জন্যে বাবার পিছু পিছু পিন্টুও ছুটে গেল রান্নাঘরে। এ কী অসম্ভব ব্যাপার! গিরিধারী টাউনশিপের বাজার কখন সেরে এসেছে কে জানে, আনাজপাতি, মাছ কুটে ধুয়ে রেডি করে রেখে গিয়েছে। মনে হতেই পারতো ও টাউনশিপে যায়নি, অন্য দিনের মতো ঘরের কাছেই বাজার সেরেছে। কিন্তু না, রসগোল্লার হাঁড়ির মোড়কে টাউনশিপের দোকানের নাম-ঠিকানা ছাপা।

গিরিধারীকে দেখতে না পেয়ে যেন বাঁচা গেল। পিন্টুর বাবা যা বোঝার বুঝে ফেলেছিলেন। একমুহূর্তও সময় নষ্ট না করে, ওকে নিয়ে তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর পিন্টুকে ওর মায়ের কাছে রেখে যেন কোথায় বেরলেন। একটু পরেই অনেকগুলো গলার উত্তেজিত কোলাহল শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পিন্টু দেখল উঠোনে এক বিরাট দঙ্গল। পাড়া ঝেঁটিয়ে লোকজন এসে গেছে লাঠিসোটা নিয়ে। দুঃখিত পিন্টু বুঝতে পারল গিরিধারীকে আর বাঁচানো যাবে না। সবাই যে রকম ক্ষেপে উঠেছে তাতে গণধোলাইয়ে ওর হাড্ডি চুর হয়ে যাবে আজ। যদি না বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল হতভাগা বাড়ি ছেড়ে পালায়নি। নিজের ঘরে খিল বন্ধ করে লুকিয়ে আছে। বুদ্ধু কোথাকার! এবার মরবে। পিন্টুর ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট হলো।

জনতা পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্ধ দরজার ওপর। সেই চাপ ওই পলকা দরজা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না, ভেঙে পড়ল। সবার কেমন ধাঁধা লাগল। দরজা জানলা বন্ধ সেই ঘরের মেঝেয় গিরিধারী হুমড়ি খেয়ে মরে পড়ে আছে। ভয়েই হার্ট ফেল করেছে না বিষ খেয়েছে কে জানে।

জানলা-টানলাগুলো খুলে দিতেই সবাই আর এক দফা চমকালো। কোথায় গিরিধারী! মেঝের ওপর ওর পাগড়ি কামিজ আর পাজামা এমনভাবে পড়ে ছিল যে ধাঁধা লেগেছিল। গিরিধারী নেই, সে বোধহয় চিরকালের মতোই ওদের ছেড়ে চলে গেছে।

পরে যখনই ওর কথা উঠতো পিন্টুর বাবা মাথা নেড়ে বলতেন, গিরিধারীর আত্মা মুক্তি পেয়েছে! কেউ নিশ্চয় ওর নামে গয়ায় পিণ্ডি দিয়েছিল।

www.arisumu.com